দিশেহারা

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
কলিকাতা।

শ্রাবণ, ১৩২৮

প্রকাশক
শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিন্টার শ্রীকুলচন্দ্র দে
শাস্ত্র প্রচার প্রেস
নং ছিদাম মুদির লেন

বিদ্যায়, বিনয়ে, স্নেহে, আন্তরিকতায় যিনি
আমার বন্ধুকুল উজ্জ্বলরত্ন, স্বদেশ ও
স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত তারকনাথ গুপ্ত
সুহৃদ্বরের করকমলে এই
গ্রন্থখানি উপহৃত
হইল।

২৫শে শ্রাবণ, ১৩২৮
অবিনাশ মিত্রের লেন,
কলিকাতা

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

উপহার

দিশেহারা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কানে দেখা হইয়া গেল।

শুনেছি বাল্যকাল না-কি মানবজীবনে সব চেয়ে মধুর, সব চেয়ে কামনার—আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ বাল্যকালের কোন মাধুর্যই আমি দেখতে পাই না। স্কুলের বোর্ডিংএ আরও পাঁচসাতটি মেয়ের সঙ্গেই সেই মধুর বাল্যকালটা অতিবাহিত হয়েছিল তার ভেতর এমন একটা কিছুই আমার নজরে আজ পর্যান্ত পড়ে নাই—যা অন্ততঃ ছাপার কেতাবে লেখা চলতে পারে। কেউ কাছে বসে শুনতে চায়—বলতে পারি—বিশেষত্ব তার কিছুই নাই। বাল্যকালটা ছেড়ে দিলেও এ আত্মকাহিনীর কোন ক্ষতি হবে না।

যখন থেকে এ উপন্যাসের সূত্রপাত হ'ল—আমার বয়স তখন খুব জোর পনেরো। এই সময়টা নারীজীবন একেবারে ফল ফুলে শিকড়ে

পাতায় সমাকীর্ণ হয়ে যায়—আমি কিন্তু তার কোন আভাষ পাই নাই। কোনদিন বসন্তের উতলা বাতাস যে আমার কানের দুল থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত নাড়া দিয়ে যায় নাই, তা নয়—তার ভিতর থেকে চাপা দুঃখ বা আকাঙ্খা আমার প্রাণে জাগায় নাই—অন্ততঃ সে চেষ্টা বাতাসেরও ছিল না; সে আশা-আকাঙ্খাকে মুকুলিত করতে আমার কোন আত্মীয়েরও কোন সন্ধান আমার জানা ছিল না। মাঠের মাঝে একটা গাছ যেন একেবারে আলাদা দাঁড়িয়ে রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় বাতাসের তলে বেড়েই যাচ্ছিল—দুনিয়ার কারো যোগ তার সঙ্গে আছে বলে মনেই হত না।

আমার অজানা অচেনা কেউ এক বন্ধু আছেন—আমি না দেখলেও জানতে বাকী ছিল না। সে বয়সে ঈশ্বর মানা আমার পক্ষে সহজ না থাকলেও এই আত্মীয়টিকে না মেনে উপায় ছিল না। অথচ, একটি দিনও আমি তাঁকে দেখি নাই—কিন্তু মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তিনি যে অক্লান্তভাবে আমার খরচ জোগাইয়া চলিয়াছেন—এ বিস্ময়ের শেষ আমি যেন কোনদিকেই দেখতে পেতাম না। এ নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার দরকার হয় নি, কেননা আমার সহবাসিনীরা আমার বিস্ময় ভেদ করে দিয়েছিল যে, আমি নিশ্চয়ই কোন বড় লোকের পিতৃ মাতৃহীনা অসহায়া মেয়ে ব্যাঙ্কে আমার জন্য অগাধ টাকা সঞ্চিত আছে—আরো কত কী!

এ সব বলতে তারা পারে—আমার হাত খরচা বলে স্কুলের কেরাণী হরদয়াল বাবু যা দিতেন তা অনেক মেয়েরই দুষ্প্রাপ্য ছিল—তাই আমার বন্ধুদের অনুমান মিথ্যা বলে মনেই হ'ত না।

আমি বলেছি, বসন্তের ধার আমি ধারতাম না; কোকিলের কুহুধ্বনি শুনতে কোন বসন্ত প্রাতেই আমি জেগে থাকতে পারি নি—দক্ষিণে বাতাসের আশায় কখনই এধারে ওধারে বেড়াবার সখ্ আমার হয় নি—এতে আমার সুখ ছিল অনন্ত আর দুঃখ ছিল সেই পরিমানে অত্যল্প। সুখ অসীম ছিল বলেই একবিন্দু দুঃখ যা আমার ছিল তা এত উগ্র যে আর কী বল্‌ব। সারা নীলাকাশে এক শরচ্চন্দ্রের দীপ্ত বিভা যেমন নীলকে সাদা আবরণ পরিয়ে দেয়—আমার দুঃখের বিন্দুটিও আমাকে কেমন যেন বিভোর করে দিত।

জানি না—কোন্ আত্মীয় আমার শুভাকাঙ্খা করে' এ হেন সুখের কারাগার আবিষ্কার করে দিয়েছিলেন, তাঁর কি ইচ্ছা তিনিই বল্‌তে পারেন। পনেরো বছর বয়সে একটা নিবিড় গৃহচ্ছায়ার কল্পনা করে' আমার মন যেন নেশাখোরের মত হ'য়ে যেত। সেটা প্রায়ই হত, আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ যখন রঙীন শাড়ী পরে' জীবন দেবতার পাশে বসে বা দাঁড়িয়ে ছবি তুলে একখণ্ড করে পাঠিয়ে দিতেন বন্ধুকে। তলায় বাঁকা অক্ষরে সহি করে! এমন ছবি আমি বড় কম পাই নি। কারণ অনেকেই আমার আগে সে ছবি তোলাবার সুযোগ পেয়েছিলেন! তাঁরা ত জান্তেন না যে সোনার হাতে গিয়ে ছবিগুলো আগুণ হ'য়ে যেত—বাঁকা সহির দাহিকা শক্তি আপনা হ'তেই উদ্বুদ্ধ হ'ত। সত্য গোপন করব না—আমারও অমনি ছবি তোলাবার কি দুর্দ্দম আকাঙ্খাই না জেগে উঠ্‌ত! কিন্তু তার তলে জলসেক ত হত না—লতাটি অকালে শুকিয়ে যাচ্ছিল।

এই সময়ে একদিন সত্যিকার ডাক্ এল। কে ডাক্ দিলে, এতকাল

পরে কার যোগ নিদ্রা ভাঙ্গল কিছুই জান্‌তে পারলাম না; শুনা গেল—আমাকে নিতে গাড়ী আস্‌বে! শুনেই মনটা কি-যে করে' উঠ্‌ল—প্রকাশ করবার শক্তি আজ আর নেই। তবে এইটুকু বল্‌তে পারি, আহ্লাদে নেচে উঠিনি! যে ছবি তোলবার বৃথা কল্পনায় এতদিন উন্মাদ হ'য়েছিলাম, সেদিন যেন তার আভাষ পেয়েই কেন্নুয়ের মত কুণো মন আমার সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ছিল।

বোর্ডিঙে আমার বিশেষ বন্ধু কেউ এদানী ছিল না। যাদের সঙ্গে বন্ধুতা করেছিলাম তারা প্রায়ই এক এক করে' অনিচ্ছায় যমের বাড়ী যাওয়ার মতই আমাকে ফেলে চলে গেছল এবং সেখানে যে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করছে—তারই নিদর্শন স্বরূপ ছবিগুলো—পোড়া কয়লার মত আমাকে পাঠিয়ে দিত। "তারা আসে—তারা চলে যায়—ফেলে যায় মরু মাঝারে"—আমি আর কারো সঙ্গে বন্ধুতার পরিহাস করতাম না। তা'তে করে' মেয়েরা বল্‌ত দেমাকে; মাষ্টাররা বলতেন—নট্ এট্ অল সোসাল—দুটই আমাকে মেনে নিতে হ'য়েছিল,—তা'তে যেন গর্ব্বও মিশে ছিল একটু।

তবু আমার বিদেয় শোকটা সকলেরই লেগে ছিল। এই বোর্ডিঙে যে প্রতিষ্ঠা করা গাছটির মত বহুকাল ধ'রে আমি লোকের আনাগোনাই দেখে আস্‌চি—এ অতি ছোট মেয়েটি অবধি জান্‌ত। কেউ বল্লে—একটা ছবি পাঠিয়ে দিও; কেউ বা দীর্ঘ পত্রের প্রত্যাশা করলে, কেউ বা মাঝে মাঝে দেখা করার দুরাশা জানাতেও দ্বিধা করলে না।

সেদিন দিব্য একখানা ল্যাণ্ডোলেট্ গাড়ী—আমাকে নিতে এল। তক্‌মা-পরা সহিস কোচম্যান লম্বা সেলাম করলে। আর একখানা

ভাড়াটে থার্ডক্লাশ গাড়ীতে আমার মোট মাটরা নিয়ে একটা বেয়ারা হবে বোধ করি—লাণ্ডোলেটের পিছু পিছু ছুটতে লাগল।

এই অদৃশ্য আত্মীয়ের যে ঐশ্বর্য্যের অভাব নেই তা ত আগে থেকেই আমার জানা ছিল—তিনি পুরুষ কি মেয়ে জানা না থাকলেও আমার মন বেশ একটু উদ্বেগ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠছিল।

গাড়ী অনেক পথ ছুটে যে বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়াল—সে যেন এ গাড়ী বা সোয়ারিটার থামবার নামবার যোগ্যই নয়। বাড়ীটা যেমন ভাঙ্গা, তেমনি বিশ্রী! দরজা খোলাই ছিল, সহিসও গাড়ীর দ্বার খুলে দাঁড়িয়ে—আমার কিন্তু নামতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। এ আমি কোথায় নামব!

সহিসকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীলোক মাথায় কাপড় দিয়ে দরজার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে বল্লেন—নেমে এস!

এমন সম্ভাষণেরও উত্তর দিতে হ'ল—আমি নেমে পড়তেই তিনি আমার হাত ধরে বল্লেন—আমি তোমার মা!

মা!

স্ত্রীলোকটি সহিসের দিকে চেয়ে বল্লেন—যাও।

গাড়ী সরে গেল। আমার ঠিক পিছনে কলকাতার লোক বহুল রাজপথ। এখানে আর একমিনিট দাঁড়ালে যে শত শত দৃষ্টি এগিয়ে আসবে তা জেনেই আমি ভেতরে পা বাড়িয়ে বল্লাম—চল।

স্ত্রীলোকটি উপরে এসে বল্লেন—তুই আমার কথা কখনই শুনিস্ নি—চিন্তে পারিস নে—আমিই তোর মা!

আমার মনে হ'লে—এ যেন পড়া মুখস্থ বলে যাচ্ছে। আমি

সামনের একটা ঘরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি, স্ত্রীলোকটি আবার বল্লেন—সোনা, আমি তোর মা!

বার বার যে লোকটা 'মা' বলে প্রচার করছে—এতটুকু পরিচয় আমার সঙ্গে তার ছিল না কোন দিনের। শ্রদ্ধাও যে হ'য়েছিল তা নয়, কি জানি, বুঝি ভদ্রতা রাখবার জন্যেই আমার মাথা নত করে' তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌তেই দেখি—কে একটা লোক সামনের ঘর থেকে বেরিয়ে আমার পানে হাঁ করে' চেয়ে আছে। সে অসভ্য লোকটা যে কোন দিন অপরিচিতা মেয়ের কাছে দাঁড়াতে শিখেছে—তা বলে আমার মনে হ'ল না। অসভ্য মূর্খ যত বড়ই হ'ক না কেন—তার সাহস দেখে আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। সেই রকম চাইতে চাইতে সে একেবারে আমার 'মা'র কাছে এসে দাঁড়াল।

'মা' একগাল হেসে, একটু নড়ে চড়ে বল্লেন—দিব্যেশ, এই আমার মেয়ে!

লোকটা যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। বাঙ্গালীর চেহারা তেমন খুব কমই দেখা যায়—আমার মনে হ'চ্ছিল সে বুঝি বঙ্গবাসী পেশোয়ারী ফেশোয়ারী হ'বে—কিন্তু তার কথা শুনে' বুঝলাম—তা নয়—সে বাঙ্গালীই!

দিব্যেশ আপাদমস্তক দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্লেন—চমৎকার!

পনেরো বছরের ইংরাজী পড়া মেয়ে, তবুও সেই মুহূর্ত্তে তার মাথা নুইয়ে পড়ল।

পরশু আস্‌ব—ব'লে দিব্যেশবাবু একখানা একাব্বরী মোহর আমার হাতে গুঁজে দিয়ে ঘরের দিকে গেলেন। আমার 'মা'ও তাঁর পিছু পিছু ঘরে ঢুকলেন।

দুতিন মিনিট পরে আমি তাঁর দেখা পেয়েই তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম—কে এ ?

তোর বর—বলে 'মা' হাসলেন।

থার্ডক্লাস গাড়ীটা এসে দাঁড়িয়েছিল, আমি জিনিষপত্র দেখ্‌তে নেমে গেলাম। মনে মনে বুঝলাম—ছবি তোলবার সম্ভাবনা হ'চ্ছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হিতোপদেশ।

গাড়োয়ান ট্রাঙ্ক নামিয়ে দিয়ে ভাড়া নিয়ে চলে গেল। আমি 'মা'র দিকে ফিরে বল্লাম—চাকর নেই?

ও-মা নেই আবার! ওরে রামধনিয়া—ও-হো, সে যে বাজারে গেছে, জলখাবার আনতে।

আমি ট্রাঙ্কটা দু'হাতে তুলে উপুরে নিয়ে এলাম। ট্রাঙ্কটা যে হাল্কা ছিল তা নয় তবে আমার শরীরও ছিল যথেষ্ট মজবুত। 'মা' আমার পিছনে পিছনে উঠে এসে বল্লেন—মেয়ের আমার গায়ে জোর আছে।

আমি তার কোন সাড়া দিলাম না। মেয়ে মানুসের বলাধিক্য গৌরবের কথা বলে বোধ হয় নি বলেই জবাব দিতে পারা গেল না।

আমার মা বোধ করি ভাবলেন লজ্জা, বল্লেন—হবে না! কত কষ্টই না করেছি ওর জন্যে! একটি মেয়েকে দুরে রেখে বেঁচে থাকার যে কি কষ্ট তা আর কে বুঝবে?

কথাগুলি দুঃখের হ'লেও তাঁর মুখে চেয়ে আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি ট্রাঙ্ক খুলে কাপড় জামা বের করছি দেখে. আমার

মা বলে উঠ্‌লেন—ওসব থাক্‌ মা, তোর জন্যে কাপড় জামা সব এসেছে—দেখ্‌বি আয়।

এবার আমার সত্যিই লজ্জাবোধ হ'তে লাগ্‌ল। কনে দেখা হয়ে গেছল বলেই যেন আমার মনে হচ্ছিল রঙ্গীন কাপড় সব এসে পড়েছে। খালি একবার মুখ তুলে বল্লাম—সে থাক্‌।—বলে আমি কাপড় বদলাতে লাগলাম।

মা বের হয়ে গেলেন। আমি একখানা বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পরিপূর্ণ দেহ-যৌবনের পানে এই প্রথমবার অপলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। যা কোনদিন আমার মনে স্থান পায় নি আজ সেই বসন্ত একেবারে রঙ্গীন হ'য়ে আমার বুকে ও মাথায় হাওয়া চালিয়ে দিলে! আমার মনে হচ্ছিল আজ যেন আমি কোন্‌ ডেস্‌ডিমোনার ছবি দেখ্‌ছি, নিজের ছবি বলে মনেই হল না। যে দেহকে সম্পূর্ণ করতে পনেরো বছরের পনেরোটা বসন্ত-জ্যোৎস্না মধু বিলিয়ে গেছে—আজ যেন তা' সার্থক মনে হ'তে লাগল।

মা ফিরে এলেন। হাতে তাঁর জহরলাল পান্নালালের ছাপমারা হলদে দুটো বাক্স,—আমার সামনে সে দুটোকে খুলে বল্লেন—দেখ দেখি সোনা কেমন জিনিষ!

যে বেনারসী শাড়ির চাকচিক্য একেবারে প্রায়ান্ধকার ঘর খানাকে শুদ্ধ জ্বল জ্বলিয়ে দিলে তার প্রতি আমার এতটুকু লোভ জন্মাল না। আমি এতদিন পরেছি—আধখোলাবুক সাহেব বাড়ীর জ্যাকেট, রেশমী সাদা শাড়ী, পায়ে মান্‌টিথের জুতো—তার সঙ্গে এর যে বিভিন্নতা সে ত কাউকে বুঝিয়ে বল্‌তে হ'বে না। এই শাড়ী ও ভেলভেটের জ্যাকেট

দেখে কিশোরী বধূর লজ্জানত যে মুর্ত্তিটা আমার মানস চক্ষে ফুটে উঠ্‌ল তা কোনদিনই আমার কাছে লোভনীয় ছিল না। অথচ বাঙ্গালী জীবনে সেইটাই যে ছিল স্বাভাবিক, সে আমি নিজের মনেই জান্‌তাম তবু কেমন একটা অসোয়াস্তি জন্মাতে লাগ্‌ল।

মানুষের রসনাকে যে অনেক সময়ে মনের সঙ্গে জোর করে মিলিয়ে কথা বল্‌তে হয় এর আগে আমার তা অজ্ঞাত ছিল—মা বড় আশা ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন, আমাকে বলতে হ'ল—বেশ!

এই মা'র প্রতি ভক্তি বা আকর্ষণ যে আমার কাছে প্রবল হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল তা নয়, তবু তাঁর মুখে তৃপ্তির হাসিটুকু আমার উপভোগ্য হ'য়ে উঠ্‌ল।

আমার মুখেও উপভোগের তৃপ্তিটুকু বোধ করি রেখাকারে ফুটে উঠেছিল, মা তাই দেখেই বল্লেন—উনিই সব দিয়েছেন। বুঝলি সোনা!

আমাকে না দেখেই?

না, না—উনি যে তোকে দেখেছেন। তোদের স্কুলে কবে প্রাইজ হ'য়েছিল!

বল কী!—গতবার প্রাইজের দিন অনেক যুবক হাঁ ক'রে প্ল্যাটফরমের উপর বসেছিল বটে! সেদিনটা আমার বেশ মনে আছে। মেয়েরা প্রাইজ আন্‌তে যাচ্ছিল—আর তাঁরা যেন নলরাজা হ'য়ে সামনে বসে কারও গলায় মালা পড়ে তারই তর্ক বিচার নিঃশব্দে করে যাচ্ছিলেন। আমরা সব লজ্জারুণ মুখে প্রাইজ নিয়ে ফিরে এসে তাদেরই আলোচনা করেছিলাম। কেউ একেবারে রতিপতি,. কেউ

ওসমান পাশা—এমনি সেজে গুজে এসেছিলেন। কেউ বা ঘন ঘন চশমা মুচছিলেন, কেউ চোখের তারা দিয়েই গিলে খাচ্ছিলেন—কারু নজরই যে প্রাইজের দিকে ছিল তা নয়, কার বরাত সুপ্রসন্ন হ'য়ে গলায় ফুলের গোড়ে পড়ে—তাই ভাবছিলেন। এ নিয়ে আমাদের হাসাহাসি, গা টেপাটিপির অন্ত ছিল না। কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগের দেখা লোকটিকে যেন আমার স্মরণ হ'চ্ছিল না।

আমার মা বল্লেন—হ্যাঁ হাঁ দিব্যেশবাবু তো'কে দেখেছিলেন, তোর নামও শুনে এসেছিলেন।

এর ভেতর আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নেই, কারণ ঐ দুটি দেখবার এবং শোনবার জন্যেই যে সেই সব আলাউদ্দীন খিলিজী চিতোর বের্ডিঙে উদয় হ'য়েছিলেন তা ত আমাদের জান্তে বাকী ছিল না। হাঁ হাঁ মনে পড়েছে —ঐ রকমের একটা লোক বোম্বাই চাদর গায়ে দিয়ে শুঁড়তোলা চটি জুতো পায়ে দিয়ে সামনেই হাঁ করে বসেছিল বটে! বসা চেহারটা সব্বার মাথা ছাড়িয়ে উঠেছিল, মনে পড়েছে। আবার মেয়ে স্কুলে গেছেন চটি পায়ে দিয়ে, শুকনো চুল উড়িয়ে, চাদর জড়িয়ে—ঠিক, মনে পড়েছে। রমলা ঠাট্টা করে বলেছিল বটে গোরা দেখেছিস ভাই! তখন রবীন্দ্রবাবুর "গোরা" একটু একটু করে সারা বঙ্গে তার প্রভাব বিস্তার কর্চ্ছিল।

আমার মনে পড়ে গেল যেদিন প্রথম গোরা বিনয়কে ল্যাজে বেঁধে মূর্ত্তিমান বিদ্রোহের মত পরেশবাবুদের ছাদে এসে দাঁড়িয়েছিল, তার অদ্ভুত বেশটা ঠিক এই রকমেরই ছিল—বাড়ার ভাগ তার কপালে চিতাবাঘের ছাপ মারা ছিল, এর তা না থাকলেও এ যেন সকলের সামনে এসে বসেছিল সকলের চোখে পড়বার জন্যেই।

দিশেহারা

সুচরিতা ললিতার মত এই কাঠ-খোট্টা লোকটার উপরে আমার ভীষণ রাগ হ'য়েছিল ; রমলারও কম হয় নি ! আজ সে কোথায় আমি জানি নে। সে থাকলে হয়ত আজও আমার রাগ হত ; কারণ সেইদিনই সে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল এটা একটা দস্তুরমত ভণ্ডামি, নেকামী ইত্যাদি। আজ আর রাগ ততটা হ'ল না—সেই বিদ্রোহ ভাবাপন্ন লোকটা যে এই উঁচু গোড়ালি খটমটে জুতার তলাতেই আছড়ে পড়েছে বুঝে মনটা যেন খণ্ডযুদ্ধ জয়ের আনন্দ বোধ করছিল।

মা শাড়ীখানি, জ্যাকেট পিস্‌টি খুলে, আবার ভাঁজ করে পুরছিলেন, অদম্য কৌতূহল আমার বুকের মধ্যে গুমরে উঠছিল ; আমি অবরুদ্ধ-শ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম—তারপর উনি সব ঠিক ঠিকানা পেলেন কোথা ?

মা হেসে বল্লেন—কি জানি বাছা ! স্কুল থেকে কি ব্যাঙ্ক থেকে তা ঠিক জানি নে তবে অনেকদিন ধরেই আনাগোনা করছেন। লোকটি বেশ ভালো।

এমনও যে কেউ আনাগোনা করতে পারে—এ যেন আমার ধারণাই হচ্ছিল না। আবার মনে হচ্ছিল সে লোকটা সব পারে ! মেয়ে স্কুলে প্রাইজ দেখতে যে অমন সবার সামনে এসে বস্‌তে পারে, কটমটিয়ে চাইতে পারে, তার লম্বাচওড়া গৌর দেহের ভেতরে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চিত আছে ভেবেই আমার মন স্বীকার ক'রে নিলে—যে সে সব পারে।

মা মৃদুকণ্ঠে বল্লেন—সোনা, বেশ সাহসী লোক নয় ? তার উপরে পয়সাও ঢের আছে, খুব বড় লোকের ছেলে—বুঝলি !

এ সব বোঝাবার দরকার ছিল না, তাই মার কথায় কেমন একটা আঘাত লাগল। বাংলা দেশের সব মেয়েকে পতি-নির্ব্বাচনের এমন সব প্রশ্ন করা হয় কি না তা আমার জানা ছিল না—তবে সংসারে অন্য সব আত্মীয়ের চেয়ে যে মা'র সঙ্গে একথা চলতে পারে তা আমি অনেক মেয়ের কাছে শুনেছিলাম। তারা সব ছুটির পর ফিরে এসে নানা রকম গল্প করত—তাই থেকেই এ জ্ঞানটুকু অর্জ্জন করতে পেরেছিলাম। তবু লজ্জা ত আমার হাতধরা নয়;—স্বরটা একটু জড়িয়েই গেছল, আমি বল্লাম—জানি নে। বলে আমি আবার আর্শীর দিকে ফিরে জামার বোতাম আঁটতে লেগে গেলাম।

মা আমার বুদ্ধিমতী, বল্লেন—বেশ লোক। পরশু ত আস্‌বেন, কথাবার্ত্তা কইলেই বুঝতে পারবি।

আমি কথাবার্ত্তা কইব!—কিন্তু একথা গলায় উঠে গলাতেই আটকে গেল। মুখ দিয়ে আমার কথা বেরুল না। এ কি কোর্টশিপ্ না কি? যদিও ইংরেজী নভেলও আমি ক'খানা পড়ে ফেলেছি, তাতে নায়ক নায়িকার পূর্ব্বরাগ অনুরাগ সব একদিন আমার নয়ন-মনে মাদকতা এনে দিত আজ নিজের জীবনে তার সূচনা পেয়ে কেমন খুঁত খুঁত করতে লাগ্‌ল।

বাংলা দেশের শতকরা, সহস্রকরা ক'টা মেয়ে কোর্টশিপ্ করে' বিবাহ করে, সে ত আমার অজ্ঞাত নেই! ঐ গাড়ী চড়ে, জুতা পরে, 'ফ্যাসান' করে' স্কুল-কালেজ যাওয়াই সার—তারপর একবারেই মামুলী প্রথা! সেই পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজন নির্ব্বাচিত 'পতি পরম গুরু' 'প্রণাম শতকোটী নিবেদন মিদং', বছরখানেক পরে 'প্রিয়তম'—তারপর

আর দরকার নেই! তখন প্রিয়তমও নয়, প্রণাম নিবেদন-ও নয়, হরলিকৃস, মেলিন্সের ফর্দ্দ, আর পিত্রালয়ের ভয় দেখাতেই জব্দ! এই ত!

ঘরের আলো কমে এসেছিল, মা বলতে লাগলেন—সুমতি হ'ক মা তোর। দিব্যেশের হাতে সুখী হ'তে পারবি।

এক একবার মনে হচ্ছিল—মা ও মেয়ের স্বাভাবিক আলোচনা যেন এ নয়। কিন্তু তা' ছাড়া যে আর কিছু হ'তে পারে—তা ত আমি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি না—আমি চুপ করেই রইলাম। আমার মা যে সুন্দরী শিরোমণি তা আমি বলেছি, তাঁর মনও যে উদার, শিক্ষিত তা-ও এখন বুঝলাম।

পরশু আস্‌বেন—বেশ আদর যত্ন করবি, বুঝলি, যেন অসন্তুষ্ট না হ'ন।

আমি রক্তাক্তমুখে বল্লাম—সে আমি পারব না, তুমি করো।

আমি ত করবই—তোর আদর যত্ন না পেলে কি তারা......

তারা? আবার কে?

এবার কি আর একলা আস্‌বে! দু' একজন বন্ধুবান্ধবও আস্‌তে পারে। সে জন্যে কিছু ভাবিস্ নে সোনা। সে আমি সব ঠিক করে দেব। তুই ত লেখা পড়া শিখেছিস, ভদ্রলোকের মান রাখ্‌তে তুই পারবি—আমার সে ভয় নেই।

কি বলবার জন্যে যে আমি হাঁ করছিলাম, তা আমিই জানি নে, মা বল্লেন—নিজের ভাল করবার সুমতি যেন চিরদিন থাকে তোর—তা হ'লেই ওরা পায়ের তলায় দাসখত লিখে পড়ে থাকবে।

বোর্ডিঙে থাকৃতে—রাস্তার লোকের মুখে 'দাসখত' লিখে দেওয়ার একটা গান আমি শুনেছিলাম—গানটা যত কুৎসিৎ হোক, তার সঙ্গে

রমণী জাতির হৃদয়ের বুভুক্ষা যেন ওতঃপ্রোত মিশেছিল, কিন্তু নিজের গর্ভধারিণী জননীর মুখে সে কথা শুনে আমার যেন কাউকেই দাসখতে বদ্ধ করার স্পৃহা বা প্রবৃত্তি রইল না। এক মিনিট পরে আমি কুণ্ঠিতস্বরে বল্লাম—তাঁরা……

মা বাধা দিয়ে বল্লেন—পাকা দেখ্‌তে কি কেউ একলা আসে রে, পাগলী! বন্ধুবান্ধব নিয়েই আসে!

একলা আসে কি-না তা আমি জানতাম না। আমার শুধু মনে হ'চ্ছিল—একলা এলেই ভালো হ'ত!

মা বল্লেন—দাঁড়া, আমি আলো জ্বেলে আনি।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারেও আর্শীতে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখ্‌তে লাগলাম।

আমার মনটা অত্যন্ত কুণো এবং সংসারের কোন অভিজ্ঞতাই তার ছিল না বলেই আমি কামনা করছিলাম—দিব্যেশ যেন একলাই আসে! দল বেঁধে সমারোহ করে আসবার তার প্রয়োজন কি? সে ত আমাকে দেখেছে, আমাকে পাওয়ার জন্য তার চেষ্টা যত্নের এতটুকুও ত্রুটী করে নি—তবে আর কেন কতকগুলো লোক এনে তাদের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমাকে অপ্রস্তুত করা! তখনি আমার মনে পড়ে গেল, সেই সেবার গ্রীষ্মের ছুটির পরে রমলা কলেজে এসে বলেছিল, তার জীবন দেবতা-ও এই রকম পাঁচ সাতজন বন্ধু নিয়ে দেখ্‌তে আসার অভিনয়টি কেমন করেছিলেন! আজও আমার ঠিক মনে আছে, রমলাকে কত আনন্দিতই না দেখেছিলাম। বন্ধুদের মধ্যে কেউ বল্লেন—একটু হাঁট ত! কেউ চিবুকটা তুলে ধরে বল্লেন—ভালো করে চেয়ে দেখ! এমনি আরও

কত কি! মাগো! এতও লোক পারে! দিব্যেশের বন্ধুরাও যদি সেই রকম করে! রমলা তখন ছোট্টটি ছিল, আর ভারী নিরীহ ভালমানুষ সে! আমি কি সহ্য করতে পারব? এ প্রশ্ন যতবারই করলাম, আমারই কণ্ঠ ততবার বলে উঠ্‌ল—এ আমার পক্ষে অসহ্য। কিন্তু পুরুষ যদি আমার সহ্য-অসহ্যের অভিমান রক্ষা না করে? তখন আমাকে সেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ত হ'তেই হ'বে। নৈলে এই মায়েরও আমার অসন্তোষের সীমা থাক্‌বে না, অপর পুরুষদের মনের মত না হ'লে তাদেরও তুষ্টি হবে না। এই দ্বিধাসঙ্কটে পড়ে বেশীক্ষণ আমাকে থাকতে হয় নি।

ঘরে আলো আস্‌তেই আমি ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণ পর্য্যন্ত সদর্পে অকুণ্ঠিতপদে চলে এলাম; সঙ্কোচশূন্য চোখের অপলকদৃষ্টিতে চেয়ে ভাবলাম, এই রকম চলি, এই রকম যদি চাই—তারা আর কোন অবকাশই পাবে না বল্‌তে—একবার হাঁট ত। ভালো করে' চেয়ে দেখ ত! যে সব মেয়েরা এ রকম পারে না, তারাই লজ্জায় জড়িয়ে, সঙ্কোচে এতটুকু হ'য়ে লাঞ্ছিত হ'য়ে থাকে। তা'দের চেয়ে আমার সাহস স্বাধীনতা যে অনেক বেশী সে ত আমি নিজে জানি; এবং সেই পুরুষরাও জানুক। তার পর তাদের সাহস থাকে, করুক—যে প্রশ্ন পারে! আমার মনে হতে লাগল—তারাই স্থির থাকতে পারবে না,—কখনই না!

আমার পনেরো বছরের জীবনের অভিজ্ঞান তখন ছিল না যে এমন পুরুষ জগতে দুর্ল্লভ নয় যে রমণীর শুধু চোখের দৃষ্টি নয়—তার আকুল ক্রন্দন প্রাণের কামনা উপেক্ষা করে গগনচুম্বী হিমাদ্রিশিখরের মত ধীর স্থির থাক্‌তে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খাঁটি উপন্যাস।

ঘরটা বেশ সাজানো। খুব বড় বড় দু'খানা আয়না, দুটো গ্লাশকেস তার ভেতরে রকম বেরকমের পুতুল, খেলনা; দেওয়ালে বিলিতি দেশী অনেক ছবি—তার মধ্যে রমণী মূর্ত্তিই বেশী এবং কোন কোনটি সুরুচির পরিচায়ক না হ'লেও ছবির আর্ট বেশ প্রস্ফুট ছিল। সেল্‌ফে একটা ঘড়ি, বন্ধ হ'য়ে আছে, আটটা বেজে! আমি সেটিকে দম দিয়ে নিজের হাত ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে চালিয়ে দিলাম। বিছানাটা বেশ পুরু, ক'টা মোটা মোটা বালিশও আছে। দেওয়ালের কোণে দু'টো সোডার খালি বোতল কাৎ হ'য়ে পড়ে আছে,—পা-পোসের উপর কতকগুলো দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি, সিগারেটের দগ্ধাবশেষ টুক্‌রা।

সিগারেটের অংশ আর দেশলাইয়ের কাঠি দেখে আমার কেমন ঘৃণা হয়েছিল। তখনি মনে পড়ল দিব্যেশ বাবু বোধ করি আমার আসবার আগে সেই ঘরে বসেই ধূমপান করেছিলেন।

মা আমাকে জল খাইয়ে নীচে রাঁধবার জোগাড়ে গেলেন—দু দুটো চাকর ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকি করছে শুনে আমি বুঝতে পেরেছিলাম—মেয়ের জন্যে আজ খুব আয়োজন হ'চ্ছে। আমি আলোটা খুব বাড়িয়ে

দিয়ে আর্শীর সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষিপ্ত কেশ দু'একটি ন্যস্ত করে একখানা বই নিয়ে বসে গেলাম।

বইয়ে আমার মন ছিল না। আমার চিত্তমধুপ যেখানে ছুটে ছুটে যাচ্ছিল সে ত বইতেও নয়, বোর্ডিঙেও নয়—সে ঐ আর্শীটার সামনে! নিজের সৌন্দর্য্য একজন কাঠ খোট্টা লোককে পিঠমোড়া করে বেঁধে এনেছে—তাকে উপেক্ষা করার সামর্থ্য আমার ছিল না।

যে মেয়ে বইয়ের পাতায়, বেশভূষায় পনেরো বছরের মধ্যে দশটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে সে যে শুধু আর্শীর সামনে, এই জয়ের চিন্তাতেই সব ভুলে ফেলে ডুবে যাবে নিজের কাছে এ যেন বিসদৃশ ঠেক্‌ছিল, তাই বিছানায় শুয়ে বই পড়তে লাগলাম।

এ সময়ের আমার মনের ভাব লিখ্‌তে পার্‌লেও আমি লিখ্‌ব না। কোন কুমারী মেয়ের পক্ষে সে চিন্তা যে সামাজিক মানুষের বরদাস্ত হবে না—এ আমি ভালো করেই বুঝতে পারছিলাম এবং শুধু যে তাদের বদহজমের ভাবনাতেই আমি নিবৃত্ত হলাম, তা নয়—আমি আমার সমবয়সী মেয়েদের এই শালীনতাটুকু দূর করে দিতে চাই নে। সে দেখানো চলে উপন্যাসে, আত্মকাহিনীতে তা বিবৃত করা যেমন কুরুচি, তেমনি লজ্জাকর।

লিখি আর নাই লিখি—আমার ভেতরে তখন উপন্যাসই রচনা হচ্ছিল, কে করছিল কে জানে! আমার সলজ্জ চাহনি, মৃদু পদবিক্ষেপ বিকশিত দেহলতা যে কোন্ সুদূর দেশ থেকে একজনকে আমারই কাছে টেনে এনে ফেলেছে—একদিনের বেশী দু'দিন না দেখেই যে আমার অজানা ব্যূহ পর্য্যন্ত ভেদ করে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে—এ উপন্যাস

নয় ত কি! সে যে যথেষ্ট সাহসী এবং পুরুষ মানুষ, তাকে জয় করে আমার যতটা গর্ব্ব হচ্ছিল, ক্ষোভও বড় কম হচ্ছিল না। সেই প্রাইজের দিন আরো অনেক যুবক, সুন্দর, মাঝামাঝি, অপূর্ব্ব সুন্দর—অনেক যুবক ছিল—তাদের মধ্যে পুরুষ যেন একটাও ছিল না—তারা যেন মেয়ে মানুষেরই মত, পুরুষ বেশ পরে এসেছিল—এই ভেবেই কি আমার ক্ষোভ হচ্ছিল, তা আমি জানি নে! যে কথাটি মনের মধ্যে সঙ্গোপনে আমি অনুভব করছিলাম, তা এই:—তারা যদি সবাই এসে এমনি লুটিয়ে পড়ত, তবেই যেন আমার জয় সম্পূর্ণ বলে আমি মেনে নিতাম।

তারা পুরুষ নয়, একমাত্র যে পুরুষ ছিল, সেই নত মস্তকে আমার কৃপা ভিক্ষা করতে এসেছে—এই ভেবে বইখানা মুখের উপর চাপা দিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম।

মা ভেবেছিলেন, আমি ঘুমুচ্ছি! গায়ে ঠেলা দিয়ে বল্লেন—খাবি চ'!

খেতে আমার ইচ্ছা করছিল না, নতুন স্থান বলেই হ'ক আর ক্ষিদে না থাকাতেই হ'ক—মা ত ছাড়লেন না। আমার হাত ধরে নীচে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। রান্নাঘরে ঢুকে দেখি—একেবারে কী ব্যাপার। একখানা থালা, আর কম করে' পনেরো ষোলটা বাটী সাজানো। হঠাৎ শুভ্র লুচির থাক্ দেখে আমি বল্লাম—ও-সব আমি খেতে পারব না।

পারবি, পারবি বোস্।

পারব না আমি।

মা'ও জোর করে বল্লেন—তবে কী খাবি? এত কষ্ট করে করলাম কি আমার জন্যে! যা পারিস—বোস্।

আমিও জোর করে বল্লাম—দুটো মিষ্টি দাও শুধু।

মা প্রদীপ্তনেত্রে চেয়ে বল্লেন—তা'লেই হয়েছে আর কী! নিজেও মরেছ—আমাকেও মেরেছ।—বলে তিনি মুখখানা ভার করে রেকাবী থেকে চারটে বড় রসগোল্লা তুলে আমার হাতে দিতে এলেন, আমি বল্লাম—দু'টো।

তিনি রসগোল্লা আবার রেকাবীতে রেখে উনুনের কাছে বসে বল্লেন—যা খুসী তাই কর বাছা! আমি জানি নে!

খাওয়ায় ত দূরের কথা, কোন বিষয়েই আমার উপর কেউ এ পর্য্যন্ত জোর খাটায় নি—কাজেই আমার ধাতটা হয়েছিল অন্য রকমের! তাঁর জেদ দেখে আমারও জেদ বেড়ে যাবারই কথা কিন্তু মা'র ব্যথা অভিমান—এসব কেতাবে পড়েছি ত, কাজেই মৃদুস্বরে বল্লাম—আজ বিকালে বোর্ডিঙে মেয়েরা আমাকে বিদেয় ভোজ খাইয়েছিল কি-না, তাই একটুও ক্ষিধে নেই, নইলে ও-কখানা লুচি আমার কতক্ষণ!

আগে সে কথা বলিস্ নি কেন! এত ছিষ্টি করতাম না।—মা মুখ ফিরিয়ে এই কথা কয়টি বল্লেন। সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—তবে ঐ রাবড়ীটুকু আর মিষ্টি ক'টা খেয়ে ফেল্।

তার ওপর কি কথা চলে! আমি হাত ধুয়ে বসে পড়লাম। মা আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—পাঁচ ব্যন্নন করে' খাওয়াবার জন্যে তিনি পঁচিশটে টাকা দিয়েছিলেন।

আমার গলায় রসগোল্লা আটকে গেল. আমি কেসে উঠ্‌লাম। বিষম লেগেছে ভেবে মা ষাট্ ষাট্ করতে করতে আমার মাথায় ফুঁ দিতে লাগ্‌লেন।

থু' 'থু' করে সবটা ফেলে দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে উঠ্‌লাম। বল্লাম—এ যে দস্তুর মত অপমান করা!

অপমান! কিসের অপমান! তিনি তোকে ভালো……

কথাটা শুন্‌তে প্রবৃত্তিই হ'ল না, বল্লাম—রেখে দাও ও সব কথা! টাকা দিয়ে অপমান!—তখনো আমার আঁচলে সেই মোহরটা বাঁধা ছিল, খুলে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি উপরে উঠে গেলাম।

নীচে থেকে মা একেবারে খণ্ড প্রলয় জুড়ে দিয়েছিলেন, এক একটা কথা বাজের মত আমার কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছিল। পাঁচ মিনিট না যেতেই মা নরম হ'য়ে উপরে এলেন; আমার কাছে বসে বল্লেন—অপমান নয় মা—এ ভালোবাসা। তিনি যে তোকে কত ভালোবাসেন—তা যখন আলাপ হ'বে বুঝতে পারবি। যে গাড়ীতে এলি ঐ গাড়ী তোর নাম করেই এসেছে, পরশু লাভচাঁদের বাড়ী থেকে নতুন প্যাটেনের সব গহনা আস্‌বে সে সব কি অপমান!

তবু আমার মনের সঙ্কীর্ণতা ঘুচল না। মা বলছিলেন—চল মা চল, মুখের রাবড়ীটুকু খেয়ে আসবি চল। নইলে আমিও এতটুকু সামগ্রী মুখে দিতে পারব না। সারাদিন কিছু খাই নি, তোকে খাইয়ে তবে একটু জল মুখে দেব বলে উপুস করে আছি—তুই না খেলে……

আমি উঠে বল্লাম—চল।—একেই বলে নারীর মন! পুরুষ জয় করতে তার কত আগ্রহ, কত আনন্দ, আবার একবিন্দু চোখের জলে একেবারে স্রোতের খড়টির মত অসহায়, ক্ষুদ্র!—আমি রাবড়ীটুকু খেয়ে মাকে বসতে বল্লাম। সে থালাটি সরিয়ে রেখে, তিনি অন্য একটা থালা

নিয়ে খেতে বসলেন। আমার ঘুম না পেলেও 'ঘুম পেয়েছে' বলে আমি উপরে এসে শুয়ে পড়লাম।

অনেকক্ষণ অবধি ঘুম হ'ল না। কে যেন হৃদয়ের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ পুরে দিচ্ছিল! তারই বলে দেহমন একেবারে চন্‌মনে হ'য়ে উঠেছিল। কখন্ যে ঘুমিয়ে গেছি জানি নে—কার ঠেলা-ঠেলিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোখ্ চেয়ে দেখি, চাকরটা আমাকে ঠেল্‌ছে! চোখ্ দিয়ে আমার আগুন ছুটে গেল, সে দু'পা পেছিয়ে গিয়ে বল্লে—মাইজীকা ভেদ হ'চ্ছে।

আগুন চেপে আমি দাঁড়িয়ে উঠ্‌লাম। পাশের ঘরটায় ঢুকে দেখি মা'র অঙ্গের বসন শিথিল হ'য়ে পড়ে আছে, চোখ দু'টো দৃষ্টিশূন্য বোধ হয় মনে হ'ল—বিছানার পাশে এক ধ্যাবড়া অন্ধকার—আমার পা টল্‌তে লাগ্‌ল।

চাকরটা মা'র গায়ে হাত দিয়ে ঠেল্‌ছে দেখেই চাপা আগুন ধূ ধূ করে' জ্বলে উঠল। চোপ্‌রও—ষ্টুপিড—বলে আমি বিছানায় এসে দাঁড়ালাম। চাকরটা যেন একটু হেসে সরে দাঁড়াল।

আমি মা'র বসন বিন্যস্ত করে ডাক্‌লাম-মা! মা!

চাকরটা বল্লে—আর সাড়া দেবে না—হ'য়ে গেছে।

হ'য়ে গেছে!!! না, না—মা, মা, মা!

আর একটা চাকর ডাক্তার সঙ্গে করে এসে দাঁড়াল, ডাক্তার নাড়ী দেখে বল্লেন—ফাইভ মিনিট্‌স মোর!

আমি বল্লাম—বলেন কী!

'ইয়েস' বলে তিনি দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি হ'য়েছে ?

পরজন্! পরজন্!—তিনি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, রামধনিয়া মা'র বালিশের নীচে থেকে এক গোছা চাবি বের করে বল্লে—ছোট সিন্দুকটায় টাকা আছে, ৩২টে বের করে দিন্।

আমি দিলাম। ফিরে এসে বসেছি—মা জড়িয়ে জড়িয়ে বল্লেন—বিশ হাজার টাকার কাগজ!—দিব্যেশকে নিস্।

হায় মা! তখনও আমারই চিন্তায় তুমি বিভোর!

মা আবার বল্লেন—খাবারে বিষ হ'য়েছিল, মা। তুই যে খাস্ নি—এই আমার বরাত জোর!

আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল—সেই যে থালাটা সরানো আছে, আমিও ছুটে গিয়ে খানিক খেয়ে আসি।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব ফুরিয়ে গেল। শেষকালে মা যে-কি বল্লেন, তা আমার মনে নেই। আমি স্পষ্ট তা বুঝতেও পারি নি! কিন্তু সে জিনিষটা না-কি সব চেয়ে স্পষ্ট, সব চেয়ে স্বচ্ছ—তাই সে'টি বুঝ্‌তে পেরে-ছিলাম যে—মা'র জীবন-দীপ নিবে গেল।

ঘরের ভেতর তখন আর কেউ ছিল না—এক শব, আর আমি! 'মা' বলে যে খুব আকর্ষণ আমার ছিল তা নয়—সামান্যকালের পরিচয়ে যতটা জন্মাতে পারে এবং 'মা' নামের ভেতরে যে মোহ ছিল তার গ্রাস থেকে আমি পালাতে পারি নি। অতি বড় স্বার্থপরের কথা হ'লেও বল্‌তে আমি বাধ্য যে আমার নিঃসঙ্গ অসহায় জীবনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই মাতৃশোক দুর্ব্বার হ'য়ে উঠেছিল। তিনি আমার গর্ভধারিণী মা বলে নয়—আমার আশ্রয়-দাত্রী, রক্ষাকর্ত্রী বলে! কার পেটে আমি জন্মেছি,

দিশেহারা

তা আমি জানি নে—মা'র পরিচয় আজকের আগে কেউ আমায় দেয় নি —কিন্তু ইনিই যে আমার মা, সে আমি বুঝেছিলুম, বিগলিত স্নেহে আমাকে আশ্রয় দেওয়া দেখে!

পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, এই ত আমার চিরদিন জ্ঞান ছিল— সে জন্যে কখনো ক্ষোভ জন্মায় নি, কিন্তু একদিনের-এই-আত্মীয়ের-সেরা 'মা' পেয়ে মনে হ'য়েছিল—আমার সব আছে।—এ-যে কতবড় সৌভাগ্য কুবেরের ঐশর্য্য নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল, তা যখন সরে গেল, তখনই তার বিলীন রেখার পানে চেয়ে আতঙ্কে, ভয়ে, ভাবনায় আমি শিউরে উঠ্‌লাম।

চিরদিন যে স্বাধীনতার মধ্যে আপনার দর্পে-শৌর্য্যে বর্দ্ধিত হয়েছে— একদিনের আশ্রয় হারা হ'য়ে সে-যে এমন হ'য়ে পড়বে তা কে জান্‌ত। আমার কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু হৃদপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠে ঠিক গলার নলা চেপে ধরে ধক্ ধক্ করছিল—আমি কাঁদতেও পারলাম না।

এখানে এসে অবধি নিজের চিন্তাতেই আমি এমন মত্ত বিভোর ছিলাম যে কোথায় এসেছি, কি বৃত্তান্ত কিছুরই যেন খেয়াল ছিল না, হঠাৎ মার গা থেকে চাকর দু'টো এক-এক করে' গহনা গুলো খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে তুলে রাখ্‌তে বল্লে, তখন যেন আমি একেবারে সচেতন হ'য়ে উঠলাম। তবে কি আমি পিতৃহীনা নই? তবে, এখনও এমন একজন আছেন—যিনি আমার রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণ পোষণ করতে বাধ্য! কিন্তু কোথায় তিনি? কোথায় তিনি! এ প্রশ্ন নিজেকে করা সহজ, চাকরদের করতে দ্বিধা জন্মাতে লাগল।

একঘণ্টার মধ্যে শব শ্মশানে চলে গেল—কারা নিয়ে গেল, কি দিয়ে দাহ করলে; কিছুই আমি দেখিনি - মুখাগ্নি করে, গঙ্গাস্নাত হ'য়ে আমি অচৈতন্তের মত গাড়ী করে বাড়ী চলে এলাম।

তখন ভোরের আলোক পৃথিবীকে নূতন জীবন দান করেছিল।

• দিশেহারা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আপনার জন্ম।

পরদিনটা যে কখন্ কেমন করে কেটে গেছল -বল্‌তে পারি না। রামধমিয়া একরকম জোর করেই আমাকে খানকতক লুচি একটু মিষ্টি খাইয়ে দিলে—তখন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। আমার ত সন্ধ্যে হয়েইছিল. আকাশের সন্ধ্যে আর দেখ্‌ব কী! অপহৃত শাবক বেড়াল যেমন নিজের ল্যাজের সঙ্গেই খেলা জুড়ে দেয়— আমিও সেই অন্ধকার ঘরেই নিজের অদৃষ্টালোচনায় মননিবেশ করে দিলাম। সে বড় সুখের আলোচনা নয়—আমার পঞ্চদশবর্ষব্যাপী জীবনের সহজ সরল ধারাটি চির মসৃণ পথে চল্‌তে চল্‌তে কখন্ যে পাহাড়ের সংঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে— তারই যেন শেষ হাড় পাঁজরা কখানা সংগ্রহ করে আবার আমার জুড়ে দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

বেলা ৮টার সময় রামধনিয়াকে শ্মশানযাত্রীদের মদ ও খাবার খরচ দিতে সিন্দুক খুলে আমি দেখেছিলাম—টাকা আমার যথেষ্ট আছে। গুন্‌তে হয় নি, এক্‌দৃষ্টিতেই সেটা বুঝতে পেরেছিলাম যে. আবার আমি বোর্ডিঙে ফিরে যেতে পারি! ইচ্ছে করলে পুরোদস্তুর সংসারীও হওয়া দুঃসাধ্য নয়। কোন্ পথটা যে বেছে নেব—সেই হ'ল আমার চিন্তা।

আমার হৃদয়টা হয়ত সৃষ্টিকর্ত্তা পাথর দিয়েই গড়েছিলেন, নরম মাটী ছিল না তাঁর হাতের কাছে, নইলে এত বড় মাতৃবিয়োগ—তাও ভুলে আজই নিজের চিন্তায় মন দিয়ে বসলাম! মন আমার যে জিনিষেরই হোক, সংসারের শান্ত শীতল প্রতিচ্ছবিই আমার একান্ত লভ্য বলে মনে হচ্ছিল। কারু বিনা সাহায্যেই বিনা আয়াসেই একটা হৃদয় যে আমার জয় করা আছে, সে-যে আমারই জন্য উদ্বিগ্ন স্নেহে প্রেমে কোন্ সুদূর থেকে আমার পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে, হৃদয়-মনের এ কি দুর্ব্বলতা তখনি জন্মাল যে—একেবারে না পেলেই নয়!

সংসারে আর মেয়েরা কি করে, বিবাহের পরদিনই স্বামীকে হৃদয়ে মনে গ্রহণ করতে পারে কি-না আমার জানা নেই তার দরকারও নেই—আমি যাকে জয় করেছি—আমি যে তাকেই চাই—এ আমি শপথ করতে নিজের কান দু'টিকে শুনিয়ে দিলাম। উপন্যাসের প্রেম অলীক হোক, কল্পনার ছায়া হোক—কিছুমাত্র যায় আসে না—আমার উপন্যাসের নায়ক যে মনপ্রাণ দিয়ে আমাকেই চেয়েছে—তা'কে বিমুখ করবার শক্তি যে আমার একটুও নেই—এ চিন্তাও বোধ করি আমার পক্ষে সুখের ছিল।

কি-হয় না-হয়—সে যাঁরা মানব-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ভার নিয়ে জগৎকে চমকিত করে দেবার সঙ্কল্প করেছেন, তাঁরা জানেন—আমি তার সম্পর্কও রাখিনে। একদিন, একটিবার যাঁকে এই-চোখে কাছে দেখেছি, একটিবার একটি কথা যার এই-কানে শুনেছি—সেই তিনিই যে আমার জীবন অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত অম্লান জ্যোতিঃতে আমার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত আলোকিত করে দিয়ে গেছেন—এ স্বীকার করতে ত লজ্জা নেই।

সন্ধ্যে বেলা রামধনিয়া আবার টাকা চাইতে এল—শোকে সুখে যে তারা সমভাবেই মদ খায়—আগে তা আমি জানতাম না। কিন্তু সুখে শোকে আমার নিজের মন দিব্যেশ মদে মত্ত ছিল বলেই আমি সিন্দুক খুলে একখানা দশটাকার নোট তার সামনে ফেলে দিলাম। সে খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে, জিজ্ঞাসা করলে—বিলিতি ?

তার প্রশ্নের কি জবাব দেব আমি। খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে সে চলে গেল।

রাত্রি প্রভাত হতেই পাঁচ সাতটি স্ত্রীলোক হাঁউ মাউ করতে করতে বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। রামধনিয়া তাঁদের অভ্যর্থনা করে এনে আমার সামনে ছেড়ে দিতেই তারা সব সমস্বরে বলে উঠল—আহা! তবু মেয়েটাকে দেখতে পেয়েছে—কদমের আমার বরাত ভাল ছিল।

কে কদম আমি তা জানি নে, আমার মার যে কি নাম ছিল, তা তিনি আমাকে বলেন নি। এই স্ত্রীলোকগুলিকে দেখে আমার মন যেন একটা বাঁশের পুল দিয়ে নদী পার হওয়ার মত দুলে উঠেছিল। এমনতর আমি কখনও দেখি নি—যদিও দেখার অভিজ্ঞতা আমার অত্যন্তই কম, তবু এদের সাজসজ্জা দেখে আমার এতটুকু শ্রদ্ধাও হ'ল না। কিন্তু এতগুলি বয়সে প্রাচীনা এবং সৌন্দর্য্যশালিনী রমনীকে অশ্রদ্ধা করবার সাহস আমার ছিল না, আমি বিমর্ষমুখে তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন যেমন স্থূলাঙ্গী তেমনি রূপবতী। তিনি চাপটালি খেয়ে বসে স্নেহপূর্ণ স্বরে বললেন—তুমি বুঝি বাছা কালই এসেছ ?

আমি একটা হ্যাঁ বলে চুপ করলাম।

তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—আমাদের সব খবর দাও নি কেন? রামধনিয়া ত জান্‌ত আমাদের ... ...

আর একজন বল্লেন—কখন থেকে ভেদ হ'য়েছিল?

আমি তা জানি নে।

আমি বুঝতে পারলাম এতে তাঁরা আশ্চর্য্য কম হ'ন নি। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। আমি আড়ষ্টভাবে বসে আছি দেখে রূপবতী রমণীটি বল্লেন—তা এখন কি করবে সোনা? তোমার নাম ত সোনা?

শেষের প্রশ্নের জবাব দিলাম, প্রথমটার জবাব আমি নিজেই জানি না—পরকে দেব কি।

তিনি বল্লেন—দেখ বাছা, এ পাড়াটি ভাল নয়। অবিশ্যি নিজের বাড়ী তোমার এখানে থাকতে পারলেই ভালো হ'ত কিন্তু এ বড় নচ্ছার পাড়া—আর কে-উই নেই। এখানে থাকা চলবে না। আমি বলি কি—তুমি আমাদের ওখানেই চল। এবাড়ীটা ভাড়া দিলেই চলবে। আমার ওখানে ঘরের ত দুঃখু নেই, দুটো ঘর তোমাকে ছেড়ে দেব, আসবাব পত্র সব এখান থেকেই নিয়ে যাবে—কদমের ত জিনিষের দুঃখু নেই।

আর একজন বল্লেন—কিসেরই বা দুঃখ ছিল নেত্য? এত পয়সা, বাড়ী গাড়ী—কদমের মত করতে কে পেরেছে—বল্ দেখি।

নেত্য বল্‌তে লাগ্‌লেন—আজকের দিনটা থাক বাছা! কাল আমি এসে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব—ভাড়াটেও একটা ডেকে নিয়ে

আস্‌ব। এটা আবার ভদ্দরপাড়া কিনা ভদ্দরলোকই ভাড়াটে রাখ্‌তে হ'বে।

বিস্ময় আমার কণ্ঠে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিল কিন্তু কথা কইবার সুযোগ পেলাম না।

নেত্য বল্‌তে লাগলেন—কাল—বুঝ্‌লে বাছা! কাল এসে নিয়ে যাব! কিচ্ছু ভেব না তুমি! আমার কাছে ঠিক মায়ের আদর পাবে। সুখ ঐশয্যি সব যোগাড় আমিই করে দেব।

এসব কি বলছেন আপনি?

দু'মিনিট হাঁ করে থেকে নেত্য ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন—গোঁসাই বাড়ীর কথকতা বলছি। বলি বাছা, মা কি মরবার আগে কিছুই বলে নি? ও কালীতারা, এ বলে কি লো!

কালীতারা বল্লেন—কদমের সব তাতেই বাড়াবাড়ি ছিল দেখিস্ নি নেত্য, নইলে বুড়ো মেয়ে, সাত ছেলের মা, মেয়েকে রেখেছিল আবার বড়িঙে। ওবয়সে আমরা বালাখানা গড়েছিলুম, কি বলিস ভাই ডালিম?

ডালিম তখনই বল্লে—ঐ ত সময়।

নেত্য বল্লেন—বাছা আমরা তোমার আপনার জন। হিত্ চিন্তেয়ই কর্‌ছি। এখানে থাকা তোমার চল্‌বে না—মা-মাগী অনেক উঞ্ছবৃত্তি করে বাড়ীখানা করেছে, নগদও কিছু আছে ত……বলি সিন্দুকে কি পেলে খুলে?

এ-কেমন আপনার জন—আমি তবু বুঝতে পারলাম না। বল্লাম—দেখি নি।

নেত্য বল্লেন—খোলই না বাছা, দেখি! কদমায়ে আমার কি ছিল —তা তুমি জানবে কি বল। জানে বটে এরা! কি বলিস, কালী, কেমন কি-না মাতঙ্গ?

সাঙ্গোপাঙ্গকে কথা কইতে না দিয়েই আমি বল্লাম—দেখুন, আমাকে মাপ করুন!

সকলে আমার পানে চেয়ে ‘থ’— বনে গেলেন। মাতঙ্গ থিয়েটারের সুরে ও ভঙ্গীতে বল্লে—তার মানে……

আমি এখন সিন্দুক খুলতে পারব না।

একটু গা-টেপা-টিপি করে নেত্য বল্লেন –তা-নয় না-ই দেখালে বাছা। তোমার ধনদৌলুত দেখে কিছু আমাদের চারটে করে হাত পা বাড়বে না। কিন্তু এখানে তোমার থাকা হ’বে না সে আমি বলে দিচ্ছি। কি বলিস্ লো মাতঙ্গ—

মাতঙ্গ কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন—আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম—আমি এখানেই থাক্‌ব।

নেত্যও দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন, হাত পা নেড়ে বল্লেন—তুমি থা-ক্‌-ব বল্লেই হ’বে? থাকা তোমার হ’বে না এখানে। এ তুমি দেখে নিও—আমার নাম নেত্য—কলকেতায় আমাকে চেনে না—এমন পুরুষ বাচ্ছা নেই—বুঝলে বাছা! ও-সব নবাবা মেজাজ আমাকে দেখিও না। থাক্‌বে থাক্‌বে করছ—এই মুঠোর ভেতর কতগণ্ডা গুণ্ডো আছে তার খবর রাখ কি!—বলে হাতটা মুঠো করে আমার সামনে বাড়িয়ে দিলেন।

মাথার আগুন জ্বলা যে কাকে বলে’ তা এই প্রথম বুঝলাম।

বল্লাম—আমি যাব না—বলে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাব—নেত্য আমার হাত ধরে এমা একটা ঝাঁকুনি দিলেন যে আমি সশব্দে মাটীতে বসে পড়লাম।

নেত্য কালীতারার জামার পিঠের বোতামটা এঁটে দিয়ে বল্লেন—সেই কালেই বলেছিলুম, কদম, কালেজে দিস্ নে, ফেসিয়ান্ শেখাস নে, পস্তাতে হ'বে। তা শুনলে কি আমার কথা। অদেষ্ট, অদেষ্ট নৈলে সব কাজই আমার সঙ্গে পরামর্শ করে করত, এইটের বেলাই এমন অবাধ্যি হ'বে কেন? বরাতে দুঃখু থাক্‌লে ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণুও খণ্ডাতে নারে!—বলি হ্যাঁ-দেখ-বাছা, নেকাপণা করু নি। আমি যা বলি:......

আমি রক্তাক্তমুখে বলে উঠলাম—আপনি কিছু বলবেন না। শুধু এই দয়াটি করুন। মরতে হয় সেও ভালো, এইখানেই আমি থাক্‌ব, এখান থেকে কোথাও যাব না।

নেত্য মুখ চোখ্ লাল করে বল্লেন—থাক না দেখি, ক'টা ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে—একবার দেখে নিই। এত বড় আস্পর্দ্ধা নেত্যর কথার উপর কথা! কেন? কিসের জন্যে? এত দর্প কিসের? কত টাকা পেয়েছ যে আমাকে অগেরাহ্যি! হাত পা কেটে ভাসিয়ে দেব জান-না!

তবু আমি জোর করে বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু গলায় আমার রক্ত এসে জমেছিল, কথা বেরুল না।

নেত্য বাঁ হাত কোমরে রেখে ডানহাতটা আমার দিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন—থাক্ তুমি, তোমার দর্প চূর্ণ-চূর্ণ করব—তবে আমি

নেতা! ওঠ মাতঙ্গ,—চ'—একবার ভোঁদাকে খবর দিয়ে যাই। বেটি সাবিত্রী-কন্তে অরুন্ধতী!……আমাকে অপমান করা!… …

আর আমি শুনতেও পেলাম না, দৃষ্টিও লোপ পেল!

হায়! এ কি এরা আমাকে শুনিয়ে দিলে! এ-যে আমার চারিদিকে আগুন জ্বেলে দিয়ে গেল!

প্রথম পরিচ্ছেদ

নেতা 'স্বরাজ' পাইল কি ?

জ্ঞান হ'লে দেখি, রামধনিয়া আমার মাথাটা কোলে তুলে বরফ দিচ্ছে। আমার ইন্দ্রিয় এতই শিথিল হ'য়ে গেছল যে মাথাটা নামিয়ে নেবারও ইচ্ছে হ'ল না। আজ আমি ভাবতে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই—কি করে সে আমি সহ্য করেছিলাম! একটা চাকরে যে আমার মাথাটা কোলে নিয়ে বসেছে—এ অপমান নীরবে মেনে নিয়েছিলাম আমি কেমন করে!

যখন হাতে পায়ের শক্তি ফিরে এল, মাথাটা নামিয়ে নিলাম। রামধনিয়া গামছাশুদ্ধ বরফ মাটিতে রেখে বল্লে—দিদিমণি বল ত ডাক্তার বুলাই।

না—বলে আমি চোখ্ বুজলাম।

কেন আমার চোখ মুদ্রিত হ'য়েছিল—তা ভাবতে আমার মাথায় আবার আগুণ জ্বলে উঠ্‌ল। এ কি নিদারুণ বজ্রাঘাত!......তার পর আমার মনে নেই।

সন্ধ্যে হ'তেই রামধনিয়া বল্লে—বাবুরা এসেছে।

সর্ব্বাঙ্গে যেন কে জল বিছুটি মাখিয়ে দিলে, দুর দুর করে উঠলাম। রামধনিয়া নড়ল না, দাঁড়িয়ে রইল। আবার তাকে সরে যেতে বল্লাম

—সে গেল না, বরং একটু নড়ে' চড়ে একবারে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। আর তার পেছন থেকে সেই লম্বা চওড়া লোকটি বল্লেন—আজ যাই তবে —কি বল, সোণা?

যান--যান্—এখনি যান্—কোনদিন আর আসবেন-ও না।

দিব্যেশ বল্লেন--কোনদিন আসব না—বলছ কেন, তুমি কি জান না......

সব জানি। আপনি যান্, বলে দিচ্ছি—আর আসবেন না।

আমাকে মুখ ফেরাতে দেখে তিনি আর একটু এগিয়ে এলেন; আর্শির গায়ে তাঁর বিশুষ্ক মুখ ফুটে উঠ্ল।

যাবেন কি-না?—এ গর্জ্জনে দিব্যেশ যে বিচলিত হ'য়েছিলেন, আর্শিতে তার ছায়াও পড়ল।

দিব্যেশ ম্লানমুখে বল্লেন—যাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা বলে দাও, কেনই বা আস্‌তে বলেছিলে, আর কেনই বা এমন দূর করে দিচ্ছ? আজ ত আর আমি বল্‌ছি নে—আজ তোমার মনঃকষ্ট......

মনঃকষ্ট আমার কিছু নেই—আপনি যান্—যান্ বল্‌ছি।

দিব্যেশ বেরিয়ে গেলেন! আমি যে আছাড় খেয়ে পড়েছি—তার শব্দেই আবার ফিরে দাঁড়ালেন! বুঝেই আমি মুখ তুলে বল্লাম— আবার এসেছেন!

দিব্যেশ শুষ্কস্বরে বল্লেন—তুমি......

আপনি যাবেন না?—আমি যেন মাতালের মতই দাঁড়িয়ে উঠলাম— দিব্যেশ দৌড়ে নেমে গেলেন। নীচে একটা কোলাহল উঠ্‌ল, তখনি আবার নিভে গেল। আমি কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লাম। সেদিনটির

কথা আজও আমার মনে আছে—আমি সীতার মতই বসুমতীর গর্ভ প্রার্থনা করেছিলাম।

সমস্ত রাত এই চাপা আগুনের ভেতর বাস করে সকালে যখন উঠে দাঁড়ালাম, পা টল্‌ছে, মাথা যেন নেই। চাকর দু'টো ঝি মাগীটার সঙ্গে হাসিতামাসা করছিল—সামনের বাড়ীর একটি বৌ ছাদে কাঁথা শুকুতে দিতে এসেছিল—আমাকে দেখেই সরে গেল।

যে যন্ত্রণা আমাকে সারাক্ষণ খণ্ড খণ্ড করে বিঁধছিল, আমি যেন আগে তার কারণটি ঠিক বুঝতে পারি নি। সামনের বাড়ীর বৌটির মুখ ফিরিয়ে সরে যাওয়া দেখে' আমার মাথা ঘুরে গেল। আবার বিছানায় গিয়ে পড়লাম।

সেই মুহূর্ত্তে আমি বুঝতে পারলাম যে আমার প্রাপ্য আমি পেতে সুরু করে দিয়েছি। কা'র নিদারুণ নির্ম্মম অভিশাপ আমার 'পরে পড়েছিল, আমি জানি নে—তার চেয়ে নির্ম্মম কঠোর কিছুই ছিল না।

চোখ্ চেয়ে দেখি—ঘৃণিত ঘরটার ছবিগুলো অবধি যেন করুণ দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে আছে। ঘরের নগ্ন ছবি, সোডার বোতল, সিগারেটের ভস্মাবশেষ অংশ সব যেন একেবারে জ্বল্ জ্বল্ করে উঠেছে।

বিছানা ছেড়ে বারান্দায়, বারান্দা থেকে ছাদে—আগুনের হল্‌কার মত আমি ছুটে ছুটে বেড়াতে লাগলাম। রামধনিয়া পরে বলেছিল—যে, আর খানিক অমনি দেখ্‌লে সে হাঁসপাতালে খবর দিত!

ছাদ থেকে এসে আবার সেই বিছানাতেই শুয়ে পড়লাম!

আমার মনে হয়েছিল তখন, যেন আমি দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠেছি—স্বপ্নের কান্না, চোখের জল কেউ দেখ্‌তে পাচ্ছে না—কিন্তু আমার যে

বুক ভেসে যাচ্ছিল তা ত আমি জানি। সবার চেয়ে দুঃখ এই যে সে স্বপ্ন নয়!

যে দিকে চোখ যায় চলে যাই, কি খানিকটা বিষ খেয়ে ফেলি—এ সব চিন্তাও মনের মধ্যে এসেছিল, কিন্তু পাপ ত আমার কম নয়। এই ঘৃণিত অভিশপ্ত নারীজীবন মরণাশ্রয় করতে চাইলে না! আমার মুকুলিত নারী দেহে যে আগুন জ্বলছিল, যার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে ব্যাধের সামনে হরিণীর মত আমি ছুটোছুটি করছিলাম, তারই মধ্যে কি-যে সে দেখেছিল সেই জানে, মুক্তির এমন সরল পথটি চোখে দেখ্‌তে পেলে না! আজ আমি জোর করে বল্‌তে পারি—মন আমার এই-যে ভুলটি করেছিল, সারা জীবন চোখের জলে, অনুতাপেও তার খণ্ডন হয় নি। আজ সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করতে ইচ্ছে হয়—নারী সৃষ্টির অপকৃষ্ট সৃষ্টি হচ্ছে নারীর মন! পুরুষের মন চেনবার চেষ্টা করেছি, বেশীর ভাগই চিন্‌তে পেরেছি, কিন্তু নিজের মনের কোন কূল কিনারা আমি চোখে দেখতে পাই নি! রমণী তার স্রষ্টার কাছে সাগ্রহে যেন সব নেয়—রূপ, যৌবন, বর্ণ গন্ধ—সব নেয়, কেবল সেই মনটি নয়। এ ত মন নয়, এ-যে গোখরো সাপ! এ-যে নিজের বুকে বাস করে' ফণা তোলে!—এ মন পাওয়ার জন্যে যেন তারা লালায়িত না হয়!

আমি ত কেতাবে পড়েছি কম্পাসের যখন জন্ম হয় নি, তখনও সমুদ্রে জাহাজ চল্‌ত—মন না থাক্‌লেও নারী জাতিটা চলে যেতে পারবে! আমি ত মরতে চেয়েছিলাম, মরতে পারলে এত বড় পাপের ইতিহাস লেখবার ধৃষ্টতা আমাকে করতে হ'ত না—কিন্তু সর্ব্বনেশে মন আমার মরতে ভয় পেল।

সে ত মৃত্যু নয়, সে যে নবীন জীবন ধারণ করবার পথ মুক্ত হ'ত।

আবার ঠিক সন্ধ্যেবেলা রানধনিয়া ভয়ে ভয়ে বল্লে—দিদি, সোই বাবু।

আবার এসেছে! এত বড় নির্লজ্জ সে। কেন রানধনিয়া তা'কে গলা ধরে' বার করে দিলে না—ভাবছি, দিব্যেশ মটু মটু করে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ালেন।

বুকে বাঁধা পাকান চাদরটি খুলে কাঁধে ফেলে বল্লেন—কেমন আছ, সোনা?

কোন উত্তর না পেয়ে এক মিনিট পরে আবার বল্লেন—আমাকে দয়া কর তুমি! তোমার জন্যে কষ্ট কি কম করেছি, সোনা? তুমিই বল··

আমাকে নিরুত্তর দেখে সে গম্ভীরভাবেই বলে যেতে লাগল—দেখ, প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছিলুম, পাবার জন্যে একেবারে লালায়িত হ'য়ে উঠেছিলুম, শঙ্কর আমার সহায়—তোমায় তিনি মিলিয়ে দিয়েছিলেন! নইলে······

বল্‌তে আপনার লজ্জা হয় না। আমি মেয়েমানুষ, আমার যেটুকু ভদ্রতা জ্ঞান আছে—আপনার তা'ও নেই—বলে ঘরময় যেন ফুলকি ছড়িয়ে আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। রানধনিয়া টুক্ করে সরে গেল।

দিব্যেশ বল্লেন—লজ্জা কিসের! তোমার মা'র সঙ্গে আমার সব কথা হ'য়েছিল, তুমি কি তার কিছুই জান না?

আমি চীৎকার করে বল্লাম—থাক্। জানাজানির দরকার নেই। যান্—আপনি নীচে।

দিব্যেশ চাদরটা বুকে বাঁধতে বাঁধতে বল্লেন—আজও যাব ?

যান্— কথা কইবেন না।

দিব্যেশ বোধ করি ভয় পেয়েছিলেন, নেমে গেলেন। সদর দরজা খোলার শব্দ শুনেই আমি রামধনিয়াকে ডাক্ দিলাম। যদি দেখা পায় —বাবুকে ডেকে আনতে আদেশ দিয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

দিব্যেশ আস্তেই বল্লাম—আপনি কী চান ?

এ সময়কার তাঁর চোখের অতীব করুণ দৃষ্টিটা আমার জ্বলন্ত চোখেও পড়ল।

দিব্যেশ বল্লেন—কী চাই আমি! শুনে তুমি হাসবে না ?—আমি তোমার ভালোবাসা চাই!

এ কথাটা এমন ভাবে এমন স্পষ্ট উচ্চারণে পৃথিবীর কেউ যে বল্‌তে পারে আমার তা জানা ছিল না। নর নারীর ভালোবাসা যে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে—প্রস্ফুটিত কুসুমের গন্ধ বাতাসে ভেসে ওঠার মত। তার জন্য ত ভাষার দরকার হয় না! সে-যে মৃগনাভির মত আপনার গন্ধে বিভোর হয়ে ওঠে—সে ত কাউকে প্রকাশ করে' দিতে হয় না।

দিব্যেশ আবার বল্লেন - তোমার জন্যে আমি কী না করেছি, সোনা ? আমার এত শ্রম কি বৃথা হ'বে ?

আমি যে সে শ্রমের জন্যে দায়ী নই —একথা বল্‌তে পারলাম না।

দিব্যেশ একটি একটি করে' বল্‌তে লাগলেন—আমার জীবনে সে এক স্মরণীয় দিন যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম······

দেখুন, আপনি যা ভাবছেন, তা কখনই হ'তে পারবে না। প্রথম যেদিন আমাদের বাড়ীতে আমি আপনাকে দেখেছিলাম, সেদিন অতি

বড় মিথ্যার আবরণে ঢেকে আমার মা আপনার পরিচয় দিয়েছিলেন বলেই—সত্যি কথা বল্‌ব—আমার মন আপনাকে চেয়েছিল. তখন আমি জান্তাম না—আপনার প্রস্তাবটা এত ঘৃণিত, এত ·····আমি যেন তক্ত বাক্য সংগ্রহ করতে লাগলাম।

দিব্যেশ বল্লেন—ঘৃণিত বল্‌ছো কেন ?

তা ছাড়া আর কী বল্‌ব! এখানকার পরিচয় আমার এতই কম ছিল যে, এর আগে কোন কথা জোর করে বলবার আমার ছিল না। কিন্তু, মা'র বন্ধুরা এসে আমার নিজের ছবিটা আমার চোখের সামনে এমন করে' এঁকে দিয়ে গেছেন—যে এখন আর কিছুমাত্র অস্পষ্টতা নেই।

দিব্যেশ মৃদুস্বরে বল্লেন—কি এমন জেনেছ······

যদিও না জানাই ছিল ভাল। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি আপনাকে, কি চান আপনি,—আমাকে নিয়ে কি করবেন ?

দিব্যেশ উত্তেজিত স্বরে বল্লেন—কি করব! কি করতে না পারি আমি! তোমাকে পেলে······

পাওয়া পাওয়া করছেন—আমাকে সংসারের সুখ দিতে পারবেন ?

এ ধারণা আমার হ'য়ে গেছল যে এর চেয়ে অসম্ভব, অপ্রাকৃত আর কিছু নেই।

দিব্যেশ বল্লেন—পারব না! খুব পারব! আমরা চিরদিন দু'জনে এখানেই বাস করব।

তা হয় না! এখানে বাস আমি করব না। দূর দেশে কোথাও

যেখানে কেউ আমাদের চিন্‌বে না, জান্‌বে না—সেখানেই আমি থাক্‌তে চাই। পারবেন আপনি? সে সাহস আছে আপনার?

কেন থাক্‌বে না—খুব আছে! তুমিই আগাগোড়া সব ভেবে বল দেখি—আমার সাহসের পরিচয় কি তোমরা পাও নি! কোথা থেকে কোথায়……

কিন্তু এ ত তা নয়—এ-যে সারা জীবন ধরে বুক বেঁধে বইতে হ'বে—পারবেন?

তুমি আমার হও—আর সব পারব, সব পারব! আর কী বেশী বল্‌ব।

কান থেকে বুক পর্য্যন্ত চিড় চিড় করে' উঠ্‌ল। দু'মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে আমি বল্লাম—এ কি সত্য বল্‌ছেন আপনি?

এতক্ষণ এত আঘাতেও যা হয় নি, এবার তা হ'ল;—দিব্যেশ বিবর্ণ-মুখে আর্দ্রস্বরে বল্লেন—আমাকে সন্দেহ কর' না সোনা! আমি তোমাকেই চাই—আর কিছু চাই নে! তোমাকে চেয়েছি পেয়েছি; কেমন করে চেয়েছি তা জানিনে, কেমন করে' পেয়েছি তা'ও জানিনে! এই জানি পেয়েছি! যদি না পেতুম, সারা জীবন হয়ত তোমার ধ্যান করেই কাটিয়ে দিতুম, কিন্তু তুমি যে আমার কামনার ধন হ'য়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ—এখন ত কোন বাধাতেই তোমাকে না পেলে আমার চলবে না, সোনা!

তার কথার ভেতর কি ছিল, জানি নে—কিন্তু একটি একটি করে' আমার হৃদয়ে ঢুকে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। সেই যে একটা কি কাঁচ আছে, খুব স্বচ্ছ, শীতল—রোদে ধরে যেখানে আলো পড়ে সব পুড়ে ঝুড়ে যায়

ঠিক সেইরকম। প্রচণ্ড শীতে আগুন যেমন মধুর, তার থেকে দূরে যেতে চায় না কেউ—আমিও সরে যেতে পারলাম না।

দিব্যেশ বলতে লাগলেন—এ ত কথার কথা নয়, সোনা! আমার মনপ্রাণ যে আমি তোমাকেই সঁপেছি—একি তুমি একটুও বুঝতে পারছ না! তোমাকে অদেয় যে আমার কিছুই নেই আমার এ কথাটি কি তুমি অবিশ্বাস করছ?......

দেখুন, সে দেওয়া আমি চাই নে। আমি কি চাই তা ত বলেছি আপনাকে।

আমিও সেইকথাই বলছি। সোনা, আমার হৃদয় মন সব তোমার; তুলে নাও—এই তোমার পায়ের নীচে সব আমি রাখলাম— বলেই দিব্যেশ আমার হাত ধরে ফেললেন।

যতক্ষণ তার কথাগুলো বেলাপন্থত সমুদ্র তরঙ্গের মত আমার হৃদয় কুলে আছাড় বিছেড় খাচ্ছিল—আমি হাত ছাড়াতে পারি নি। তরঙ্গ ফিরে যেতেই বালুকাময় বেলা যেমন চিক্ চিক্ করে ওঠে—আমিও হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বল্লাম—আপনি আজ যান আজ আর আমি কথা কইতে পাচ্ছি নে।

দিব্যেশ কাতরকণ্ঠে বল্লেন—আর আমাকে দুঃখ দিও না।

দুঃখ আপনার নয়, দুঃখ আমার! আজ যান আপনি। দু'দিন বৈত নয়—আজ যান্......

দু'দিন পরে আস্‌ব?

আমি উত্তর দিয়েছিলাম কি না মনে নেই। তিনি চলে যেতেই আমি কেঁদে ফেল্লাম। কেবলই মনে হ'তে লাগল—এ চাতুরী কেন

করলাম! যে পথ দিয়ে নিরাশপদভরে দিব্যেশ চলে গেলেন, তার সঙ্গে সঙ্গেই সে পথটাও যেন মহামরুর মত শূন্য হা হা হ'য়ে গেল।

আবার ভাবলাম—দু'দিন বৈত নয়।

ভাবতে ভাবতে চোখের পাতা মুদে এল। ঘুমে নয়, আবেশে। তখন মনে হ'ল—আপনার জন, পরমাত্মীয় নেত্য যা বলে গেছে—সে নিশ্চয়ই সত্যি নয়! তা' হ'লে কি আর দিব্যেশের এত আগ্রহ থাকৃত, না সে আসৃত আমাকে তার জীবনসঙ্গিনা করতে। অন্য জাতের নয় অন্য স্থানের নয়, এযে হিন্দুর, বাংলার, বাঙ্গালীর জীবনের সঙ্গিনী! এর চেয়ে বড় কথা অভিধানে নেই, এর চেয়ে পবিত্রতা দেবতার মন্দিরেও আছে কি না সন্দেহ। এ যে সুখে দুঃখে, জীবনে মরণে, ইহকালে পরকালে পরস্পরকে একীভূত করে রেখে দেয়! সংসারে, বনে, ধর্ম্মে—তাদের যে ভিন্ন অস্তিত্বই থাকে না—এ আর না জানে কে? দিব্যেশও জানে! নেত্যর কি অভিসন্ধি ছিল ঠিক বল্‌তে পারি নে, তবে খবরের কাগজে মাঝে মাঝে যে সব ঘটনা দেখতে পেতাম সে সব যে নেত্যর মত মহিষ-মর্দ্দিনী দানবদলনীর দ্বারাই সম্পন্ন হ'ত—তা'তে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহও রইল না আমার মনে! সে নিজেই বলে গেছ্‌ল—নেত্য না পারে কি? —পরম মিথ্যাবাদিনী হ'লেও নেত্য এ'টা যে ধ্রুব সত্যই বলেছিল আমি আমি তা স্বীকার করচি! নেত্য সব পারে। তার চেহারাটা মনে হ'লে এখনও আমার মাথার কেশ অবধি শিউরে ওঠে! তার হাতের পাতা দু'টো যেন বাঘের থাবা, তার ঘাড়টা যেন একেবারে বৃষস্কন্ধ!—সব চেয়ে চমৎকার হ'চ্চে তার গলাটা, আর জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের মত মেজাজটা! ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যেন নেত্যকে 'স্বরাজ' দিয়ে, পাইল

তুলে, জাহাজ ভাসিয়ে ভারত মহাসাগরে পাড়ি মেরেছে। মাতঙ্গ, ডালিম, কালীতারা—এরা সব কাউন্সিলের বড় বড় মেম্বর—তা'দের নিয়ে স্বয়ং নেত্য সরজামিনে তদারক করতে এসেছিল, সেই যে এদেশের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ, এবং তার হাতে অগণিত পুলিশ-ফোর্সও মজুত আছে—তা'ও সে আমাকে জানিয়ে গেছল। তার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করলে যে আমাকে একশ সাতাশ ধারার আইনে পড়ে মারা যেতে হ'বে এবং সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হ'বে—আইনের এ সব মাচকোফের জানাতেও সে ভোলে নি।

কিন্তু আমি ত জান্‌তাম, সত্যিই ইংরেজ ভারত-সাগর পার হয় নি, আপাততঃ সে ইচ্ছা তাদের মনের কোণেও নেই ; কোনদিনই সে দুর্দ্দিন হ'বে কি না—সে বিষয়ে তাদের ও আমার—উভয়েরই সবিশেষ সন্দেহ আছে, এবং নেত্যও রাজ্যাধিকার পায় নি—তা'কে ভয় কী! সে আমার কি করবে? দিবোশ যে কোন বাধাই মানবে না, এ আমি নিজের কানেই শুনেছি বলে', অল্পে অল্পে নেত্যর কথাগুলি মনে করে' আমি একটু হেসে ফেললাম। যত বড় শয়তানই হ'ক্ সে—তার ওপর রাগ আর রইল না—বরং একটু দুঃখ হ'ল! তা'ও হ'ল সে না-কি পরিচয় দিয়েছিল আমার (!) মা কদমের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

'স্বরাজ' পাইয়াছে।

এমন ঘটনা যে কখনো ঘট্‌তে পারে, ইংরেজ রাজত্বের সুপ্রতিষ্ঠিত শান্তি বিধ্বস্ত করে মাঝে মাঝে এমন অসম্ভবও সম্ভব হয়, ইতিহাস তা না লিখ্‌লেও আমার জীবনে আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি। অপ্রিয় সত্য বলার অপরাধে ইংরেজ যদি ফাঁসীকাঠেও ঝুলিয়ে দেয়—আমি তা বল্‌তে বাধ্য।

রাত দশটা হ'বে, আমি মড়ার মত নিস্পন্দ হ'য়ে পড়ে আছি, কটা লোক ঘরে ঢুকে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বল্লে—কি জিনিষপত্র আছে তোমার, নিয়ে নাও, আমাদের সঙ্গে যেতে হ'বে। নাও, ওঠ, শুয়ে থাক্‌লে চলছে না!

নেতার সকাল বেলার শাসন ধক্ করে আমার মনে পড়ে গেল। কোথায়, কেন যেতে হ'বে—বুঝতে দেরী হল না। ভয়ে ভাবনায় আমার সর্ব্বশরীর—কণ্ঠ পর্য্যন্ত আড়ষ্ট হ'য়ে গেছল।

তারা আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বজ্র গম্ভীরস্বরে বলে উঠ্‌ল • ওঠ!

চেয়ে দেখলাম—এক একটা যেন যমদূত! এমন চেহারা আর কখনো দেখি নি। চারজন লোক, অনাবৃত সুপুষ্ট দেহ, হাতে গলায়

কালো কার বাঁধা—লাঠি টাঠি দেখতে পেলাম না। কিন্তু তাতেও আমার সাহস বাড়ল না। আমার একার পক্ষে এদের একটা হাতই যে যথেষ্ট—তাদের প্রতিরোধ করার এতটুকু শক্তিও আমার নেই দেখেও, একবার যেন যাচাই করার উদ্দেশ্যেই বল্লাম– যদি না যাই?

এর ভেতর যদি ফাঁদি নেই। যাবে কি-না, তাই বল, তারপর আমরা দেখে নিচ্ছি। -বলে লোকটা হো হো করে' হেসে উঠল।

তাদের শক্তির তেজে, অথবা নিজের দৌর্বল্যে—যাতে করেই হো'ক, আমি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লাম—আমার বাড়া কি হবে?

সে ব্যবস্থা নেত্য করবে। তোমার টাকা কড়ি কি নেবার আছে নিয়ে নাও।—বলে সে সিন্দুকটা দেখিয়ে দিলে।

আমি বল্লাম—থাক্। চল কোথায় যেতে হ'বে?

নেবে না?

না। চল।

যে লোকটা আমার সঙ্গে কথা কচ্ছিল, সে পাশের একটা লোককে বল্লে—মোনা, তুই থাক্ এখানে। আমি নেত্যকে বলি গে—সে যা বলে তো'কে খবর দেব, বুঝলি। হুঁসিয়ার থাকিস, টাকা কড়ি আছে।

সে লোকটা বলে -আচ্ছা। একটু রসদ চাই যে ওস্তাদ!

ওস্তাদ ট্যাঁক থেকে কি বের করে' তার হাতে দিয়ে বল্লে—হুঁসিয়ার।

নীচে আম্‌তে নাম্‌তে অনুশোচনায় আমার মন গুম্‌রে মরতে লাগল — কেন আজ দিব্যেশকে সে বিদায় দিয়েছিল! সে থাকলে ত এ বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারত। এত বড় অবিবেচনার ক্ষতি যে

কোনদিনই পূরণ হ'তে' পারবে না—ভেবে আমার মাথা কুটতে ইচ্ছে হচ্ছিল। দরজার কাছে এসে ওস্তাদ বল্লে—তোমার চাকর নেবে সঙ্গে?

না।

গাড়ীতে উঠে' বসেই আমার মনে হ'ল—এ সময়ও যদি সে এসে পড়ে! কিন্তু হায়! এদের কবল থেকে উদ্ধার করতে কলকাতার অসাড় রাস্তায় জনমানবও দেখতে পেলাম না যে চেঁচিয়ে বলি—ওগো আমাকে ডাকাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

দেখিছি ত, গাড়ী করে' রাস্তাঘাটে দিনের বেলায় যেতে কত শত সাদা কালো রং বেরঙের পুলিস ইংরেজ রাজত্বের স্বর্ণছত্র মাথায় দিয়ে রাস্তা আলো করে দাঁড়িয়ে থাকেন দরকারের সময় তাঁদের দেখা পাওয়া আরাধনা করে' ভগবান পাওয়ার চেয়েও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল! কোনদিকে কাউকে দেখতে পেলাম না। কতগুলো বড় বড় রাস্তা পার হ'য়ে ত গাড়ী ছুটছিল এবং আমার চোখের তারা ত নড়ে নি—এক মহাপ্রভুরও দর্শন মিলিল না। লোকদেখানে, ভাড়া করা বলব না ত কী বল্‌ব—এদের!

ওস্তাদ আর তার চেলারা সব ছাদেই বসেছিল, গাড়ী থাম্‌তেই নেমে এসে দরজা খুলে বল্লে—এস।

গাড়ীর শব্দ শুনে বাড়ীর দরজা খুলে যে এসে দাঁড়াল, গ্যাসের আলোয় তার চেহারা আমার সামনে ধূ ধূ করে আগুন জ্বেলে দিলে!

নেত্য বল্লে—গঙ্গা, নামানা হাতটা ধরে……

গঙ্গা ওস্তাদ হাত বাড়াতেই আমি নেমে পড়লাম। নৈত্য তখন আর কিছু বল্লে না। উপরে তার ঘরে বসিয়ে বল্লে - দাও সব তুলে রাখি

...·..কিছু ভয় কর' না ..আমার কাছে রাখাও যা, বিশহাত মাটির নীচে পুঁতে রাখাও তাই। দাও···

আমি বল্লাম—আনিনি কিছু।

নেত্য গালে হাত দিয়ে বল্লে—সে কি! কার ভরসায় ফেলে এলে বাছা? টাকা কড়ি গয়না পত্র ত কদমের কম ছিল না। এমন ত মেয়েও দেখিনি বাছা,—ফেলে এলে কি বলে? ও গঙ্গা, গঙ্গা, গেলি না কি?

গঙ্গা বল্লে—মোনাকে আমি বসিয়ে এসেছি, নেত্য। আমার খবর না পেলে নড়বে না সে সেখান থেকে। ওকেও বল্লাম যে বাছা নিয়ে চল, ও আনলে না, তা কী করব বল!

নেত্য একবার আড়নয়নে চেয়ে বল্লে হুঁ। আচ্ছা তুই যা. কাল সকালে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দৃপ্তস্বরে বল্লাম এখানে এনেছ কেন আমাকে?

নেত্য হেসে উঠলো। আমাকে ঠেলে দিয়ে, সদর দরজাটি বন্ধ ক'রে দিলে। অন্ধকারেও তার চোখ দু'টোর, আর একটা পলতোলা হারের দু'চারখানা চকচকে হীরের আলো জ্বেলে দিয়ে বল্লে কেন বাছা! তোমায় ত সকালেই বলে এসেছিলাম যে নেত্য যা বলে কাজে তাই করে!

মনে মনে বল্লাম—সে ত দেখছি কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি তাই জানতে চাই আমি।

এই সময়ে আর দু'টি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়িয়েছিল, অন্ধকারে তাদের

দেখতে না পেলেও, আমার এ বিপদের সময়েও যেন একটা জড়তা এসে গেল। একবার ইচ্ছে হল, নেত্যকে ঠেলে ফেলে দিয়ে সামনের ঐ আলো জ্বালা ঘরটায় ঢুকে পড়ি যা থাকে অদৃষ্টে তারপর। কিন্তু ইচ্ছে হলেও অনেক সময়ে নিজে যে সে কাজ ঠিক করা চলে না, তার পরিচয় আগেও অনেকবার পেয়ে এসেচি।

নেত্য বল্লে—দেখ বাছা, চোখ রাঙ্গিও না। তোমার চোখ রাঙ্গানীর কেউ ধার ধারে না। যা বলি মন দিয়ে শুন। কোন হাঙ্গামা টাঙ্গামা কর না, বেশ ভাল মানুষের মত থাক, নেত্য রাজার আদরে রাখবার ব্যবস্থা করে দেবে। ধনদৌলত গাড়ীঘোড়া আলবার্ট পোষাক যা খুসী, যা চাইবে ঘর ভরে পাবে। যে সব জিনিষের নাম বাপের জন্মেও শোন নি তাই নিজে পাবে!

কেউ যদি দু'টো পা দিয়ে নেত্যর গলাটা টিপে ধরত, তবে যেন আমি সুস্থ হতাম। আমার প্রবল নিশ্বাসের শব্দেই হোক বা যাতেই হোক একটু চমকে উঠে, নেত্য—খচ করে আমার হাতে টান দিয়ে বল্লে—ঘরে এস!

এক পা নড়ব না আমি!

বটে, নড় কি না—তাও দেখছি আমি!

পাশের একটা স্ত্রীলোক বল্লে—কেন মাসী জোর জবরদস্তী করছ! শুনেচ ত, সেদিন সে মোকর্দ্দমাটা পুতণা মাসীর......

রেখে দে তোর পুতণা মাসী! আমি অমন অনেক পুতণা বধ করতে পারি! নেত্যর সঙ্গে চালাকি!

কে শান্ত চোখে সে আঁধারেও আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—শুধু

চালাকির কথা হচ্চে না নেত্যমাসী ! ওর যখন এতই……

নেত্য আমার হাতটায় আবার খচ করে টান দিয়ে বল্লে—অমন ঢের দেখেছি ন্যাকাপনা……এস বাছা ঘরে এস ! ওরে অ নীহার ! আলোটা নিয়ে আয়-না বাছা !

আলো আসতেই সর্ব্বপ্রথম আমি চেয়ে দেখলাম, তাকে ! যে আমার পক্ষ নিয়ে ঝগড়া কচ্চে। কি শান্ত সুন্দর চোখ দু'টি ! কি পরিপূর্ণ গৌর রমণীয় মুখ—সব চেয়ে—কমণীয়তা যেন সারা মুখে কে রঙের মত বুলিয়ে দিয়েচে।

নেত্য বল্লে—এস……

পবিত্র-কোমল দৃষ্টিশালিনী বল্লে—মাসী একটা কথা বলি শোন।

নেত্যর কানে কানে কি বল্লে শুনতে পেলাম না। তার দরকারও হ'ল না ; নেত্যর গগনভেদী চীৎকারে প্রশ্নোত্তর সব সুস্পষ্ট হ'য়ে গেল।

নেত্য বজ্রগম্ভীরস্বরে বল্লে—তুলে রাখ, তোর নেকাপড়া, ঢের দেখেচি। এমন কত মা গোসাই আসে ; তার পর মন্দিরের চাঁতারেই পাঁঠার মাংস রাঁধতে বসে। বুঝলি, ফুলি ? বলে, কত গেল রসাতল, নেকা-পড়াউলি দেখাবে কতজল ! গলায় দড়ি, গলায় দড়ি !

যে স্ত্রীলোকটি আলো হাতে করে দাঁড়িয়েছিল সে বল্লে—ঘরে এস না বাপু ! হ্যাঁ ! মাগী যেন কি ?—সেও বেশ একটা ভ্রূভঙ্গ করে' আমাকেই দেখলে।

নেত্য আমায় টানতে টানতে যে ঘরটায় পুরলে সে ঘরটা দেখেই আমার মনে হল এ যেন সেই বাড়ীরই সেই ঘরটা, যে ঘরটায় সিগারেট খেয়ে দিব্যেশ বসেছিল, প্রথম যেদিন দেখা হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দিব্যেশ মানুষ।

একদিন গেছে আমার যখন নিজেকে ছাড়া কা'কেও বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সহজ ছিল না ; এমন কি ঈশ্বর বিশ্বাস করা ছিল ভারি শক্ত। আমার সে বয়সের মেয়েরা হয়ত এ কথাটা অস্বীকার করবে না এই সাহসেই বলতে পারলাম।

নেত্য আমাকে ঘরে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যেতেই ভুলটা অতি সহজেই আমার বোধগম্য হ'য়ে গেল। নিজেকে বিশ্বাস করে যে আমাকে ঠক্‌তে হ'য়েছে এ ত হাতে হাতে দেখলাম। দিব্যেশকে বিশ্বাস না করেই এ পাখীটা ব্যাধের জালে পড়েছে—সে ত আমার নিজের ছাড়া আর কারই ভ্রম নয়—এ জেনেছি বলেই মুমূর্ষুর মত হরিনাম আমার কণ্ঠে গুঞ্জরিয়ে উঠ্‌ল। যে নাম শুধু মনে করা বলি কেন—যে নাম এবং চেহারার সামনে দিয়ে যেতেও কোনদিন ফিরে চাই নি—আজ মুক্তির আশায় অনন্যোপায় হ'যে তাই যেন একমাত্র অবলম্বন ভেবে আঁকড়ে ধরলাম।

নেত্য ফিরে এল,—একলা নয়, সপ্তরথীবেষ্টিতা হ'য়ে। তাদের ভেতর একজন যুবাপুরুষও ছিল। সে ঢুকেছিল, সবার পেছনে, কিন্তু

তার দৃষ্টিটে ছিল সবার আগে। কোন্ মুনির গণ্ডুষে গঙ্গাপানের মত আমাকে নিঃশেষ করে বলে উঠ্‌ল—

কোন পগারে ছিল এমন সোনার পদ্মফুল (ও-মাসি) !

মাতালের মুখের গালাগাল শোনা চলে, স্তব শুন্‌তে পারা যায় না, অন্ততঃ আমি পারলাম না। তার ক্ষুধিত গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করতে আমি নেত্যর দীর্ঘ দেহের পার্শ্বে আশ্রয় নিলাম।

এ-যে কৈ মাছ—কড়ায় উঠেও লাফাতে হয়, নেত্য আমাকে লুকোতে দেখে বল্লে—অত······তে কাজ কি আর বাছা ! ও-হল আমার দুলাল, পেটের ছেলের মত, ওকে আবার লজ্জা কিসের !

শান্ত-সুন্দর চোখের আধিকারীণীও ছিল, সে একটু মুচকি হেসে বল্লে—মাসীর যেন ভীমরতি হয়েছে। ও নতুন লোক, জান্‌বে কেমন করে বাছা যে কোন্‌টি তোমার পেটের ছেলে, কোন্‌টি তোমার······

যুবাপুরুষ বল্লে—ঠিক বলেছ ফুলী বিবি ! তোমার বাবা জজ্ হওয়া উচিত ছিল !—বলে সে নিজের খেয়ালেই হাসতে লাগল।

যা আশা করেছিলাম, ঠিক তাই ! ফুলী বিবি আর উত্তর দিল না। সে থেমে গিয়ে যেন আমাকে বাঁচিয়ে দিলে ! যত কথা বাড়বে, এদের এখানকার স্থিতির পরমায়ু যে বাড়বে বৈ কমবে না জেনেই আমি কেবল নীরবতা প্রার্থনা করছিলাম।

নেত্য বল্লে—শুয়ে থাক বাছা কোন ভয় নেই। আমি এই পাশের ঘরটাতেই থাকব। রাত্রে যখন উঠ্‌বে—আমাকে ডেকো, নতুন যায়গা, হুঁচোট মোচট লাগ্‌বে। আর... হ্যাঁ হ্যাঁ সে শুড়ে বালি। সদর দরজার চাবি পড়ে গেচে, কিছু ভয় নেই।

হয়ত দরজা খোলা পেলে কলকাতার সহর একবার ভালো করে' পায়ে হেঁটে দেখা নিতাম সে পথও নেত্য বন্ধ করেছে, আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

চল বাপু চল—রাত হ'য়েছে .....

নেত্য হেসে বল্লে—তুই যা-না লা কুসমি! কে আর তোকে থাকতে বলেছে। বলি, বোতল টোতল এলো?

লজ্জা করে না মাসি? সে না......

এ-সব কথা হেঁয়ালির মত বোধ হতে লাগল। এত লোক রয়েচে কেবলমাত্র তাকে শুতে পাঠাবারই কেন এত আগ্রহ, আর তাতে লজ্জার কারণ যে কি আছে, আমি ত কিছুতেই ভেবে স্থির করতে পারলাম না।

দুলাল হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—চল মাসী চল, বিবিকে একটু শুতে দাও।

হ্যাঁ বাছা চল—বলে নেত্য সদলবলে বেরিয়ে গেল। মন যেন দুহাত বাড়িয়ে তা'কেই ধরতে যাচ্ছিল, যার কেবলমাত্র স্নিগ্ধ চোখ দুটি কেবলই আমার পানে চেয়েছিল!

দশমিনিট না যেতেই আবার পদশব্দ শোনা গেল। আমি খাটের বাজু ধরে বসেছিলাম, তাড়াতাড়ি উঠে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছি, ধীর পদে ঘরে ঢুকে সেই চোখ দুটির মোহ ছড়িয়ে দিয়ে বল্লে—কৈ শোও নি—ঘুম আসচে না?

না। আপনি একটু বস্‌বেন?

কেন বসব না ভাই!—খাটের উপর বসে আমাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে জিজ্ঞাসা করলে—নেত্যর হাতে পড়লে কি করে?

এর কাছে আমার জীবন যেন আগেই কে বলে দিয়েছে, তাতে গোপনতার লজ্জা বা কুণ্ঠা এতটুকু নেই। আমি তা'কে সব বল্লাম। শুন্‌তে শুন্‌তে সে আমার হাত চেপে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—পুলিসে খবর দেবে?

নেত্য পুলিসকে যে কত কম ভয় করে, তাও তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

সে বল্লে—তা ঠিক! নেত্য যে ডাক-সাইটে মাগী। ওকে ভয় না করে পুলিসেও এমন কেউ নেই। পুলিসের সাহেবেরাও ওর কাছে আসে। ও আবার বাড়ীতেই মদ বেচে কি-না……

তবে? তবে আমাকে কে রক্ষা করতে পারবে?

কি জানি ভাই—কে রক্ষা করতে পারবে। বড় শক্ত হাতে পড়েছ।

আচ্ছা ওর কি উদ্দেশ্য—তুমি বলতে পার?

ফুলী একটুখানি ভেবে নিয়ে বল্লে—কাল্ নেত্যর মুখেই শুন্‌বে।

তুমি বল্‌তে পার-না!

কথাটা যে রূঢ় হ'য়ে গেছল, তা আমি তার মুখ দেখে তবে বুঝতে পারলাম।

সে বল্লে—বল্‌তে আমি পারি, কিন্তু এখন থেকেই তোমার কষ্ট হ'বে। তার চেয়ে বলি কি!—আজ একটু ঘুমিয়ে নাও…

হা রে ঘুম! আর হা রে তুই আমার উপদেষ্টা! মাথায় যার ধুনুচির আগুন জ্বল্‌ছে তাকে ঘুমোবার উপদেশ দিতে নারী হ'য়ে তোমার

কণ্ঠে বাঁধ্‌ল না। আমি একমিনিট পরে বল্লাম—তা হোক, ঘুম আমার চোখে নেই, তুমি বল।

সে ইতঃস্তত করতে লাগল। মাথাটি নীচু করে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল, তার পরেই একেবারে দরজার কাছে এসে বল্লে—পারব না ভাই বল্‌তে, তুমি আমাকে মাফ কর।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত এর উপর শ্রদ্ধার আমার অন্ত ছিল না। মহা মরুর মাঝখানে একে যেন আমি একমাত্র পাদপ জ্ঞানে ছায়ান্বেষণে এর তলায় এসেছিলাম, কাছে এসেই ভুল ভেঙ্গে গেল। পরে শুনেছিলাম সে থিয়েটারের নায়িকা সাজে! সে ঠিক থিয়েটারের মত সুরে ও ভঙ্গীতে 'মাফ্‌ কর' বলে হাত ছুটি জোড় করে বেরিয়ে গেল। আমি দ্রুতপদে দরজাটি বন্ধ করে মাটিতে শুয়ে পড়লাম।

একটা বিলিতি গল্পের বয়েতে পড়েছিলাম, এক বন্দী কারাগারের ভিতর বসে রাত্রে কেবল প্রহরীর পদ-ক্ষেপ শুন্‌ত! কতবার সে পশ্চিম দিকে চলেছে, কতবার পূবে, কতবার ঘুমে ঢুলে পা টলেচে তার—বন্দী অক্লান্ত পরিশ্রমে তারই হিসেব রেখে যাচ্ছে। আমার মনের অবস্থা ঠিক সেই বন্দীটিরই মত হ'য়ে পড়েছিল। আমি যে বড় একটা কিছু ভাবছিলাম, তা নয়, বরং ভাবতে গেলেই খেই হারিয়ে ভারি ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছিল—ভাববার যেন কিছু নেই—এমনই ভাবটা! আমি কেবল লোকের পায়ের শব্দের গতি নির্ণয় করছিলাম।

নেত্য পুণ্য অর্জ্জন করতে পেছিয়ে 'নেই—,ভোরবেলায় গামছায় চাল-কলা বেঁধে গঙ্গাস্নানে চলে গেল. আমি ভাবলাম, হে মা গঙ্গা,

তোমার গর্ভে কি হাঙ্গর কুম্ভীর নেই? থাকেও যদি তারা কি ডাঙ্গার পুলিসের মতই শক্তিহীন হ'য়ে পড়েছে?

একা নেত্য নয়, এখানে দেখ্‌লাম সবাই নেত্য। আমাদের বোর্ডিংএর সামনে সাদারঙের একটা বাড়ী ছিল, বড়লোকের বাড়ী, রোজ সকালে আমরা দেখতাম, সে বাড়ীর অনেকগুলি বুড়ী, প্রৌঢ়া, যুবতী, কিশোরী গঙ্গাস্নান করতে যেত আর এক ললাট করে তেলক ফোঁটা কেটে একএকটা ঝোঁটন্ বুলবুল হয়ে ফিরে আস্‌ত। কেবল ফুলী যে যায় নি তা আমি ঘরে থেকেই জানতে পারলাম। নেত্য যাবার সময় গজগজ করতে লাগল—ওর আর বেশী দিন নয়, হয়ে এসেছে, বুঝলি নীরি?

'নীরি' কি বুঝলে সেই জানে, আমি যা বুঝলাম, তা এই—সময় যার নিকটবর্ত্তী হ'য়ে আসে, সেই গঙ্গাস্নানে উঠে পড়ে লেগে যায়! আমার মনে হ'ল কারু সময় যদি হ'য়ে থাকে সে নেত্যর!

তারা সব চলে গেল। বাড়ীটা যেন আর জাগতেই চায় না—খটখটে রৌদ্র ঘরকে বিভাসিত করে তুলেছে, কিন্তু কোনদিকে কোন সাড়া নেই। যে সময়টা ফিরিওয়ালার ঘনঘন চীৎকারে, ময়লাফেলা গাড়ীর ঝনঝনানিতে, লোকজনের কলরবে সহর একেবারে পঞ্চমে মেতে ওঠে, এখানে দেখ্‌লাম, তার কিছুই নেই। এ-বাড়ী যেন রৌদ্রের সঙ্গে জাগে না, লোকের কলরব তাদের কানে পৌঁছে না। পরে দেখেছি এ-বাড়ী সন্ধ্যেতেই হাসে, অপ্সরীর মত রং ধরে আলো নিয়ে দিক্‌ভ্রান্ত পথিককে পথ দেখিয়ে দেয়, তাদের কোলাহল সারা সহরের লোকের কানে পুরে দেয়। এ আমি সন্ধ্যেবেলাতেই দেখেছি, বলছি।

ফুলী আমার ঘরে এসে বল্লে—ঘুমিয়ে ছিলে?

উত্তর না পেয়ে নিজেই বল্লে—ঘুম কি হয়? সে আমি জানি। কিন্তু নেত্য যখন জিজ্ঞাস করবে, বলো ঘুম হয়েছিল।

মিথ্যা! জীবনে কোনদিন কোনপাপেই তা আমি বল্‌তে পারব না।

ওসব ভাই কেতাবের বুলী! ও রকম মিথ্যে বল্‌তে কোন দোষ নেই।

ভদ্রলোকের কাছে সব মিথ্যেই সমান।

ফুলী হাস্‌লে, ঘৃণার হাসি নয়—সে আমি বুঝলাম। প্রভাতালোকে তার হাসিটা মধুর ঠেক্‌ল। একটি একটি করে বল্লে—দেখ, আমরা না-হয় ছোটলোক মেনেই নিলাম, কিন্তু বল দেখি, ভদ্রলোকের বাড়ীতে এমন কি কখনও হয় না যে মিথ্যে বলা ছাড়া তখন আর উপায় থাকে না?

একটু থেমে, আমার হাতের সরু রুলিগাছটায় হাত দিয়ে নাড়্‌তে নাড়্‌তে বল্লে—আমি একটা বড় লোকের বাড়ীতে মজরোয় যেতাম বুঝলে.......

ও-সব কোন গল্পই আমি শুন্‌তে চাইনে।

বেশ—না হয় নাই বল্লাম। কিন্তু এটি ত তুমি বুঝতে পারবে যে নেত্যর কথার উত্তরে যদি তুমি বিদ্রোহ কর, হেন্ করব না, ত্যান্ করব না—কর তাহ'লে দয়া করা চুলোয় যাক্, নেত্য আরোও ভীষণ হয়ে পড়বে। দুটি দিন এখানে থাক্‌লেই বুঝ্‌বে যে আমার কথা একেবারে হুবহু ঠিক! তুমি যত নিজের গোঁ ধরবে, নেত্য চামুণ্ডা হ'য়ে ধেই ধেই নাচ্‌বে। তুমি যেটি করবে না বল্‌বে, নেত্য সেইটেই করাবে।

তা কি কেউ পারে?......

দিশেহারা

দেখে নিও পারে কি না। একটুখানি হেসে বল্লে—পারাত্তেই নেত্যর জন্ম।

তার হাসিতে গা জ্বলে গেল, বল্লাম—তুমি হাসচ ?

মুখখানি কিন্তু কিন্তু করে ফুলী বল্লে—এযে আমি বরাবার দেখে এসেছি ভাই। নেত্যর কাণ্ডকারখানা দেখ্‌লে যে অবাক হ'য়ে যেতে হয়।

নেত্যর দল কোলাহল করতে করতে ফিরে এল। সকলের হাতে একটা করে কমণ্ডলু, ললাটে তেলক-ছাপ, মাথার সামনে ভৈরবচূড় বাঁধা, পরণে সব চেলি, তসর, গরদ, মটকা!

নেত্য ফুলীকে বল্লে—কিলা, বুলী কাটুছে ?

ফুলী উত্তর দিলে না, মুচকি হেসে আমার মুখের দিকে চেয়ে বেরিয়ে গেল।

তার ঘরটা ছিল ঠিক দরজার পাশেই। দুপুর বেলা সে আমাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে। তার ঘরের সাজসজ্জা যেন সকলের চেয়ে বেশী। আর সে সব সাজ সজ্জায় কেমন একটা শুভ্ররুচি আর শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে আছে বলে আমার মনে হ'তে লাগল। কারু ঘরে যা দেখিনি, এর ঘরে তাও দেখলাম, একটা আলমারী ভর্ত্তি বই—সব সোনালীজলে তার নাম লেখা! এই মেয়েটিকে গোড়া থেকেই আমার ভালো লেগেছিল, সে যে শুধু তার চোখের গুণে, তা নয়—এর রুচির সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের সঙ্গেও যেন আমার মনের ঐকান্তিক যোগ ছিল।

আমাকে বসিয়ে সে নিজে একখানা তোয়ালে দিয়ে আলমারীর, ছবির কাঁচ সব ঝেড়ে মুছে তুলতে লাগ্‌ল। সে যে খুব সুন্দরী তা নয়—তার

চেয়ে এ পোড়া রূপের চাকচিক্য ঢের বেশী, কিন্তু সেই একহারা পাতলা চেহারার ভেতর থেকে সৌজন্যের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ফুটে উঠে আমার চোখের কালো তারায় তার অসীম সৌন্দর্য্যের ছাপ পাড়ছিল। একখানা বৃন্দাবনী কাপড় তার পরণে, খুব পাতলা একটা আদ্দির জামা, পিঠে এলোচুল—বনচুম্বিত আকাশের উপর কালো মেঘের মত জমে উঠেছে যেন! একটা ফোল্ডিং অর্গান মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্লে—পার?

উত্তর দিতে হ'ল না, সে আবার বল্লে - তা আর পারবে না? কালেজে পড়েছ। আচ্ছা ভাই, কালেজে না-কি আমাদের মেয়ে নেয় না?

তা আমি জানি নে।

শুনেছিলাম নেয় না। কিন্তু তা হলে তোমাকেই বা নিয়েছিল কেন?

আমি বল্‌তে যাচ্ছিলাম—আমাকে নেবে না ত নেবে কাকে?—কিন্তু বলা হল না। উদ্ধত গ্রীবা অশ্বকে কে যেন চাবুক মেরে থামিয়ে দিলে!

সন্ধ্যেবেলা ফুলী একটু আধটু প্রসাধন করে বল্লে—আটটার সময় আমার গাড়ী আসবে, থিয়েটারে যেতে হ'বে—তুমি যাবে ত বল, আমি নেত্যকে বলে আসি!

আমি বল্লাম—না।

হঠাৎ বুকটা যেন আমার তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল। নেত্য ও কার সঙ্গে কথা কইছে! কার গলা ও!

ফুলীকে জড়িয়ে ধরে বল্লাম—ডাকো, ডাকো, তোমার দুটি পারে পড়ি ওকে নিয়ে এসো।

ফুলী হাঁ করে ছ'মিনিট আমার মুখের দিকে চেয়ে বেরিয়ে গেল। আমি বদ্ধ দ্বারে কান পেতে বলে উঠলাম—দিব্যেশ, দিব্যেশ, দিব্যেশ!

এ-জগতে রমণীর একমাত্র আরাধনার পুরুষ—দিব্যেশ!

ফুলী হেসে, কটাক্ষ করে বল্লে—চল, তোমার ঘরে!

মনটি তার কথার স্বরের সঙ্গেই ছুটে গেল, কিন্তু পা একেবারে অসাড় হিম, নিস্পন্দ!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিদেশ যাওয়াই স্থির।

এ পুলক না অবসাদ—সে ত বুঝতে পারলাম না। যার স্বর শুনেই হৃদয় উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিল তারি কাছে যেতে কেন যে পায়ের শক্তি লুপ্ত হ'ল,কে আমার চলচ্ছক্তি হরণ করে নিলে—দিশেহারা অসীমের মধ্যে আমি তার কোন সীমাই দেখতে পেলাম না। এ স্থবিরতা বোধ 'করি একমিনিটেরও বেশী ছিল না, কিন্তু সেই ষাটটি সেকেণ্ডই আমার কাছে ষাট মিনিট হ'য়ে গেল।

ফুলীও তা লক্ষ্য করেছিল, সে বল্লে—যাবে না ?

যাব বৈ কি। চল !

যে ঘরটা নেত্য আমার জন্যে নির্দ্দেশ করে দিয়েছিল, সেই ঘরের সামনে এসে আমি ফুলীকে বল্লাম—তুমি যাও।

সে হাস্‌লে। তার সে সুন্দর মুখ-চোখের হাসি এসময়ে আমার এতই বিশ্রী লাগল যে আমি থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলাম। কথা বল্‌তে প্রবৃত্তি হ'ল না—ঘরে ঢুকে দণ্ডায়মান দিব্যেশের পায়ের কাছে বসে পড়ে বল্লাম—আমাকে বাঁচাও !

দিব্যেশ আমার হাত ধরে বল্লে—সেই জন্যেই এসেছি, সোনা !

আর কথা কইতে পারলাম না। অসীম বিশ্বাসে,তার বুকের উপর মাথা রেখে কেঁদে ফেল্লাম। সেত কঠিন পুরুষ, তার চোখেও জল যেন

টলটল করে উঠ্‌ল! সে আমার মুখে হাত দিয়ে কপাল মুছাতে মুছাতে বল্লে— আমার সঙ্গে যাবে সোনা? কাশীতে—

কা-শী-তে?

হ্যাঁ—সেখানেই হ'বে।

আমি নীরবে ভাবতে লাগলাম।

যেতে পারবে না?

এ প্রশ্নের উত্তর আমার ঠোঁট দিয়ে বেরুল না। সে-যে আমার পঞ্চদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের একমাত্র কাম্যফল, নারী-জীবন-উৎসের শেষ মহাসমুদ্র-—মনে এলেও মুখ ত তাকে সেকথা শুনিয়ে দিতে পারলে না। অশ্রুসজল মুখে তার পানে চেয়ে শুধু বলে উঠল—পারব।

দিব্যেশ বল্লে— বেশ, কালই যাওয়া যাবে।

তখন আমি উঠে বসেছিলাম। কিসের নিশ্চিৎ আশায় মনপ্রাণ সংযত করে' উঠে বসলাম, তা'ত আর কাউকে বলে দিতে হ'বে না। যদিও না উঠে কাঁদতেই ইচ্ছা প্রবল হ'য়ে উঠছিল, ত'াকে দমন করেই আমি বল্লাম—এরা যদি না ছাড়ে?

দিব্যেশ হেসে উঠ্‌ল, বল্লে– ছাড়বে না কেন? তুমি ত জান, ইংরেজী সেই প্রবাদটা, ইচ্ছের অনুকূল পথ চিরদিন মুক্ত—সে পথ কি কেউ বন্ধ করতে পারে! তোমার ইচ্ছে থাক্‌লেই হ'ল।

আমার ইচ্ছে যে কত প্রবল, সে কি তা বুঝতে পারলে না! আমার চোখ্ কি তা'কে সে কথা জানিয়ে দেয় নি!

দিব্যেশ বল্লে—সেজন্যে ভেবোনা। তার ওষুধ হাতেই আছে ... বলে সে সিল্কের পাঞ্জাবীটা তুলে ধরে বাজিয়ে দিলে—ঠুং ঠুং ঠুং!

বল্লে—বুঝেছ ?

বুঝলেও হীন প্রস্তাবটা আমি সমর্থন করতে পারলাম না। সে আমাকে শুধু গ্রহণ করছে তা নয়, চিরদিনের জীবন সঙ্গিনী করতে যাচ্ছে, তবু কেন এদের এমন করে রূপো দিয়ে স্তব করে যাবে! কিন্তু নেত্যর কাছ থেকে মুক্তির অন্য উপায় যে নেই, তা কেমন আপনা থেকেই ধারণা হ'য়ে গিয়েছিল।

দিব্যেশ বল্লে—শুধু তুমি যেতে চাও— এই কথাটি বল।

সে কথার উত্তর না দিয়েই আমি বল্লাম—আচ্ছা পুলিস সাহায্য করতে পারে না ?

দিব্যেশ ম্লানমুখে উত্তর দিলে—বোধ হয় পারে না।

কেন পারবে না! আমি ইংরেজী খবরের কাগজে কত পড়েছি।

ম্লানমুখে হাসি টেনে দিব্যেশ জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় পড়লে ?

আমার মাথা নত হ'য়ে গেল। মহাপরাধে যেন ধরা পড়ে গিয়েছি। খবরের কাগজে ছাপা থাক্‌লেও এবং কুমারী মেয়ে গোপনে তা পড়লেও সে কথা যে মুখ ফুটে বলতে পারে না—এরই লজ্জায় আমার জিভ্ আর গলা দুই-ই আড়ষ্ট হ'য়ে গেল।

দিব্যেশ বল্লে—এসব খবর পড়তে—বুঝি ?

তার মুখ না দেখ্‌লেও সে মুখের কল্পিত হাসিটা আমার অন্তঃস্থল স্পর্শ করে উঠ্‌ল। আমাকে লজ্জিত দেখেও এ প্রশ্ন করতে তার বাধ্‌ল না— এই আশ্চর্য্য! তখনি মনে হ'ল কোন্ কাজটা তার আশ্চর্য্যজনক নয়। মেয়ে স্কুলের প্রাইজ দেখ্‌তে যাওয়া থেকে, আজ এই বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত সবটাই যে অসাধারণ!

ধমক দেওয়ার মত স্বরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি সন্ধান পেলে কি করে ?

দিব্যেশ তখনও হাসছিল। হাসিটা তরল করে বল্লে - সে ত ভারি সহজ কাজ! তোমার ও বাড়ীতে গেছলাম।... ...একটু নরম হ'য়ে বল্লে—তুমি দু'দিন পরে আস্‌তে বলেছিলে কিন্তু আমি তা পারলাম না। আজই সন্ধ্যেবেলা তোমার নিষেধ বাক্যই যেন আমাকে টেনে বের করে দিলে। আমার এ-যে ভালবাসা সোনা, এ ত আর কিছু নয়, অন্ততঃ নট্ প্যাসান্!

এক চুমুকে উগ্র মদ খেলে যেমন গলা শিউরে ওঠে, আমিও তার কথা শেষ হ'তেই তারই বুকখানা চেপে ধরে' বল্লাম— এমন !—এ আমি সন্দেহ করে বলি নি! সন্দেহ করব ত'াকে ? হা আমার অদৃষ্ট ! তা'কে সন্দেহ কি চলে ?

বুকের মধ্যে আমার মুখখানাকে চেপে দিব্যেশ কোমল স্বরে বল্লে—হ্যাঁগো এমন! একি-তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না ?

একটু থেমে আবার বল্লে—তবে কি তুমি যেতে চাও না ?

চাই নে ? এ যদি না চাই, পৃথিবীতে চাইবার আমার কি আছে ?

এই বিপুল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একদিকে, আর দিব্যেশ একদিকে! তুলাদণ্ডের কোন্ দিকটা যে ঝুলে পড়েছিল, সে ত আমি স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছি, সে-কি তা পাচ্ছে না—ভাবতে লাগলাম।

দিব্যেশ আবার সেই প্রশ্নই করে বসল! এবার উত্তর না দিয়ে পারা গেল না। কি বলেছিলাম, এতবড় নির্লজ্জা আমি, তবু সে কথা কলমের মুখেও আন্‌তে পারছি না। যে-দেহ-মন তার পায়ের তলায়

একান্ত বিশ্বাসভরে ন্যস্ত করে দিলাম, দিব্যেশ সমস্তটাই জড়িয়ে ধরে, সেই মুখখানা একেবারে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দিলে! সে ত কঠিন ছিল না—কিন্তু এমন কাজ সে কেন করলে?

সে যেন আমার এই প্রশ্নটা মনের মধ্যে অনুভব করে' বল্লে—আর ত আমরা ভিন্ন নই সোনামণি। আমার মনপ্রাণ ত তোমাকেই স'পেছি, বিনিময়ে যে পেয়েছি—এর থেকে তারই মীমাংসা হ'য়ে গেল।

কি কঠিন নির্ম্মম, কোমল স্নিগ্ধ সে মীমাংসা! সমস্যাপূরণ করতে গিয়ে সে আবার জটিল করে দিলে! আমি তার হাত ছাড়িয়ে উঠে বল্লাম—ও-কি-ও!

সে তার উত্তর দিলে না। চুপ করে বসে থেকে একটা চুরুট ধরিয়ে বল্লে—আমি আসছি বাড়ীউলীর কাছ থেকে,—তুমি বস।

নেত্য যে অমত করবে না-এ আমি জানতাম! কেন সে আমাকে এমন বন্দী করে এনেছিল, তার কারণ আমি জানি নে; কিন্তু দিব্যেশকে যে-সে কোনমতেই বিমুখ করতে সক্ষম হ'বে না—এও আমার হৃদয় থেকে কে তীব্রস্বরে বলে উঠছিল।

ভবিষ্যৎটাই না-কি সব সময়ে সমভাবে উজ্জ্বল হ'য়ে থাকে মানুষের সামনে—আজকের দিনে আমার ভবিষ্যৎ এত স্পষ্ট, এত স্বচ্ছ হ'য়ে উঠল যে কোনদিন কোন কারণেই যে আমি অবসাদক্লিষ্ট হ'য়েছিলাম তাও যেন বিস্মৃতির তলে ডুবে মরে চুকে গেল।

দশ পণেরো মিনিট পরে দিব্যেশ হাসিমুখে ফিরে এল। সে কোন কথা বলবার আগেই নেত্য বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—বলি বাবা,

খাবার দাবার কিছু করব কি ? আর-যদি-কিছুর দরকার থাকে তাও বল। তোমার মাসীর কাছে না পাবে এমন জিনিষই নেই। তা সে রাত দশটাই বাজুক আর দু'টোই বাজুক।

এ কথার কি জবাব যে হো'তে পারে আমি অপলক দৃষ্টিতে দিব্যেশের পানে চেয়ে ভাবছি, দিব্যেশ হেসে বল্লে—কিছু দরকার হ'বে না মাসী!

তার এই সম্বোধনটা আমার বুকে শেলের মত বাজল। বাইরে নেত্যর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই, দিব্যেশ বল্লে—আমি যাই ?

তাকে বিদায় দেওয়াও যে কত কঠিন, আর রাখা যে তার চেয়েও দুষ্কর- এর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও যেন আমি সেটা বুঝতে পারি নি। মন যখন আমার এই দুয়ের মাঝে দুলে দুলে উঠ্‌ছিল, ঠিক সেই সময়েই দিব্যেশ আবার আমার হাত ধরে বল্লে—কাল ঠিক হ'য়ে থেক' তুমি। সন্ধ্যের পরেই আমি গাড়ী নিয়ে আসব।

আমি তার ভীষণ তপ্ত হাতটা আরও চেপে বল্লাম—আজই নিয়ে চল, আমার বাড়ীতে!

দিব্যেশ বল্লে—কি দরকার আছে তার ?

কি যে দরকার তা আমি বল্‌তে পারলাম না। দিব্যেশের মত লোক কি দরকার জিজ্ঞাসা করে আমাকে বুঝিয়ে দিলে যেন কোন দরকারই তার নেই; থাক্‌লে সাধিত করতে সে বিন্দুমাত্র অবহেলা করত না। এ বিশ্বাস কেন হ'য়েছিল, কিসে এমন দৃঢ় হ'য়েছিল—তা'ত আর অস্পষ্ট নেই। দিবালোকের মতই আমার প্রাণপ্রিয় যে সুস্পষ্ট হ'য়ে গেছে—সে ত আমি জানি!

রমণীর অঙ্গ যে কত কোমল—হয়ত খুলে বল্লেও অনেক স্বার্থান্ধ পুরুষ তা বুঝবে না! নারী হৃদয়ের বিশ্লেষণই সবাই করেছেন—কিন্তু এ-যে তার চেয়েও কোমল, ক্ষণভঙ্গুর সে কথা কেউ বলেছেন কি না জানি নে—দিব্যেশের আকর্ষণে হু'মড়ি খেয়ে পড়ে যেতেই সেটা আমি বুঝতে পারলাম।

দিব্যেশ চলে গেলেন। নেত্য ঘরে ঢুক্‌তেই আমার অবশ দেহে আবার বল ফিরে এল। আমি দাঁড়িয়ে উঠ্‌তেই নেত্য বল্লে—খাবি চল মা!

পরিতৃপ্তির স্নেহমাখা স্বর আমার কানে অত্যন্ত বেস্থরে বেজে উঠ্‌লো! তার সেই বাজখেঁয়ে গলাকে কোমলে নামাতে দিব্যেশের পকেট খালি হ'য়ে গেচে বুঝতে আমার এক দণ্ডও দেরী হল না। এবং বুঝ্‌তে না বুঝতে সারা হৃদয়টা একেবারে বেত্রাহত বালকের মত লাফি-লাফি করে উঠ্‌লো!

নেত্য বল্লে—কালই চলি বাছা, একদিন যে আদর করে' খাওয়াব দাওয়াব তারও সময় হ'ল না। যা-হ'ক, ভালো হ'লেই ভালো। কদমের মেয়ের যে আমি হিতৈষী কদম যেখানে থাক্—দেখ্‌তে পাচ্ছে... আরো অনেক হিতৈষণার কথা তার গলায় জমা ছিল, সে তা উদগার করবার আগেই আমি বলে ফেল্লাম—চল, খেয়ে আসি।

নেত্যর বেশ ভূষা শিথিল ছিল না। সকালের গঙ্গামাটির তেলকছাপ আর নেই, এখন তার উপরে সিঁথেয় গাঢ় করে সিঁদুর লেপা, গরদের বদলে দিব্য হাতীপাড় সাড়ী, ভেতর থেকে ফুলকাটা সেমিজের ফুল ফুটে উঠ্‌ছে। গয়না তার গায়ে বেশী ছিল না—থাক্‌লেও এর চেয়ে সুশ্রী

হত না। সে আগে আগে সুপ্রশস্থ দেহলতা (লতা না বৃক্ষ ?) নাড়তে নাড়তে চল্ল, মুখেরও বিরাম ছিল না, আমার মত সৌভাগ্যবতী যে খুব বেশী মেয়েকে সে দেখে নি—বার বার সেই কথাই প্রচার করতে লেগে গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

মিলনের আনন্দে।

একটা ঝড়ের মত এসে দিব্যেশ এখানকার সব সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে উঠ্‌ল—গাড়ীতে। ঝড়ে যেমন কাগজখানা উড়ে উড়ে দূর হ'তে দূরান্তরে চলে যায়—আমিও তেমনি এ বাড়ীর দরজায় উঠে এক নিঃশ্বাসে হাওড়ার ষ্টেশনে রেলের গদীমোড়া একটা কামরায় বসলাম! যখন আমরা বাড়ী ছেড়েছিলাম, সেখানে একেবারে তাণ্ডবলীলা চল্‌ছিল। গান, নাচ, হাসি-তামাসা জ্যান্ত হ'য়ে অনেকদূর অবধি আমার পিছু নিয়েছিল। একটি মেয়ে বার বার শ্যামকে পিচকারী মারতে নিষেধ করছিল—আমার মনে হচ্ছিল সে-যেন গানের ভেতরে দিয়ে সহস্র অবহেলায় পিচ্‌কারী ছুঁড়তেই বলে দিচ্ছিল। হঠাৎ দু'তিন মিনিট গান বাজনা থেমে গিয়েছিল, বোধ হয় আমাকে বিদায় দিতেই! তারা গান বন্ধ করলেও উল্লাস ত আমার চোখ্‌ থেকে দূর হল না। তাদের সকলকার মিলিত দৃষ্টি আর ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো লাফিয়ে লাফিয়ে সমভাবেই এসে পড়ল—আমার মুখের ওপর!

দিব্যেশ ট্যাকসির চালককে চালাতে হুকুম দিতেই ধকধক করে গাড়ী নড়ে উঠ্‌ল। শেষবার—একবার আমি আমার পিছনের লোক-গুলিকে দেখে নিলাম। কিন্তু সে শান্ত চোখের উজ্জ্বল চাহনি আর

আমার চোখে পড়ল না। সে দুপুরবেলা আমার কাছে বিদায় নিয়েছিল, সে দিনটায় ছিল তাদের থিয়েটারের বৈকালিক অভিনয়! ফাগ-মেখে লাল হ'য়ে সে যে-গানটা গাইবে, আমার গলা ধরে সেটা শুনিয়ে দিয়েছিল! এমন আনন্দের দিনে যে আমাকে বিদায় দিতে হ'চ্ছে তার জন্যে সে কেঁদেও ছিল।—সেই দৃশ্যটাই সারা পথ আমাকে যেন পিষে ফেলছিল। যে বাড়ীটার ইঁটকাঠ পর্য্যন্ত ঘৃণিত জীবনের সাক্ষ্য দিচ্ছে আমার তেজোদীপ্ত মনের খানিকটা অংশ যে সেখানেই বাঁধা পড়বে—সে কে জানত!

ট্যাক্‌সি ছুটতে বেশী সময় লাগে নি। হাওড়ার পুলের সামনে পাহারাওয়ালার লম্বা হাতের ইঙ্গিতে ট্যাক্‌সি থেমে গেল! সেখানকার তীব্র আলোক যতদুর এসে পড়েছিল, একেবারে দিনমান করে দিয়েছে—তারই ভেতর দিব্যেশের বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে যেন আমি আর কূল-কিনারা পেলাম না। সে-যে আমার চোখের ভুল, অথবা রঙিন বৈদ্যুতী আলোই তার মুখ এমন ফ্যাকাসে করে দিয়েছে—ঠিক করে নেবার আগেই গাড়ী ছুটে গিয়ে আবার থেমে গেল।

দিব্যেশ ঘুম-ভেঙ্গে-জেগে-উঠে বল্লে—চল।

আমাদের সঙ্গে কেবল একটা চামড়ার পোর্টম্যান্টু ছিল, একটা মুটে ডেকে নিয়ে আমরা ছ নম্বর প্ল্যাটফরমে একটা গাড়ীর ফার্ষ্ট ক্লাস দরজা খুলে বসে পড়লাম। ঢোকবার সময় তাড়াতাড়িতে কাগজের লেবেলটা পড়বার সময় হয় নি, দিব্যেশ সিগারেট কিনতে নেমে যেতেই আমি বেরিয়ে এসে সেটা পড়লাম—মিঃ এস্ সেন এণ্ড পার্টি!

এ কোন্ গাড়ীতে পুরলে এনে! দিব্যেশের কি আজ মাথা খারাপ

হ'য়ে গেল না কি ! কে জানে গাড়ীর কত সময় আছে, সে ফিরে এলে নেমে অন্য গাড়ীতে ওঠবার সময় হবে কি না—এই সব ভাবছি – দুজন লোক কার্ডটি পড়ে কামরায় উঠে বস্‌ল ! আমি এক কোণে ব'সে অন্যদিকে চেয়ে রইলাম। তা'দের যে আমি দেখিনি তা নয়—গাড়ীতে ঢোকবার আগেই দেখে নিয়েচি। বেশ ভদ্রগোছের দু'টি যুবাপুরুষ !

একজন বেশ মোটা-সোটা, যার মুর্শিদাবাদী সিল্কের পাড়ওলা চাদর লুঠিয়ে পড়ছিল, সে আমার পানে চেয়ে একটু ইতঃস্তত করে বল্লে—দিব্যেশ কোথা গেল ?

আমি ত একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম।

সে লোকটি তা বুঝেই বল্লে—আমিই সেন্, আর ইনি আমার বন্ধু রায় ; দিব্যেশ আমাদের বন্ধু ! কেন,—আপনি কি আমাদের চিন্‌তে পাচ্ছেন না ? একদিন ত দেখেছিলেন। একদিন কেন, বাস্তবিক দু'দিন দেখেছেন। প্রথম আপনাদের স্কুলে······

একি ষড়যন্ত্র না-কি ! আমি বল্লাম—জানি !

মনে পড়েছে, হাঃ হাঃ—বঙ্কিম, দেখতে পাচ্ছ দিব্যেশকে ?

বঙ্কিম বল্লে—কৈ না !

আমার মনে হচ্ছিল, আর বুঝি ইহজগতে তাকে কেউ দেখ্‌তে পাবে না।

সেন-ও দরজার বাইরে মুখ রেখে দেখ্‌তে লাগলেন। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল, আমি সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বল্লাম—আমি নেমে যাই !

সেন আমার দিকে চেয়ে স্নিগ্ধস্বরে বল্লেন—নেমে যাবেন কেন ?

সে প্রশ্ন এবং উত্তর তখনই শেষ হ'য়ে গেল গাড়ী প্ল্যাট্‌ফরম ছেড়ে চলে গেচে—সে আমি বুঝতে পারলাম—দেরীতে!

আমাকে বসে পড়তে দেখে সেন সাশ্চর্য্যে বল্লেন—কেন? দিব্যেশ কি কিছুই বলে নি আপনাকে?

কি বল্‌বে! এত বড় মুর্খ সে! আমি নতনেত্রে বসে এই কথাই ভাবতে লাগলাম।

কামরায় চার চারটে আলো জ্বল্‌ছিল, কিন্তু আমি চোখে আর কিছু দেখ্‌তে পেলাম না। কোথায় গেল সে! কেন গেল? আমাকে ভুলিয়ে এনে, পথের মাঝে ফেলে রেখে দিব্যেশ কোথায় গেল? দু'টি হাত জলে ভেসে যেতে লাগ্‌ল।

সেন বল্লেন—দেখুন, কি হ'য়েচে আপনার? দিব্যেশ আস্‌তে পারলে না বলেই কি আপনি কাঁদছেন? আপনি ত জলে পড়েন নি... আমি যতক্ষণ আছি......

একবার মাত্র চোখ খুলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কে আপনি?

সেন খট্‌ করে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—সে কি! আপনি কিছুই জানেন না! তা কেমন করে' হ'তে পারে?

কি কেমন করে হ'তে পারে—সতেজে এই প্রশ্নই করব—ধ-কাস্‌ করে যেন ধাক্কা খেয়ে গাড়ীটা থেমে পড়ল—সে একটা ষ্টেশন। হুমড়ি খেয়ে পড়ে আবার যখন মাথা তুল্‌লাম, দেখি, দিব্যেশ দরজাটি খুলে উঠছে।

না—না—সে কি পালাতে পারে? কখনই পারে না।

কেউ কোন কথা বলবার আগেই সে বিমর্ষ হাসিমুখে বল্লে—আরে,

তোমাদেরই খুঁজতে আমি বেরিয়ে গেছলাম, ঢুকছি দেখি, গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। লাফ মেরে গার্ডের গাড়ীতেই উঠে পড়লাম। গার্ড সাহেব ত মারে আর কি! ফাষ্টক্লাস প্যাসেঞ্জার শুনে হাতটা গুটিয়ে পেণ্টালুনের পকেটে পুরে ফেল্লে।... ..কথাগুলো সে আমাকেই বলছিল, কিন্তু তার দৃষ্টিটা ছিল সেনের মুখে!

সন্দেহ আবার আমার বুকে জমে উঠলো। কিন্তু ভঞ্জন করে নেবার মত সাহস আমার হল না; অথবা একটু পরেই হ'বে—এই রকম ভেবে আমি চুপ করে রইলাম।

সেন-ও আর কিছু বল্লেন না। দিব্যেশ তাঁদের কাছে বসে বল্লে—কেমন-রাজা—হয়েছে?

তীরের শব্দ লক্ষ্য করেই হরিণী যেমন এদিক-ওদিক চায়, আমিও তেমনি চেয়ে দেখলাম, বঙ্কিম যার নাম সে মুচকি হেসে মুখটা ফিরিয়ে নিলে।

সেন বল্লেন—তুমি কি বলনি যে আমরা কাশী যাচ্ছি......

দিব্যেশ বল্লে—বলেচি বৈ কি! কি গো বলি-নি, কাশীতেই শুভ-কার্য্যটি হবে?

তার কথার ভেতর কোন গূঢ় ইঙ্গিত ছিল কি-না সে আমি জানি নে; থাকলেও সেটুকু আমার কান এড়িয়ে গেছল, আমি মুখটি নীচু করে বসে রইলাম। তারা আর কিছুই বল্লে না। দিব্যি সব চুপ চাপ সিগারেট খেতে লাগল।

গাড়ী মাঝে মাঝে থামচে, আবার চলেচে, এমনি করতে করতে বর্দ্ধমানে এসে থামল। সেন বঙ্কিমের বাহুবদ্ধ হ'য়ে নেমে গেলেন, দিব্যেশও

নেমে, বাইরে থেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার খাবার এইখানেই দিয়ে যাক্—কি বল ?

মৌনই আমার সম্মতির লক্ষণ বুঝে সে চলে গেল—দুতিন মিনিট পরেই খানসামা কাঁচের প্লেটে খাবার সাজিয়ে বেঞ্চের ওপর রেখে নেমে গেল। যা পারলাম খেলাম, অনেক পড়েই রইল।

আধঘণ্টা পরে সেনের দল ফিরে এসে বল্লেন—শোবার কি রকম কি হ'বে ?

সে ব্যবস্থা করে নিতে দেরী হল না—সেন তাঁর চাকরকে চারটে বিছানা করে দিতে বল্লেন, আমি বল্লাম—আমার বিছানার দরকার নেই।

কেন—গাড়ীতে আপনার ঘুম হয় না বুঝি ?

বলতে পারলাম না যে, হয়-কি হয়-না—সে আমার জানা নেই। তবে মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসছিল। কিন্তু একগাড়ীতে এত লোকের মাঝখানে শুয়ে যে ঘুম হ'তে পারে না—এ কথাটা আমি না বল্লেও এদের বোঝা উচিৎ। সব চেয়ে রাগ হল দিব্যেশের ওপর। তার যদি বন্ধু-বান্ধব যাচ্ছে—সে কেন একটা থার্ডক্লাসেও আমাকে রাতটার জন্যে তুলে দিলে না !

সেন মূর্খ নন, তিনি বল্লেন—এরকম অবস্থায় আপনার ঘুম না হওয়াই সম্ভব।

আমি বল্লাম—সে থাক্।

আশ্চর্য্য ! সেন সেই রোগা লোকটির মুখের পানে চেয়ে নিম্নস্বরে বল্লেন—শুয়ে পড় !—আমার বড় দুঃখ হ'ল যে রমণীর মর্য্যাদা এঁরা

রাখতে জানেন না, মিথ্যে জামাজোড়া প'রে বাবু সেজে ফাষ্টক্লাসে উঠে প'ড়েছেন! তার চেয়েও বড় আশ্চর্য্য এই যে, দিব্যেশ টুক্ করে উপরের একটা বাঙ্কে উঠে সটানে শুয়ে পড়ল।

আর আমি! বাইরে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রান্তর মধ্যে কি যে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম তা আমি জানি নে।

আকাশ যেন বিগলিত প্রেমে পূর্ণাঙ্গী যুবতীটির মত ধরার বুকে নেমে এসে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হ'য়ে নিজ্ঝুম নিস্তব্ধ সেই প্রান্তরের মধ্যে পড়ে রয়েচে; সেখানে যা দেখতে পেলাম সব যেন প্রেমে গলে ঢলে পড়চে। জ্যোৎস্না ত কতদিনই ওঠে, সে ত চিরদিনই এমনি করে ধরিত্রীকে চুম্বনে জড়িয়ে ধরে—এর মধ্যে হয়ত নূতনত্ব বাস্তবিক কিছু নেই, কিন্তু আমার চোখে এই অত্যন্ত স্বাভাবিক সহজ মিলনের দৃশ্যটি এমনি নূতন, এমনি সৌন্দর্য্যমণ্ডিত বোধ হ'তে লাগল—যা আর কোনদিন আমার মনেও স্থান পায় নি। আকাশ-পাতালের দূরত্ব-ব্যবধান, স্বর্গ-মর্ত্ত্যের তারতম্য কোন বাঁধা বিপত্তি না মেনেই যে ঐ নীলাকাশ নেমে এসেচে, কি অসীম প্রগাঢ় প্রেমই না তা থেকে ক্ষরে পড়তে লাগল। আর তার দিকে চাইতে চাইতে আমার এই ছন্নছাড়া জীবনটা যেন ঐ জ্যোৎস্নায় বিধৌত পবিত্র হ'য়ে মিলনাকাঙ্খায় উন্মুখ হ'য়ে প্রান্তরে নেমে গিয়ে একটা শিশু-গাছের মত দাঁড়িয়ে আকণ্ঠ সুধা পান করতে লাগল। গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ আমার কান থেকে বিলুপ্ত হ'য়ে গেল; ঘরের মধ্যে যে এতগুলো পুরুষ আর এক। আমি তা'ও আমার মনের থেকে মুছে গেছল। আমি যেন সুষুপ্ত ধরণী, জ্যোৎস্নার মত শুভ্র সুন্দর বেশ পবে দাঁড়িয়ে আছি, দিব্যেশ তার দু'বাহু বিস্তার করে ঐ আকাশের মতই নেমে

আস্‌চে—হৃদয়মন শান্ত-সংযত করে আমি তা'রই অপেক্ষা করতে লাগলাম।

দিব্যেশকে সন্দেহ করেছিলাম বলে' আপনা থেকেই যে মন অতৃপ্ত হ'য়ে উঠেছিল, প্রকৃতির মিলনানন্দে নিজের হৃদয়ের প্রগাঢ় যোগ জান্‌তে পেরেই—সেই অতৃপ্তি মহাসমুদ্রে বুদ্‌বুদের মত উঠে কোথায় গেল। তখন একেলা থাকবার ইচ্ছাটাও আর রইল না। সেন ও বঙ্কিম তারই বন্ধু, যার তরে আমার এ অভিসারিকার বেশ। এবং সে-যে আমার কে, মনের মধ্যে তা অনুভব করে যখন হৃদয় একেবারে কানায় কানায় উপ্‌চে উঠ্‌ল, তখন আমি বাইরের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে লাগলাম তা'কে—যে আমার চেয়েও সুন্দরী, আর, আমারই অনুরূপ বেশে সজ্জিত হ'য়ে আকাশের পানে চেয়ে অকাতরে আপনাকে বিলিয়ে দিচ্ছে! বাধা নেই, বিপত্তি নেই, মান-অভিমান-লজ্জা-সঙ্কোচ কিছুই নেই। কেবল তারাই দু'টি সব পূর্ণ করে, সব ব্যেপে রয়েচে। আর কেউ নেই!

দশম পরিচ্ছেদ

আসল ছবি দেখা দিল।

আমি বসেই ছিলাম। নিজেকে দৃঢ় সংযত স্থির রাখতে পারি—এ শিক্ষা আমার ছিল। নইলে তিন তিনটে সর্ব্বভুক্ জীবের মাঝে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে আমি ছিলাম কি করে! এ খুব গর্ব্বের কথা না-ও হ'তে পারে তবে এ'কে অবহেলা করা চলে না। আমার সে-অবস্থা স্মরণ করে আমি বলতে পারি যে সে সময় আমি যেন একাই যাচ্ছি বলে মনে করে নিয়েছিলাম। অবশ্য দিব্যেশ আছে—এই একটা পাশের কামরাতেই কোথায় আছে—এই রকমই মনে করতে হচ্ছিল।

অনেক রাত্রে একবার ফিরে দেখি সেন. আর রোগা ছেলেটি নেই—গাড়ী কোন একটা ষ্টেশনে রয়েছে—দাঁড়িয়ে দেখি, দিব্যেশ সুখ-নিদ্রামগ্ন। তা'কে ঠেলে তুলে দিলাম।

প্রথমটা যেন সে বড়ই বিরক্ত হ'য়েছিল, তারপর বাঙ্কের উপর আমার হাতটা চেপে বল্লে—শোও নি?—সে উঠে বস্‌ল।—এরা গেল কোথায়?

আমি বল্লাম—আমি কাশী যাব না।

যাবে না? কি রকম? তবে কোথায় যেতে চাও তুমি?

তা আমি জানি নে। কিন্তু এ কি রকম ব্যবস্থা তোমার যে······

দাঁড়াও, আগে নামি—বলে সে নেমে পড়ল। আমার বিছানায় বসে বল্লে—এরা বুঝি নেমে গেছে? এটা কোন্ ষ্টেশন, দেখেছ?

কিছুই আমি দেখি নি, দেখবার ইচ্ছেও ছিল না আমার। আমি বল্লাম—এঁরা যে যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে—তা ত কৈ বল নি তুমি?

দিব্যেশ যে উত্তর দিলে, আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সে বল্লে—ওঁরা আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না, আমরাই যাচ্ছি—ওঁদের সঙ্গে! ঐ যে সেন দেখ্‌ছ, উনিই সব!

আমার মাথা ঘুরতে লাগল। আমি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, কিন্তু কথা বেরুল না। দিব্যেশ তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—দাঁড়াও এদের দেখি।

আমি—আমি তার হাতটা টেনে বল্লাম—না, বসো। এর একটা মীমাংসা হয়ে যাক্—

দিব্যেশ, যাষ্ট হ্যাভ এ পেগ—ওল্‌ডম্যান!

থ্যাঙ্ক ইউ—ইয়েস—বলে দিব্যেশ আমার হাত ছাড়িয়ে নেমে গেল। তখনি সেই রোগা লোকটি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বল্লেন—আপনি কিছু খাবেন? সেন জান্‌তে বল্লেন!

না।

বঙ্কিম বসে বল্লেন—কেন আপনি বিচলিত হচ্ছেন? আমাদের কাছেও আপনার লজ্জা?……ইত্যাদি।

স্ব কথা আমার কানে যায় নি। প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে যেন আমার ইন্দ্রিয়সমূহ নিস্তেজ করে দিয়েছিল।

সেন এলেন। মুখখানা লাল, চোখ দুটি যেন আনন্দ বিস্ফারিত।

এসে রোগা লোকটিকে মরক্কো লেদারের সিগারেট-কেস্‌টি দিয়ে আমার পানে চেয়ে বল্লেন—আপনি কিছু খাবেন না ? আপনার যে কষ্ট হ'বে ? কি-ই বা তখন খেয়েছিলেন আপনি ?

হারে আমার অতিথিপরায়ণ পুরুষ ! এ কি আমার খাবার সময় ! এ যে সব যায়—নদীর দুকুল ভাঙ্গছে, এতে আমার কুঁড়ে ঘরের যে নিষ্কৃতি নেই—অতিবড় পাষণ্ডও এ-সময়ে খাবার প্রস্তাব করতে পারে না—এই চিন্তায় আমার মন একেবারে দমে যাচ্ছিল, আমি উত্তর দেব কি !

সেন বোধ হয় ভাবলেন—এ রমণীজনসুলভ লজ্জা ! বল্লেন—খাবেন না ?

বঙ্কিম বল্লেন—অন্য কিছুই যদি না খান, একটু সুপ……

দিব্যেশ কৈ ? দিব্যেশ !—পাগলের মত দাঁড়িয়ে উঠে আমি চীৎকার করে দিব্যেশকে ডাকতে লাগলাম। সেন আর বঙ্কিম তাঁরাও দিব্যেশকে খুঁজতে এলেন।

চলন্তি গাড়ীতে যে দিব্যেশ উঠতে পারিবে না—এ ত তিনজনেই জানি। তবু যেন আমার পক্ষে এ সময়ে অসম্ভব আশা করাও সম্ভব হ'য়ে পড়েছিল।

গাড়ী অনেকদূর চলে গেলে, আমি বল্লাম—আপনারা বুঝি তাকে বিদায় করে দিয়েছেন ?

সেন বল্লেন—আমরা ? আমরা কেন তা'কে বিদায় করতে যাব ?

কেন—তা আপনিই জানেন—আমি জানি নে ! কোথায় পাঠালেন বলুন ?

আমি পাঠাই নি ! আর কেনই বা পাঠাব ?

তার সঙ্গে আমার বোঝা পড়া করবার আছে।

সেন একটু ভেবে বল্লেন—ভারি কেয়ারলেস্ সে! তার ওপর পেটে এক ফোঁটা পড়লে আর ত কথাই নেই।.....কিন্তু কিসের বোঝা-পড়া?

কিসের বোঝাপড়া তা এঁকে বলব কি! আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খুঁজতে লাগলাম।

সেন বল্লেন—এমনও হ'তে পারে যে হাওড়ার মত ক'রে' বসেছে সে! পরের ষ্টেশনে আস্‌বে'খন। দেখতো বঙ্কিম, নেক্‌সট ষ্টেশন কোথা?

সেই আশাতেই রইলাম। প্রায় পঁচিশ মিনিট পরে গাড়ী থাম্‌ল, কিন্তু দিব্যেশ এল না—সেন প্ল্যাটফরমে নেমে গেলেন, ছায়ার মত বঙ্কিমও সরে গেল। যতই দেরী হ'তে লাগল, আমার সন্দেহ হ'তে লাগল—সে আর আসচে না!

সেন ও তাঁর ছায়া ফিরে এলেন, বল্লেন—কৈ কোথাও ত দেখলাম না! ওকি! আপনি অমন কচ্ছেন কেন? পড়ে যাবেন যে—চলুন, চলুন।

অনেকক্ষণ পরে সেন বল্লেন—কি হ'য়েছে বলুন ত? হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী ছাড়তে এই কথাটা একবার উঠেই থেমে গেছল। কিন্তু আর ত চলছে না—সব স্পষ্ট হওয়া উচিৎ!

আর কি স্পষ্ট হবে? হায়! এ যে গাঢ় অন্ধকারে লাফ দিয়ে পড়েছি, আর কি আলোক এখানে আসতে পারবে!

আমাকে নীরব দেখে সেন বল্লেন—দেখুন, সত্যি বল্‌তে কি, আপনাকে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে। যদিও তার কোন কারণ আমি খুঁজে

পাচ্ছি নে। অর্থব্যয়ের আমি সীমা রাখি নি, তবু আমার কেমন মনে হচ্ছে, আপনি সুখী হ'য়ে আসতে পারেন নি।

বিদ্যুতের আলো যেন দিগ্দাহ সুরু করে দিয়েছিল, সেনের বিস্মিত কণ্ঠস্বর সে আগুণকে চেলে নিয়ে আমার গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

সেন বল্লেন—কি চান বলুন আপনি ?

হায়রে! সারা জীবন ধ'রে কি চাইতেই থাকব আমি! আর যা চাইব—কোন দিনই তা পাব না—চুপ করে বসে আমি তাই ভাবতে লাগলাম।

সেন কাতর ভাবে বল্লেন—যদি না বলেন আপনি, আমি কি আর প্রতিকার করব, বলুন। অবশ্য, এ আমি স্বীকার করছি যে আমাদের আপনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে চেনেন না, কিন্তু আমরা ত আপনার অপরিচিত নই। আমাদের কাছে আপনি মন খুলে সব বলতে পারেন। সে নেই .....

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বঙ্কিম বলে উঠ্লেন—কিন্তু আমরা আছি ত!

তার দিকে চাইতেও পারলাম না। আমি সেনের পানে চেয়েই বল্লাম—আমি কলকাতা ফিরে যাব। আর কোথাও যাব না আমি।

সেন বিহ্বলের মত বঙ্কিমের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করতে লাগলেন। বঙ্কিম একটু পরে বল্লেন—কেন বলুন দেখি। এত খরচ পত্র আমাদের করিয়ে......

কে করিয়েছে খরচ পত্র ?

সেন কথাটাকে চাপা দেওয়ার মত বলে উঠলেন—সে কথা ছেড়েই দিন।

ছাড়ব কেন? কে করেছে খরচ পত্র?

সেন নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিলেন—যেই হোক, একজন করেছে ত!

সমস্ত খরচ আপনার?—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

সেন উত্তর দিলেন না, দিলেন বঙ্কিম। একটু হেসে, উপভোগ করার মত স্বরে বল্লেন—নইলে কার—আপনি ভাবছেন? দিব্যেশের!

আমি ত তাই জানি! কিন্তু সে জ্ঞান ত প্রকাশ করা গেল না।

সেন আস্তে আস্তে বল্লেন—তার জন্যে আমি দুঃখিত নই এখনও। আপনি কি চান বলুন। আপনার কোন প্রার্থনাই আমি অপূর্ণ রাখব না।

সে সময় যদি মুক্তির প্রার্থনা করতাম—হয়ত পাওয়া যেত! কিন্তু তখন আমি আগুণে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছি, স্নায়ু অচেতন—কোন অনুভূতিই আর নেই।

আমি দৃপ্ত স্বরে বল্লাম—আমার জন্যেই এত খরচ করেছেন—আপনি?

এবারেও সেনের কাছ থেকে তার জবাব পেলাম না। বঙ্কিম বল্লেন, নইলে আর কার জন্যে বলুন।

আমার জন্যে এত খরচ করলেন আপনি? কেন?—আগুনের ফুলকির মত বল্লাম—আমি আপনার কে?

সেন বল্লেন—আমার কেউ নন্।......

কোন কথাই স্পষ্ট বলার এবং শুনে নেওয়ার শক্তি আমার ছিল না।

আমি শুধু একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে, আর একবার বাহিরের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। চুপ করে ছিলাম কি না স্মরণ নেই; এমন অবস্থায় চুপ করে থাকা ছাড়া যে কি হ'তে পারে—তা আমি জানি নে। রেলগাড়ীর ছাদ তখন যেন নেমে নেমে আমার বুকের পরে জমে বসছিল, নিঃশ্বাস বন্ধ হ'বার ভয়েই আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে মুখ বাড়িয়ে নিঃশ্বাস নিতে ও ফেলতে লাগলাম।

ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম্ম—যেদিকটায় ট্রেণ থাম্‌ছে, সেদিকটায় একটু একটু আলো দেখা যাচ্ছিল, আমি যেদিকটায় বসে ছিলাম সেদিকে না ছিল একটা আলো, না ছিল একটা জনমনুষ্য। আমার পক্ষে এ দু'টি অভাবই সুখের ও শান্তির হ'য়েছিল। আলো, আলো, আরো আলো করে যারা চেঁচিয়ে মরে—তারা মরুক। আমি ত চাইনে। নিঃসঙ্গ নিরালা হয়-ত তা'দেরই ভালো লাগে না, যারা কেবল আলোই চায়, অন্ধকার যাদের কাছে বিশ্রী অশোভন বিবেচিত হয়। এ-কথা আমি বল্‌তে পারছি, কেন-না একদিন আমারও সেদিন ছিল। আলোয় চেয়ে আমি বিভোর হ'য়ে যেতাম। মানুষকে ভালোবেসে, মানুষকে আপনার করে' আমার সুখের শেষ ছিল না। আমার এই স্বল্প-পরিসর ক্ষুদ্র হৃদয়ের কুল প্লাবিত করে, ভালবাসার স্রোত যেন বাণের ডাকে নদীটির মত বিধ্বস্ত করে তুল্‌ত। কে দিয়েছিল এত প্রেম, আবার কেই-বা কেড়ে কুড়ে নিয়ে আমাকে এক নিমিষের মধ্যে এমন নিঃস্ব নিঃসম্বল করে দিলে, তাই বা কে জানে!

ছেলেবেলায় সহপাঠিদের আমি এমনি ভালোবাসতাম। আজ বল্‌তে লজ্জা নেই, অনেক মেয়েই শিশুকালে 'ঘরকন্নার' খেলা করে। আমার

সহবাসিনীদের মুখে শুনেছি তাঁ'দের মা-দিদিমারা-ও ছেলাবেলা সেই খেলা খেলেছেন। আজকালকার অনেক মেয়ে হয়ত সে খেলার নাম করলেই শিউরে উঠ্‌বে। তারা ক্যারম খেলে, পিংপং খেলে, পিচ-বোডের অক্ষর জুড়ে (ওয়ার্ডমেকিং) আমোদ পায়, (শুন্‌ছি না-কি রেস খাওয়াও আরম্ভ হ'য়েচে)—তারা যে আমার কথা শুনে চমকাবে—এ আর আশ্চর্য্য কি—তবুও সেই সব নব্য, আলোকোদ্ভাসিত (!) তরুণী কোমলাঙ্গীদের মার্জ্জনা ভিক্ষা করেই বল্‌ছি—কলেজের খাতা বই পেন্সিল কলম নিয়েই আমরা 'ঘরকন্নার' খেলা খেলেছিলাম, রমলা ছিল আমার কনে', আমি ছিলাম তার বর! সে ত একান্তই খেলা-ঘরের, নিতান্তই ছেলেমানুষী, তবুও কি মাধুর্য্যই না আমাদের মনে প্রাণে মিশেছিল! রমলা খেলা শেষ করে' সত্যি সত্যিই যখন তার কামনার ধন, জীবনের জীবন পেয়ে চলে গেল—আমার দেহ-মন এমন বিস্বাদে ভরে গেছল যে কী আর বল্‌ব। আহারে তৃপ্তি ছিল না, বিশ্রামে সুখ, নিদ্রায় শান্তি—আমার সব দূর হ'য়ে গেছল। আবার সেই নাটকেরই পুনরাভিনয় হ'য়ে গেল—আজ আমারই উপর দিয়ে!

আমার সব চিন্তার জাল ছিন্ন হ'য়ে গেল. সেনের ডাকে—সেন আমার পিঠের কাছে এসে কোমলকণ্ঠে বলে উঠলেন—মুখে কয়লা পড়বে, ফিরে বসুন।

তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোখ্‌ কর্‌ কর্‌ করে' উঠ্‌লো, আর তখনই তার দুকুল ছাপিয়ে এত জল অকস্মাৎ বেরিয়ে পড়'ল যে আমি মুখ ফিরিয়ে বস্ত্রাঞ্চল ঢাকা দিয়ে উবুড় হ'য়ে পড়লাম।

সেন কোথা থেকে একটা গোলাপজলের শিশি বারবার দেখিয়ে

বলতে লাগলেন—একটুখানি ঢেলে দিন, এখনি সেরে যাবে। বোধ করি পাঁচ সাত বার ঐ কথাটিই তিনি বলছিলেন, এবং সেই পুনঃপুনঃ আহ্বানেই মুখ তুলে চাইতেই, সেন শিশিটা আমার সামনে গদিরপরে রেখে দিলেন। অশুচিস্পর্শ ভয়ে শুদ্ধাচারী (!) হিন্দু বিধবা যেমন ডিঙ্গী মেরে পথ চলে, তেমনি হাতটা বাড়িয়ে শিশিটা রেখেই সরে গেলেন!

একাদশ পরিচ্ছেদ

স্মৃতির পাতা।

এ পরিচ্ছেদটা লিখ্‌তে আমার কল্পনার আশ্রয় নিতে হ'য়েচে। কি হ'য়েছিল না হ'য়েছিল কিছুই আমি মনে করতে পারি নে। ভীষণ জলোচ্ছ্বাস পদ্মপারের একটা গ্রাম যেন একেবারে ধুয়ে মুছে দিয়ে গেছে—গ্রামের কোন চিহ্ন না পাওয়া গেলেও, তার যেমন তেমন একটা কল্পনা করে' নেওয়া যায়—পরে আমি এই পরিচ্ছেদের কথা যতদূর সম্ভব গড়ে তোলবার চেষ্টা করেচি। হয়ত কল্পনা সব সময়ে সত্যের রেখাও স্পর্শ করবে না—তবু এ আমার নিজের পুড়ে যাওয়া কি না. ক্ষত বিক্ষত দেহের দিকে চেয়ে যা আমি ভাবতে পারচি, তাই বল্‌ব।

আমি শুনতে পেলাম, সেন বলচেন—দেখ বঙ্কিম, দিব্যেশ একটা কিছু গোলমাল করে ফেলেচে।

বঙ্কিম বল্লেন—কি আর গোল করবে, হ্যাঁ! ও সব নেকামী দেখ্‌ছ না।

তবু আমি নড়তে পারলাম না। মুখ গুঁজে পড়ে রইলাম।

সেন বল্লেন—না, না—সে কখনই সম্ভব নয়।

বঙ্কিম বল্লেন—নৈলে আর কি হ'তে পাবে বল?

তা ঠিক বল্‌তে পারচি নে, কিন্তু রাস্কেলটা পাল্লাল কেন? আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? সেই ষ্টেশনে একটা টেলিগ্রাম করে দেব? সে-যে-কি-হ'ল কিছুই বোঝা যাচ্চে না।

সে কথা মন্দ নয়। পরের ষ্টেশন থেকে একটা টেলিগ্রাম করে দাও। কাশী আস্‌তে বলে দিয়ো।

কিন্তু এ কি যাবে কাশীতে? ভোর হ'য়েচে, উঠ্‌লেই জিজ্ঞাসা করা যাবে—কি বল?

এরা কি ভেবেচে—আমি নিদ্রিত! আমার উঠে পড়তে ইচ্ছে হ'ল—কিন্তু এখনই তারা কি নিদারুণ প্রশ্ন করে বস্‌বে—ভেবেই অঙ্গ অবশ হ'য়ে গেল।

সেন বল্লেন—দেখ, নিশ্চয়ই গণ্ডগোল হ'য়েচে কিছু, নৈলে এরকম করবার ওর কারণ নেই। দেখ্‌লে ত কি রকম পড়ে গিয়েছিল—আমার ত ভয় হ'য়েছিল বুঝি মূর্চ্ছা হয়!

বঙ্কিম যে প্রবচনটি মুখস্থ বল্লেন, সে আমারও জানা ছিল কিন্তু সত্যিই ত আমি তত পাপিনী নই, আমার সাড়া দিতে ইচ্ছে হ'ল—কিন্তু তখনও দেহে বল ফিরে আসেনি। পারিলাম না।

সেন বল্লেন—পয়সা খরচ করতে আমি কুণ্ঠিত নই। এবং যথেষ্টই খরচ করেচি। মেয়েটির স্কুল ছাড়িয়ে আনা থেকে আজ পর্য্যন্ত খুব কম হয়ত দেড়হাজার টাকা খরচা হ'য়েচে। তুমি ত সবই জান!

বঙ্কিম যেন দুঃখিত ভাবে বল্লেন—হ্যাঁ অনেক খরচ হ'য়ে গেচে।

তার জন্যে আমি একটুও দুঃখিত নই। টাকা আছে, তাই খরচ

হচ্চে, না থাক্‌লে ত হ'ত না। এখনও সব খরচ করতে আমি প্রস্তুত আছি!……

সে কি আর আমি জানি নে।

বোধ হয় ততটা জান না। যাক্ সে কথা। আমি বলচি কি, এর অনিচ্ছেয় আমি আর কিছুতেই সাহস পাচ্ছি নে।

এ কথায় বঙ্কিম কি ভাবলেন জানি নে, আমার হৃদয়ে যেন বাণ ডেকে গেল। সেন মৃদু কণ্ঠে বল্লেন—সেই জন্যে বলি কি—এ যদি ফিরে যেতে চায়, বোধ করি সেই-ই ভালো।

এত শ্রম, এত অর্থব্যয় সব বিফল হ'বে?

আমি উৎকর্ণ হ'য়ে রইলাম, সেন কি উত্তর দেন। সেন বল্লেন—তুমিই ভেবে দেখ……

সে লোকটির উপরে আমার আদৌ আস্থা হ'ল না—পাছে সে কি বলে বসে, আমি উঠে পড়লাম।

দু'জনেই একটু থতমত খেয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ অবধি কেউ কোন কথাই বল্লেন না। আমিও যে তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনেছি তা দেখালাম না। সহজ ভাবেই সেনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কোন খবর পেলেন না?

সেন বল্লেন—কৈ না! আপনি সুস্থ হ'য়েছেন ত? আমাদের বড় ভয় হ'য়েছিল।

সেনকে আত্মীয়জ্ঞান করতেই আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, সহজস্বরে বল্লাম—ভালই আছি।

সেন বল্লেন—যান, মুখ হাত ধুয়ে ফেলুন, পরের ষ্টেশনেই চা আসবে।

তাই ত, অনেক বেলা হ'য়ে গেচে যে—বলে আমি স্নানঘরে ঢুকে পড়লাম। তাঁদের যে সব কাজ হ'য়ে গেছে—স্নানঘরে ঢুকে তা আমি বুঝতে পারলাম। হয়ত সত্যিই আমার মূর্চ্ছা হ'য়েছিল, নৈলে ঘুম ত আসে নি—এ পোড়া চোখে, অথচ কিছু মনে নেই কেন? কখন্ যে তাঁরা উঠেছেন, মুখ ধুয়ে, স্নান সেরে নিয়েছেন, কিছুই আমি টের পাই নি।

কোন মতে মুখ হাত ধুয়ে যখন আমি বেরিয়ে এলাম, গাড়ী থেমেচে। মস্ত ট্রেতে পাঁউরুটী, ডিম, চা সাজিয়ে এনে খানসামা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই সে ট্রে নামিয়ে একটা মস্ত সেলাম করে' বল্লে—বাবুরা খানা কামরায়।

সারারাতের অনিদ্রা অবসাদের পর গরম চা-টুকু বেশ লাগ্‌ল—ডিম দু'টিও খেয়ে ফেল্লাম, টোষ্ট চিবোবার শক্তি ছিল না, খানসামা আবার সেলাম করে ট্রে তুলে নিলে! দু'দুবার সেলাম নিয়ে তা'কে রিক্তহস্তে বিদায় দিতে ইচ্ছে হ'ল না—আমার একটা পোর্টম্যাণ্টু ছিল, সেটি খুলে একটা টাকা বের করে তার হাতে দিতেই আবার সেলাম করে' সে বেরিয়ে গেল।

সেন এসে বল্লেন—চা খেলেন? কৈ কাপড়-চোপড় ছাড়েন নি ত! নিন্—কাপড় ছেড়ে ফেলুন; আমরা ততক্ষণ পাশের কামরাটাতে আছি—এই বলে তিনি বঙ্কিমের হাত ধরে' আবার বেরিয়ে গেলেন।

কাপড় ছাড়ার কোন দরকার ছিল না, কিন্তু তাঁর কথা মেনে নিতে হ'ল—কেন তা আমিই তখন জানতাম না, তা বলব কি!

আর্শীর সামনে দাঁড়িয়ে চুলে একটু আধটু সংস্কার করে, পোর্টম্যাণ্টু

খুলে একখানা সাদা কাপড় খুঁজ্‌ছি—খামে ভরা একখানা চিঠি চোখে পড়ল। হাতের লেখা সম্পূর্ণ অপরিচিত। কে যেন অলক্ষ্য হ'তে আমার ললাট লক্ষ্য করে' ঢিল ছুঁড়ে মারলে। তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে ফেলে প্রথমেই নামটি পড়লাম—হতভাগা দিব্যেশ !

কি লিখেছে সে চিঠিতে—সে-সব যেন পড়বার প্রবৃত্তি হ'চ্ছিল না। চিঠিখানা হাতে ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে অক্ষরগুলো একেবারে লাফিয়ে সারিবদ্ধ হ'য়ে আমার চোখে ফুটে উঠ্‌তে লাগল।

—"হাওড়ায় গাড়ী ছাড়লে আর তুমি আমাকে দেখ্‌তে পাবে না। কূপের ভেক আলো সহ্য করতে পারবে না—চির অন্ধকারেই তার বাস, সেইখানেই তাকে থাকৃতে হ'বে।

এ চিঠি যখন তুমি পড়বে, তখন তোমার মনের যে অবস্থা হ'বে, অনেক আগেই তা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যতটা অন্যায় করেছি বলে তুমি ভাবছ—ততটা অন্যায় বাস্তবিক কি করেছি আমি ? হাঁ, একটা প্রতারণা আমি করেছি, সেটি যদি তুমি মার্জ্জনা করতে পার, বুঝবে যে আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। তুমি হয়ত তোমার নিজের অবস্থাটি জান না, যদি জান্‌তে, বুঝতে বিবাহের কথা বলা যত সহজ, কাজে ঠিক তা নয়। এ বড় নিদারুণ, মর্ম্মভেদী কথা, কিন্তু যাবার সময় তোমাকে তা আমি শুনিয়ে দিতে চাই। কদমের মেয়েকে বিবাহ করতে নেত্যর বাড়ীর কেউ-কেউ হয়ত পারে, আমি পারি নে। তবে যদি বল, তোমাকে মিথ্যা প্ররোচনা আমি কেন দিয়েছিলাম, তার উত্তর নেই। কারণ আমি আমার দুর্ব্বুদ্ধির বশে তোমাকে যেখানে এনে ফেলেছি

এর চেয়ে সুখের আশ্রয় তুমি পাবে না। আর একটা কথা, আমি এর কিছুই করি নি। স্কুলে তোমাকে প্রথম দেখে যিনি মুগ্ধ হ'য়েছিলেন তাঁরই কাছে তোমাকে আমি রেখে দিয়ে যাচ্ছি। নেত্যকালীর বাড়ীর অবস্থা যদি তোমার মনে থাকে, বর্ত্তমান অবস্থা তোমার কাছে লোভ-নীয় হ'বে বলেই আমার বিশ্বাস। এ তুমি নিজেই বুঝতে পারবে একদিন, সেদিন তুমি আমার উপর কোন ক্ষোভই রাখবে না—এ আমি স্থির জানি।

কিন্তু আমি নিজে তোমার সামনে থাকৃতে পারছি নে। কেন, তার আসল কারণটিও বলতে পারব না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, আমি যেন একটা যন্ত্র, লোকে যেমন দম দিয়ে চালিয়েচে, তেমনিই চলে এসেছি। তফাৎ এই, দম্ শেষ হ'লে ঘড়ি বন্ধ হ'য়ে যায়—আমাকে তার আগে থেকেই সরে যেতে হ'চ্ছে—তুমি আমার প্রতি বিমুখ নও—এ জেনেও।

বঙ্কিম তোমাকে ভালোবাসে, সেই তোমাকে চায়। কিন্তু তা'দের নিজেদের সাহস ছিল না, তোমাকে পেতে। বন্ধুর জন্য সে পথ আমিই খোলসা করে দিয়েচি। সে বিবাহ না করলেও তার কাছে তুমি সুখে থাকৃতে পারবে, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।"

আমার চোখ-মুখ দিয়ে আগুণ ছুটতে লাগল। কিছুক্ষণের জন্য আমি কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না। এদিকে গাড়ীর বেগ মন্দীভূত হ'য়ে আসচে, জোর করে চিঠিখানা শেষ করলাম।

"যদি পার, আমাকে একটু লঘু করেই ভেব। নেত্যর বাড়ীতে তোমাকে ত আমি দেখেচি, সে ছবি এখনও আমার মনে জেগে রয়েছে

বলেই তোমাকে গৃহ শূন্য করেও আমার দুঃখ হ'চ্ছে না। ইতি,—দোল-পূর্ণিমা। হতভাগা দিব্যেশ!"

চিঠিখানা হাতে করে বসে আছি, সেন এসে বল্লেন—হ'য়ে গেচে। ও-কি!

সেখানা তাঁর সামনে ছুঁড়ে ফেলে আমি দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলাম।

অল্পক্ষণ বাদে সেন বলে উঠ্‌লেন—স্কাউনড্রেল!

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমি আহত অচেতনের মত বলে উঠ্‌লাম—কে?

এই দিব্যেশটা—বলে' তিনি চিঠিখানা হাতে করেই নেমে গেলেন।

আবার আমি শুয়ে পড়লাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আশ্রয়-হীনা।

ভাবতে আমার সর্ব্বাঙ্গ স্থবির হয়ে যায়—যে একদিন, একটা লোক আমায় দেখে মুগ্ধ হ'য়ে আমাকে চাইতে এসেচে শুনে কত-না হর্ষোৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিলাম, আজ আর একজনের মোহের সংবাদ শুনে অঙ্গ শীতল হ'য়ে যায় কেন? প্রথম যেদিন দিব্যেশকে দেখেছিলাম, সে'দিন থেকে খুব ছোট খাট কথাগুলি পর্য্যন্ত আমার মনের পাতায় স্পষ্ট হ'য়ে আছে—সেদিন ত লজ্জায় অবসন্ন হ'য়ে পড়ি নি; সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠেছিল, সে আমার মনে আছে—কিন্তু কৈ এমন ক্লান্তি, এত বিতৃষ্ণায় ত মন ভরে ওঠে নি!

আমার সম্বন্ধে মায়ের কি মত ছিল—তা জানবার সুযোগ হয় নি। আজ মনে হয়, বোর্ডিং থেকে এসেই প্রশ্নটা কেন তাঁকে করি নি! তাহ'লে হয়ত এত দুঃখ ঘটত না এ জীবনে! কিন্তু সে ত আমার ভ্রম নয়। আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেও—নিজের মাকে এত শীঘ্র তীব্র প্রশ্ন করাও যে স্বাভাবিক ছিল না, আজ পর্য্যন্ত তা আমার মনে বদ্ধমূল হ'য়ে আছে। তাঁর জীবন আমার কাছে অনেকদিনই সুস্পষ্ট হ'য়ে গেচে—তাঁর জীবনে ঘৃণা হ'লেও আমার সঙ্গে যে তার পার্থিব কোন সংযোগই

ছিল না, এই জেনেই ত আমি দিব্যেশকে এ-জীবনের ধ্রুবতারা করে' ছুটে গেছলাম! হায়! সে-সব জান্‌ত, তবু ছেলে ভুলিয়ে কি মিথ্যা দিয়েই না আমাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। আমি যা করেছি, যা বলেচি আজ তাতে বুকভরা ক্ষোভ জন্মালেও আমার লজ্জা নেই, কারণ আমি এর কিছুই জান্‌তাম না! সে-যে জেনে শুনেই এমন মর্ম্মন্তুদ পরিহাস করে গেছে—এ দুঃখ ত আমার ম'লেও ঘুচবে না।

আর এক দুঃখ চিরদিন আমার হৃদয়ে কাঁটার মত বিঁধে থাক্‌বে যে, এ আগুণে সে অক্ষত দেহেই ফিরে গেচে। এমন কঠিন বিধাতা নেই যে-তাকে হাতে হাতে এর ফলটা দেখিয়ে দেয়! আমি ত গেছিই, যার পেছনে দেত্য, সামনে এই আগুণ—সে কি বাঁচতে পারে?—আমার শেষ হ'য়ে গেচে, এখন তারটা দেখ্‌তে পারলেই যেন আমি বেঁচে যেতাম।

কিন্তু এ চিন্তা অধিককাল স্থায়ী হ'তে পারল না। এ না কি বড় জোর আগুণ, যেখানে যা পায় পুড়িয়ে দিতে চায়, দিব্যেশের চিঠিটার প্রত্যেক কথাটিও আমার মুখস্থ ছিল, আমি ভাবলাম, সে কি করেছে? সে ত একটা যন্ত্র মাত্র—কে তার ইচ্ছা-প্রবৃত্তির চক্রটিতে দম দিয়ে নিজের ইচ্ছামত চালিয়ে নিয়ে বেড়িয়েচে? দোষ কার? তার—না এই চালকের।

দোষ যারই হোক, রাগের রেশ সামনে যাকে পায়, তা দিকেই ধাবিত হয়—দিব্যেশকে ঝেড়ে মুছে ফেলে আমি একেবারে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লাম।

যখন সেন আর তাঁর সঙ্গী ফিরে এলেন, তাঁরা আমার চেয়ে আশ্চর্য্য

হন নি নিশ্চয়, কেননা, আমার সে অবস্থা মনে পড়লে আজও আমি বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে যাই। আমি স্থিরভাবে বসে যেন তাঁদের বক্তব্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সেন জিজ্ঞাসা করলেন—কাশী যেতে আপনার কি ইচ্ছে নেই?

তাঁর বন্ধুটির আকারে ইঙ্গিতে এমন ভাবটা প্রকাশ হ'ল—যেন সেন প্রশ্নটা এরকম ভাবে করে ভাল করেন নি—এটা আমার চোখে পড়তেই দিব্যেশের চিঠির সেই ছত্রটা ভেসে উঠল। মন যেন বিদ্রোহ করতে চায়, তাকে সংযত করে' আমি বল্লাম—যাব।

এটুকু আমার চোখ এড়ায় নি যে বঙ্কিম আমার উত্তরে পরম তৃপ্তি পেলেন।

সেন-ও বোধ হয় সে'টি দেখেছিলেন, কারণ একমুহূর্ত্ত তিনি প্রসন্ন দৃষ্টিতে তারই পানে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ আমার যেন মনে হ'ল—এ-রকম জিনিষ আর কখনও দেখি নি। কিন্তু কি যে বিসদৃশ, অস্বাভাবিক দেখ্‌ছি তা বুঝতে পারি নি—তখনও।

সেন বল্লেন—কাশীতে আমাদের বাড়ী আছে, বুঝ্‌লেন। কলকাতা থেকে চাকর বাকর কাল সকালের গাড়ীতেই জিনিষ পত্র নিয়ে রওনা দিয়েছে। আমাদের আগেই তারা পৌঁছে যাবে।

একটু থেমে আবার বল্লেন—আপনি জানেন বোধ করি, আপনার কলকাতার বাড়ীখানা-ও এখন আমার পোজেসনে!—বলতে বলতে তিনি হেসে ফেল্লেন। বল্লেন—এ-রকম পোজেসন মনে করবেন না যেন।

আমাকে আঘাত দিতেই যেন কথাটি বলেছিলেন, কিন্তু তা'তে করে' আমি যে কতখানি ব্যথা পেলাম, তা ত তিনি জানলেন না।

বল্লেন—পোজেসন মানে হ'চ্চে......

আমি আর থাকতে পারলাম না। তীব্র কণ্ঠে বল্লাম—ইংরাজী বহি আমার অনেক পড়া আছে।

আহা! তা ত থাক্‌বেই। আমি বলচি আপনাকে যে আপনার বাড়ীর পোজেসনটা সভদ্দেশ্যেই নেওয়া হ'য়েচে। দেখুন-না—আপনি—এই বাড়ী-ছাড়া, জিনিষ পত্র ত বড় কম নেই।

'আমি বলে' বস্‌লাম—আপনি জান্‌লেন কি-করে?

জানাটা ত আদৌ শক্ত নয়,—দু'টি কারণে। ব্যস্ত হ'বেন-না, বুঝিয়ে দিচ্চি আপনাকে। প্রথমতঃ, আপনি যেদিন বোর্ডিঙ থেকে এসেছিলেন, আমরা আপনাদের বাড়ীতে ছিলাম। আর একটি কারণ হ'চ্ছে--দিব্যেশ আমাকে বলেছিল। আমি ছাড়া তার অন্য পথ ছিল না।

আমি যে গোপনে তাঁদের সব কথাই শুনেছি, সে ত আমি ব্যক্ত করতে পারি নে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম—পথ ছিল্‌-না কেন?

সেন বন্ধুর দিকে চাইলেন, যেন উত্তর তাঁর মুখে নেই।

বঙ্কিম ঈষৎ হাস্যের সহিত আঙ্গুল কটি নাচিয়ে বল্লেন—এই, বুঝলে, এই। এই হচ্চে শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃষ্ট পথ, তা তুমি-ও জান ত!

তার এই তুমি শব্দটা আমার কান যেন শুন্‌তেই পায় নি। আমি অবিচলিত কণ্ঠে বল্লাম—তা জানি। বসে বাইরে মুখ বের করে বসে রইলাম। এই লোকটির দৃষ্টি আমার ভালই লাগছিল না। তা না-

লাগুক, কিছু আসে যায় না তাতে—কিন্তু আর একজন সে দৃষ্টির মোহ অন্তরে অন্তরে অনুভব করছিলেন—সে আমি সেনের মুখের একাগ্রতা দেখে বুঝেছিলাম।

কুয়াশা ভেদ করে' অরুণোদয়ের মত সেন সহাস্যে বল্লেন—আপনি এর আগে কখন কলকাতার বাইরে বেরুন নি, না ?

না—এই প্রথম।

বঙ্কিম বল্লেন—তাহ'লে শুধু কাশী কেন,—আরও খানিকদূর গেলে হয় না ?—বলে সেনের পানে চাইতে লাগলেন। যে দৃষ্টির অর্থ রমণী আমি, ঠিকই বুঝে নিলাম।

সেন বল্লেন—কেন হ'বে না ?—নিশ্চয়ই হ'বে—কি বলেন ?

আমাকে প্রশ্ন করে বিপদেই ফেল্লেন। আমার দেশভ্রমণেচ্ছা যে আদৌ প্রবল নয়—সে কথা আমি তাঁকে জানাতে পারলাম না। জীবন-লীলাটা এমন যায়গায় এসে দাঁড়িয়েচে যে তারই শেষ দেখবার জন্যই আমি ব্যস্ত। যাঁরা দর্শক, তাঁরা হয়ত অভিনয়ের ঝটিতি শেষ দেখ্‌তে প্রস্তুত নন—কিন্তু আমার পক্ষে সে যে একান্তই অসহ অবহ হ'য়ে পড়েচে, অথচ সেনকে প্রতিরোধ করতেও ইচ্ছে নেই। আমি উত্তর দিতে পারলাম না।

বঙ্কিম বল্লেন—সেই ভালো, কি বলো, সোনা ?

আমি মুখ নীচু করে আছি, সেন বল্লেন—আপনার হয়ত আপত্য আছে !

তিনি যে উভয় সঙ্কটে পড়েছেন, তাও আমি বুঝলাম। বাইরের জগতের সঙ্গে কোনদিনই আমার সুস্পষ্ট পরিচয় ছিল না, কিন্তু এই অত্যল্প

সময়ের মধ্যেই ভাগ্যবিপর্য্যায়ে আমাকে অনেক বিষয়েই সতর্ক করে দিয়েছে। সেনকে যতদূর আমি চিনেছিলাম তাঁর উচ্চহৃদয় আমার অজ্ঞাত ছিল না এবং তাঁর দুর্ব্বলতা যে কোথায় তাও আমি জানি।

তাঁকে প্রীত করার উদ্দেশ্যেই আমি বল্লাম—না, আপত্য আর কি!

সেন দু'মিনিট কথা কইলেন না। তারপর বল্লেন—কোথায় কোথায় যাওয়া যাবে?

এ প্রশ্ন আমাকে নয়—তাঁর আয়ত চোখের তারা দুটি যে পার্শ্বোপবিষ্ট লোকটির মুখের পরেই স্থির হ'য়ে আছে—তা দেখেই আমার পিত্ত জ্বলে গেল। তাঁরা টাইম টেবল খুলে' পরামর্শ করতে লাগলেন—আমি সম্পূর্ণ বিভিন্নের মত অন্যদিকে মুখ করে বসে রইলাম।

এ কি অনিয়ম অত্যাচার! সেন নিজে সুপুরুষ! কি রকম সুপুরুষ তা হয়ত আমি প্রকাশ করে বল্‌তে পারি না। দিব্যেশের রূপ যেন পৌরুষস্তম্ভ হ'য়ে আমার নারীহৃদয়কে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল—এ রূপ ঠিক তা নয়—এ যেন সাধারণের মধ্যে অসাধারণ! লম্বায় তিনি ছ'ফুট নন; রং ও একেবারে চোখ্ ঝলসানে নয়—বরঞ্চ ঠিক তার বিপরীত। সেই অল্প গৌর বর্ণের নীচে থেকে এমন একটা স্নিগ্ধ কমণীয়তা ফুটে উঠ্‌তে—যা শুধু তাঁকেই দীপ্ত করত না, লোকের দৃষ্টিও আকর্ষণ করত। তাঁর রূপের বর্ণনা হয়ত আমার দ্বারা হ'য়ে উঠ্‌বে না কিন্তু তাঁকে যে বিমোহিত করেছে তার চেহারাটি আমি তুলি পেলে এঁকে দেখাতে পারি। একটা রমণীত্ববর্জ্জিত কিশোরী বালিকাকে ধুতি জামা পরালে যেমন হয় ঠিক তেমনি! আশ্চর্য্য তার গলার স্বর, বাইরে থেকে রমনী বলে' ভ্রম হয়।

সেন বল্লেন—লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আগ্রা যাওয়া যাবে।

আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, বঙ্কিমের কোলের উপরে বালির কাগজের টাইম-টেবল খানি খোলা পড়ে আছে—তার বাম হাতটি সেনের দু'টি হাতের মধ্যে! আমি চোখ ফিরিয়ে নেবার উপক্রম করছি সেন বল্লেন—বলুন। কথা কচ্ছেন না কেন?

রুদ্ধশ্বাসে বল্লাম—আশ্রয়হীনা আমি—আপনার আশ্রয়ে আছি—আপনি যা বল্‌বেন—তাই হ'বে।

সেন সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হ'লেন বুঝ্‌তে পারলাম না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

তালপাতার আশ্রয়।

মোগল সরাই ষ্টেশন আস্‌তেই বঙ্কিম বল্লেন—এইখান থেকে নৌকা কর।

সেন অমনি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—বেশ। আপনি কি বলেন?

বারবার আমার মত চাওয়াটা কেমন অশোভন বলেই বোধ হ'ল আমার কাছে।

সার্ভেন্টস কম্পার্টমেণ্ট থেকে চাকর ডেকে বঙ্কিম বিছানা-পত্র বাঁধতে বলে নেমে গেলেন, সেন ষ্টেশন ঘরের দিকে ছুটলেন, আমি একলা দাঁড়িয়ে প্ল্যাট্‌ফরমের জনতা দেখ্‌তে লাগলাম। একলা থাকাটা রমণীর পক্ষে যে কত কষ্টকর তা এই প্রথম বুঝলাম। কোথা থেকে দিব্যেশ বিশ্রী মূর্ত্তিতে আমার মনের মধ্যে এসে দাঁড়াল—তা'কে চিন্তা করা সহজ ছিল না, এবং করব না বলেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু মন ত আমার হাতধরা নয়; আর সে চিন্তা একবার প্রশ্রয় পেলে, আমাকে গ্রাস করে ফেল্‌বে এই ভয়েই সন্ত্রস্ত হ'য়ে আমি প্ল্যাট্‌ফরমে নেমে পড়লাম।

সেন ফিরে এসে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে বল্লেন—বঙ্কিম?

হারিয়ে ফেলার মত উৎকণ্ঠা আর চাঞ্চল্য দেখে আমার ভারী রাগ হল। কিন্তু সম্বরণ করেই বল্লাম—আসেন নি।

সেন এক দৃষ্টিতে প্রকাণ্ড ষ্টেশনটা খুঁজে নিয়ে বল্লেন—হ'বে না নৌকো করে যাওয়া! গাড়ী মিলবে না এখান থেকে গঙ্গার।

ও—বলে আমি কামরায় প্রবেশ করে বসে' পড়লাম; সেন অন্যদিকে চলে গেলেন। দু'তিনমিনিট পরে হাস্‌তে হাস্‌তে ফিরে এলেন। যেন হারাণো রতন খুঁজে পেয়েছেন।

সেন বল্লেন—খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই আপনার! কি খাবেন বলুন?

বঙ্কিম হেসে বল্লেন—খাবার খাবে? হিন্দু মাংস, হিন্দু ফাউল?

সেন সহাস্যে বল্লেন—হিন্দু ফাউল কি আবার?

জান না! নবদ্বীপের বোষ্টমরা যে মুরগী পোষে—সে খেতে দোষ নেই, সে সব হ'ল আসল হিন্দু!

সেন বঙ্কিমের পিঠে মৃদু করাঘাত করে বল্লেন—যাঃ!

বঙ্কিম হেসে বল্লেন—হিন্দু রিফ্রেসমেণ্ট রুম আছে এখানে।

তাই বল ছাই! আমি বলি—কি-না কি?

জান না বুঝি! সেই ভাট্‌পাড়ার কালী ভশ্চায্যির গল্পটা'!—বলে বঙ্কিম খুব জোরে চুরুটটায় টান্ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বল্লেন—ভশ্চায্যির ভারি নিষ্ঠে কিষ্টে; পয়সা কড়িও আছে, কলকাতা সহরে অনেক বড় বড় যজমান—প্রায়ই কলকাতা যেতে আসতে হয়। একদিন ভশ্চায্যি ঠাকুর যজমান বাড়ী থেকে ফিরছেন, রাস্তার ধারে একটা ঘরে দেখ্‌লেন লেখা রয়েছে 'পবিত্র হিন্দু আশ্রম'—সামনে একটা আলো, তার গায়ে 'আপনাদের সেই চিরপরিচিত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী' দেখে ঢুকে পড়লেন। চক্কোর্ত্তী মহাশয়ের সুপুষ্ট দেহে লম্বা উপবীত, শিখায় দুইটি

গাঁদা ফুল বাঁধা। দেখে ভশ্চায্যি ভারি খুসী। একটু আড়াল যায়গা দেখে বসে একটির পর একটি প্লেট্ খালি করতে লাগ্‌লেন। চক্কোর্ত্তীকে বলে দিয়েছিলেন, প্লেট্‌গুলো গঙ্গাজলে ধুয়ে দিতে। 'আর কি আছে, আর কি আছে বাপু?'—করতে করতে চক্কোর্ত্তীর ভাঁড়ারে যা কিছু ছিল তা প্রায় শেষ হ'য়ে গেল। শেষে চক্কোর্ত্তী ম'শাই যে জিনিষটি দিয়ে গেলেন, সেটি যেমন সুস্বাদু তেমনই উপাদেয়। খেয়ে ভশ্চায্যির পো ভারি খুসী—বল্লেন 'বাপু হে, এইটি তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট।' চক্কোর্ত্তী সগর্ব্বে উত্তর দিলেন—'আজ্ঞে হ্যাঁ, ফাউল রেঁধেই বুড়ো হ'লাম, ভালো হ'বে না! আর নিজে রোজ সকালে টেরিটিবাজারে গিয়ে পাখী কিনি, লোকজনের ওপর ভার দিলে কি-আর চলে!' এই বলে' কলিকালে কুড়ি টাকা বেতন লইয়া লোকজন ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার না করিয়া চুরি করিয়া মনিবের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে তাহারই বিশদ উপাখ্যান বিবৃত করতে লাগলেন। এদিকে ভশ্চায্যির চক্ষুঃস্থির! "হ্যাঁ বাপু? এটি কি বল্লে?" চক্কোর্ত্তী সবিনয়ে নিবেদন করলেন—আজ্ঞে ফাউল-রোষ্ট! খুব কচি মুর্গী……

ভশ্চায্যি রেগে অগ্নিশর্ম্মা, পুলিশ ডাকে আর কি।

চক্কোর্ত্তী বল্লে—ঠাকুর ম'শায়, আপনি ভড়কান কেন? হ'লেই বা তাই—হিন্দুর রান্না, হিন্দুর দোকান, গঙ্গাজলে ধোয়া প্লেট্, —ফাউল বল্লেই অমনি অপবিত্র হ'ল। শুধু তাই নয়, আজ আবার সকালে টালার নালা ভেঙ্গে কলের জল বন্ধ ছিল, গঙ্গার জলেই সমস্ত রন্ধন হ'য়েচে—এতে আর দোষ কিসের? শাস্ত্রেই রয়েচে গঙ্গা……শুনে ভশ্চায্যির ধড়ে প্রাণ এল। বল্লেন—'বাপু গঙ্গাজলে রেঁধে তুমি বড়ই উপকার করেছ। ওটা শাস্ত্রীয় হ'য়েচে।' দাম-টাম মিটিয়ে দিয়ে যাবার সময়

গোপনে বল্লেন—দেখ বাপু, এবার যেদিন আসব, তিন পয়সার খামে করে' তোমায় খপর দেব—সেদিনও ঐ গঙ্গাজলেই পাকটা করো!

চক্কোর্ত্তী ভক্তিভরে ভশ্চায্যি ম'শায়কে নমস্কার করে' বল্লে—আজ্ঞে হ্যাঁ, করব বৈ কি! আমার এটা পবিত্র হিন্দু আশ্রম, দেখ্‌ছেনই ত! অহিন্দু কিছুই পাবেন না। ত্রিসন্ধ্যে না ক'রে আমি জলগ্রহণ করি না। আর ঐ পাখী-টাখী বধ করবার আগে দস্তুরমত উচ্ছুগ্‌গু করে গায়ে মুখে গঙ্গাজল দিয়ে তবে বধ করি। তাদের কানে হরিনাম পুরে দিই, ভবযন্ত্রনা থেকে মুক্ত হ'য়ে যায়—বুঝলেন না ঠাকুর'মশায়। হাজার হ'ক্, হিন্দুর ছেলে, ব্রাহ্মণের বংশধর ত বটে—অশাস্ত্রীয় কি হ'তে পারে হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলবার যো-টি নেই! হ্যাঁ!"

শুনে সবাই হাসলেন, আমিও হাসলাম। তাই দেখে বঙ্কিম কৃত্রিম গম্ভীরস্বরে বল্লেন—কি! খাবেন না-কি হিন্দু ফাউল? গঙ্গাজলে পাক্ করা! শাস্ত্রীয়মত—দোষ হ'বে না—খাবেন?

সেন বল্লেন—অবশ্য বিলাতিও আছে—যা চান।

বঙ্কিম বল্লেন—আমরা বিলাতিই খাব। আপনি?

আমার মত মেয়েও নিজের খাওয়ার কথা বল্‌তে পার্‌লে না। সেন বোধ করি সেটা বুঝলেন, আর বাক্যব্যয় না ক'রে বঙ্কিমের হাত ধরে চলে গেলেন।

খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, বঙ্কিম ফিরে এসে বল্লেন—আর কিছু চাই, সোণা?—আমাকে হাত গুটোতে দেখে বল্লেন—লজ্জা কি, খাও না। বল, আর কিছু চাই?

না—বলে স্নানঘরে ঢুক্‌তে যাচ্ছি, বঙ্কিম খপ্ ক'রে আমার

হাতটা ধরে ফেলে বল্লেন—আমি এসেছি বলে খেলে না না-কি ?

সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেলেও মুখে তার চিহ্নমাত্র প্রকাশ পেল না, "খাওয়া হ'য়ে গেছ্‌ল" ব'লে একটু জোরেই হাতটা ছাড়িয়ে আমি ঢুকে গেলাম।

সেখান থেকে বেরুতে যে আমার কত দেরী হ'য়েছিল —সে যেন আমি বুঝতেই পারি নি। গাড়ী ছুটেছে—আমাকে দেখেই সেন বল্লেন—আমরা ভেবেছিলাম আপনি বুঝি ঘুমিয়ে পড়লেন!

এই রহস্য যে আমার মনোমত হয় নি, তা'তে আমি ব্যথা পেয়েছি এ যেন সেন সহানুভূতির বলেই বুঝতে পারলেন, তখনি নম্রস্বরে বল্লেন—এইবার কাশী দেখ্‌তে পাবেন।

এ-যেন কচি ছেলের হাতে খেলনা দেওয়া!

গাড়ী যখন পুলের উপর দিয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বেগেই ছুটতে লাগ্‌ল, সেন আমাকে কোন্ বাড়ীটা কি, কোন্ ঘাটটার কি নাম সব বলে দিতে লাগলেন। আমি হয়ত সব কথা শুনছিলাম না, কিন্তু তাঁর স্নেহের সুরটি যে আমার অন্তরতম প্রদেশ সিক্ত করছিল—এ আমি বুঝতে পারলাম।

শিবালয়ে যে বাড়ীটায় আমরা উঠ্‌লাম, সেটি সেনের নিজের বাড়ী। বাড়ীটা খুব বড় নয়, খুব যে বেশী সাজানো গোজানো তাও নয়—তবে তার মধ্যেই এমন সব জিনিষ আছে যার থেকে সেনের ধনৈশ্বর্য্য এবং সুরুচির পরিচয় অভ্রান্তরূপেই পাওয়া যায়।

বাড়ীতে খাবার-দাবার তৈরী ছিল। আহারাদির পর সেন বল্লেন—আজ আর বেরুবেন কি? তা'হলে গাড়ী বলে দিই।

বঙ্কিম বল্লেন—নিশ্চয়ই বেরুবেন। নৈলে কি আমরা 'একলা' যাব না-কি!

সেন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রইলেন। আমি ভাবছিলাম, সেন যদি অনুরোধ করেন, যেতেই হ'বে, আর আমিও তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম—আমার অমতে তিনি আমাকে অনুরোধ করবেন না।

ঠিক তাই। সেন বল্লেন—আজ বিশ্রাম করবেন!

বঙ্কিম বল্লেন—পরিশ্রম কি, যে, বিশ্রামের দরকার হ'বে?

সেন বলছিলেন—না না—

আমি বল্লাম—আজ আমি বড়ই ক্লান্ত!

সেন আর কিছু বল্লেন না, বন্ধুর হাত ধরে নেমে গেলেন। আমিও সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে তাঁদের ভ্রমণ বহির্গমনটা দেখ্‌তে লাগলাম। হয়ত আমার ভুল, কিন্তু যেন মনে হ'ল—বেড়াতে যাবার ইচ্ছা বঙ্কিমের আদৌ নাই, কেবল সেনই তাঁকে টেনে গাড়ীতে তুললেন।

আমি ছাদে চলে গেলাম। কাশীটা যেন একবার চোখ বুলিয়ে দেখার মত দেখে নিলাম। বাড়াটার পাশেই একটা সরু গলি, তার মধ্যে অনেকগুলো মুসলমান স্ত্রী পুরুষ বসে বসে মাটির কুঁজো, গড়গড়া, পুঁতুল তৈরী করছে। কতকগুলো উলঙ্গ শিশু মাটী ঘাঁটছে, পুঁতুল নাড়ছে, মার খাচ্ছে—এই সব।

পাশের বাড়ীর একটি বৌ ছাদে বসে জামায় সাবান মাখাছিলেন, আমাকে দেখে ত্রস্তে দাঁড়িয়ে উঠে হাতটি কাপড়ে মুছ্‌তে মুছ্‌তে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা আজ এলেন বুঝি?

মেয়েটি না-জানি কি অসভ্য বর্ব্বরই ভাবলে আমাকে! একটা ছোট্ট

হ্যাঁ বলে' আমি দুড় দুড় করে নেমে গেলাম। আর একদিনও ছাদে উঠ্‌ব এমন ভরসাও আমার ছিল না। কেন, তা বোধ করি আর বল্‌তে হ'বে না—কলকাতায় আমার নিজের বাড়ীর ছাদের কথা আমি ভুলি নি ত!

রাত্রে সেন বল্লেন—এই ঘরটা আপনার—বুঝলেন!

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম—বুঝেছি। একটা আরামের নিঃশ্বাসও পড়ল।

বঙ্কিম সে-সময় ঘরে ছিলেন না। সেন বোধ করি সেই জন্যেই একটু চঞ্চল হ'য়েছিলেন। আর কিছু না বলে চুপ করে বসে রইলেন।

এই নীরবতা যেন সন্ধ্যের মত ধরণীকে গ্রাস করতে এ'ল। প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমার কণ্ঠ রোধ করতে চায়। যা ভাবতেও আমার ভয় হয়—মুখ যেন সেইটি বলবার জন্যেই ছট্‌ফট্‌ করছে। জীবন ত আমার কাছে স্বচ্ছ তটিনীটির মত ছিল না, ক্ষুদ্র উপলখণ্ড ত তার কলগান আরো মধুর করে তুলত না—এ একটা এমন জীবন যে কিছুর সঙ্গে কিছুরই তার যোগ নেই, প্রকাণ্ড খাপছাড়া। এই চিরভ্রান্ত জীবনেতিহাসের এমন একটি পাতাও ছিল না যেখানটাকে ভেবেও একটু সান্ত্বনা পাই। একটা সময় সে এসেছিল, কিন্তু কার নির্ম্মম ইচ্ছার বলেই ব্যঙ্গ করে ফিরে গেছে।

এর এক বিন্দু আমি ভুলতে পারি? তার অক্ষর ত জলের আলপনা নয়, যে বাতাসের ভরটি সৈবে না, রৌদ্রের তেজ না পেতেই শুকিয়ে যাবে! এর অনুপরমাণুতে অবধি আমার রক্তাক্ত হৃদপিণ্ডটা নিষ্ফল-রোষে নিজের শক্তিই অপহরণ করছে।

বোধ করি সেনও বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। চাকরকে বলে দিলেন

—বঙ্কিমকে ডাকৃতে। এই শুনেই আমি ক্ষেপে' গেলাম! এ-যে আর সহ্য হয় না। ঝড় না-কি আগেই উঠেছিল, এখন বাতাস তাতে যোগ দিলে!—আর যায় কোথায়? এর গতিরোধ করবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

. . আমি সেনের সামনে বসে পড়ে বল্লাম--আমায় আপনি ত্যাগ করবেন-না!

হায়! হায়! এও আমার বরাতে ছিল! এ কি অভিশাপ বিধাতা আমার ললাটে ছাপ মেরে দিয়েছিলেন—সেন বল্লেন, আপনি না ত্যাগ করলে, নয়!—আশ্চর্য্য. এমন স্নেহ-কোমল সুমিষ্ট যার স্বর স্রষ্টা কি তার হৃদয়টা বসিয়ে দিতে ভুলেছিলেন, নইলে সে কেমন করে পারলে। পাছে আমার প্রসারিত হস্ত গায়ে ঠেকে যায়, আমার স্পর্শ ভয়ে সে পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি দাঁড়িয়ে, একবার চারদিক্‌টা দেখে বেরিয়ে গেলাম।

এ জিনিষটার মজা এমনি, এত তার তর্জ্জন'গর্জ্জন, এত লাফালাফি ঘরের বাহিরে যখন এল একেবারে হিম হ'য়ে গেচে। এত বড় অন্ধকার আকাশটায় সেই একটা তারাই জ্বলছিল, মাধ্যাকর্ষণের মত যেন তারো একটা শক্তি জন্মে' আমাকে ক্রমাগত টেনে ফেল্‌তে লাগল! একি হৃদয় দ্বন্দ্ব! জানি না, মানুষের মনের এ অবস্থাকে কি বলে, তবে তার চেয়ে ভীষণতর আকর্ষণে কেউ আমাকে ভুলিয়েছিল কি-না, তার অভিজ্ঞানের জন্যে তখন আমি তত ব্যস্ত হই নি, তারি পীড়াভারে আমার সমস্ত দেহটা ঢেউয়ের মত নাচিয়ে তুলছিল।

আকাশের অন্ধকার ক্রমশঃ যেন তরল হ'য়ে আসছিল, সেদিন তিথি

কি ছিল আমি জানতাম না—কিন্তু কোথাকার একটা আলো কোন্‌-দিকে উঠে অন্ধকারকে ফ্যাকাসে করে দিচ্ছিল। তারার দীপ্তিও নিষ্প্রভ হ'য়ে গেচে।

বঙ্কিম উপরে এসেই আমার সন্ধান করতে লাগ্‌লেন। তাঁর গলার স্বর চেহারার অনুরূপ ছিল না, তা থাকলে আমি শুন্‌তে পেতাম না। চেহারাটি ছিল বেজায় পাতলা, মুখখানার যেন কোন একটা বিশেষ রং নেই, গোফের রেখা দিয়েছে মাত্র, কিন্তু গলা একেবারে কাঁশীবাজার মত। "গেল কোথা ছুঁড়ী ?"

সেন স্বাভাবিক স্বরেই বল্লেন—শুতে গেছে।

"কাঁশী বাজল—কোথায় শুতে গেল আবার। ডাক......

সেন তাঁর হাতটা ধরে টেনে বসালেন। কি বল্লেন, তা আমি শুন্‌তে পেলাম না। আমি সবই দেখতে পেয়েছি, কিন্তু আর ত সেখানে থাকা চলে না। কি-জানি ঐ রোগা দেবতা আবার যদি খোঁজ নিতে বেরিয়ে পড়েন।

আমি পা টিপেই ঘরে ঢুকেছিলাম, দরজা বন্ধ করতে একটা শব্দ হয়ে গেছল, প্রায় সেই সঙ্গেই বঙ্কিম ডেকে উঠ্‌লেন—সোনা!—আর সাড়া পেলাম না।

এই দু'য়ের সম্বন্ধ বিচার নিয়ে এক সময়ে আমার চিন্তার অন্ত ছিল না, আজ কিন্তু সে-সব চিন্তা অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। মনের মধ্যে চিহ্ন টুকু পর্য্যন্ত নেই—আজ যে চিন্তা আমার প্রথম হ'ল—তা এই, যে এর সীমা আছে কি ? যদি থাকে, তবে সে কতদূর ? এবং আমি কোনদিন তার রেখাটাও দেখ্‌তে পাব কি-না।

যাদের প্রগাঢ় প্রণয়ের সীমারেখা নির্দ্দেশ করতে এত তৎপর হ'য়ে উঠেছিলাম আমি তা'দের কথাই ভাবতে ভাবতে আমার মনে হ'ল যে কেবলমাত্র সেই প্রণয়ের বলেই আমি আশ্রয় হারিয়েও সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আছি। দিব্যেশের চিঠির সেই অংশটা জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলে উঠ্ল; আজই ভোরে ট্রেণে তাঁদের কথাবার্ত্তাও মনে পড়ল—তাকেই তুষ্ট করতে সেন দিব্যেশ-যন্ত্রে দম দিয়ে আমাকে গৃহহীন করেছে! এক মুহূর্ত্ত আগে যে সেনের পায়ের কাছে বসে, অশ্রুজলে ভেসে বল্তে পেরেছিলাম—আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন না—এখনি নিজের জিহ্বাকে ধিক্কার দিলাম—ছিঃ ছিঃ; এ কথা কেন বলেছি, কা'কে বলেছি? যার কাছে অসীম বিশ্বাস ভরে এই প্রপীড়িত, লাঞ্ছিত, আর্ত্ত নারীজীবনটাকে এক নিঃশ্বাসে ন্যস্ত করে দিয়েছি—তার কি নিজেরই সত্তা আছে যে আমাকে সে রক্ষা করবে! সেই রোগা দেবতাটির তুষ্টির পরেই যে নির্ভর করছে আমার এই আশ্রয়টুকু, তার অনিচ্ছায় যে একমুহূর্ত্তও এই আশ্রয় কুটীরখানি সোজা দাঁড়িয়ে থাক্‌বে না জেনেই—সেনের উপরও অশ্রদ্ধা হ'য়ে গেল।

সেনের আশ্রয় যে নদীর কিনারে তালপাতার আশ্রয়, যে কোন সময়েই অল্প বাতাসেই, নদীর ফাঁপেই ভেঙ্গে পড়ে যেতে পারে, সেই ভেবেই অন্ধকার ভবিষৎটার পানে চেয়ে দেখ্‌তে লাগলাম। সে কী অন্ধকার! কেতাবে পড়েছি সূচীভেদ্য অন্ধকার, না-জানি সে কত ভীষণ! আমার চারিপাশ ঘেরে যে আঁধার জমে উঠে আমাকে আকুল করে তুলেছিল আমি ত তা ভেদ করে সেই জগজ্জ্যোতিঃ জগদীশ্বরকেও দেখ্‌তে পেলাম না। তাঁর নাম, তাঁর আলো না-কি সব সময়েই পাপী-

তাপীর প্রাপ্য, তা থেকে কোন অভাগাই বঞ্চিত হয় না—সেই আলোই যখন আমি দেখ্‌তে পেলাম না' তখন ত আমার মৃত্যু বাঞ্ছাই জন্মেছিল। সত্যিই মরণোন্মুখের মত আমার স্নায়ু শিথিল হ'য়ে গেল, নয়ন দীপ্তিহান, হৃদয় শক্তিহারা হ'য়ে কেবল শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর খুঁজতে লাগ্‌ল।

রাত তখন কত জানি নে—ঠাণ্ডা ঝুরঝুরে হাওয়া মনকে আবার সজীব করে দিলে। ইনজেকসানে মানুষ যেমন হ'য়ে ওঠে, তেমনি! চিন্তাটিকে রঙ চঙে টি্‌কলার ছবি করে দিয়ে গেল। এই কাশীর নিস্তব্ধ অন্ধকার যেন আমার বহুকালের পরিচিত আলাপী, আমাকে শীতল করতেই সে বাতাস পাঠিয়ে দিয়েছিল; এই ঘরবাড়ী আমার চোখের সামনেই উঠেছে যেন।...কখন্‌ যে আমি মা'র কোলের' পরে অজ্ঞান-শিশুটির মত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তা'ও জানি নে, কিন্তু ভোরের আগেই ঘুম ভেঙে গেল।

বেরিয়ে এসে দেখি, এ্রদের ঘর খোলা! চোখ ছুটে যেতে চায়, দেখব না প্রতিজ্ঞা করেই—সামনে দিয়েই পথ—যেতে যেতে কখন্‌ যে আমার অজ্ঞাতসারেই ছবিটা চোখের পাতায় মুদ্রিত হ'য়ে গেচে—যা এখন পর্য্যন্ত অম্লান সুস্পষ্ট হ'য়ে রয়েচে! এ-যেন বায়স্কোপের ছবি, কবে-কে-কোথায় তুলেছে, তার পর কল ঘোরাচ্চে আর দেখাচ্চে।

দুটিতে মুখোমুখী পড়ে ঘুমোচ্চে—কল ঘোরাণোর মতই এখনও এ আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। সেই! সেই!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আতিথ্য।

বিছানায় বসেই সেনেরা চা পান করলেন। উপন্যাসের নায়িকাদের মতই আমিও তাঁদের সামনেই বিস্কুট চিবুতে লাগলাম। স্বকৃত এ অপরাধের অনুশোচনা পরে আমার বড় কম হয় নি, কিন্তু তখন যেন কিসের নেশায় আমাকে উধাও করে নিয়েছিল, এই আমার ঐকান্তিক আশা বলে টের পেয়েছিল।

সেন বল্লেন—দিনের প্রোগ্রাম একটা করা যাক্-কি বলেন ?—তাঁকে পাশের দিকে চাইতে দেখেই আমার মনে পড়ল, সকালের সেই ছবিটা! দু'জনে গলাজড়াজড়ি করে কি সে পরামর্শ হয় নাই ?

করুণ—বলে আমি অন্যদিকে ফিরে বসে রইলাম। একটু দূরে বঙ্কিম মুখখানা ভিজে কম্বল করে বসে রইলেন।

সেন বল্লেন—তাড়াতাড়ি ত নেই, বেশ ধীরে সুস্থে দেখা যাবে কি বল হে!

মুখের আলুভাতে ভাবটা ঘুচল না, ক্যাঁ ক্যাঁ করে বঙ্কিম বল্লেন—তাই হ'ক!

সেনের যেন আর উৎসাহ রইল না। বার বার তোয়ালে দিয়ে মুখই মুছতে লাগলেন। এসব আমার ভারি বিশ্রী লাগল।

আমি তাঁর দিকে চেয়েই বল্লাম—কি কি দেখবার আছে এখানে ?

তিনি যেন কষ্টে স্পষ্টে বল্লেন—কাশীতে ! ওঃ—অনেক আছে !

বল্লাম—বলুন না শুনি ?

শুন্‌বেন ! বলে একবার মুখ মুছলেন। কোনটাই যেন মনে আসছিল না। তার জন্যে তিনিও লজ্জিত হ'য়ে উঠছিলেন, তাঁর মুখ দেখেই সে আমি বুঝতে পারলাম।

অনেক দেবমন্দির আছে, শুনেছি।

অনেক অনেক—বলে সেন বন্ধুর পানে চেয়ে বল্লেন—আজ সারনাথে যাওয়া যাক্‌ কি বল ?

আমার চোখের তীব্র দৃষ্টিতে বঙ্কিম ত্রস্ত হ'য়ে পড়লেন, স্বর অপেক্ষাকৃত নরম করে' বল্লে—বেশ ত ! একটা ফোটোগ্রাফার পাওয়া যাবে না ? একটা গ্রুপ তুলিয়ে নেওয়া যেত।

সেন বল্লেন—ফোটোগ্রাফারের আবার দুঃখু, চলনা চকের দিকে, ঢের আছে। ···একটু পরে বল্লেন—আপনার আপত্তি নেই ত !

ফোটাগ্রাফের কথা যেন আমি শুনিই নি, এমনি ভাবে উত্তর দিলাম আপত্তি কিসের ?

সেন সানন্দে বল্লেন—নেই ত, তাহ'লেই হল !

এর ভেতর ব্যঙ্গ বা শ্লেষ ছিল না—সে আমি জানি ! বিরক্ত নয় একটু বিস্মিতের ভাণ করে' জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—কিসের আপত্তি ?

ভাণ করতে গিয়ে আমি যেন জড়িয়ে পড়েছিলাম ! সেন এবারও ঠিক বুঝতে পারলেন না।

আমি পুনরায় বল্লাম—কিসে আপত্তি তাই যে জানি নি, ছাই ?

বলিহারি লোক আপনি! তবে এতক্ষণ কি শুন্‌লেন?

আমি ত শুনি নি, আমি দেখ্‌ছিলাম। ঐ যে—দেখুন না মজাটা!

একটি হিন্দুস্থানী ছেলে ফর্সা জামা কাপড় পরে লেখাপড়া কর্‌তে যাচ্ছিল, গলি থেকে বাঙ্গালীর একটা নগ্ন ছেলে এক পিচকিরি রং তার গায়ে ছুঁড়ে পালিয়েছে। একগাদা লোক জড় হ'য়ে মহা আস্ফালন জুড়ে দিয়েছে—বাঙ্গালীর ছেলের এ স্পর্দ্ধা তারা সহ্য করে কেমন করে'—এই তাদের সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল—স্বজাতের ছেলে হলেও বা ক্ষমা ছিল। আমি দেখ্‌তে পেলাম, একটি বিশ পঁচিশ বছরের জামা গায়ে বাঙ্গালী ছেলে ডাক-বাক্সটায় চিঠি ফেল্‌তে হাত পুরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে। তারা যতই গর্জ্জন করছে—হেন্‌ করেঙ্গা, তেন্‌ করেঙ্গা, তার হাত ততই আড়ষ্ট হ'য়ে যাচ্চে। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর সম্মানের কথাই শুনে এসেচি, কিন্তু চোখে যা দেখা গেল, আমার রক্তও তেতে উঠ্‌ল।

সেন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন। চটি জুতো পায়ে দিয়ে ফট্‌ ফট্‌ করে' নেমে ভিড়ের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন।

একটা ছোঁড়া—যে খুব জোরে গালাগালি দিচ্ছিল, চটাং করে' তার গালে একটা চড় দিয়ে বল্লেন—যাও—তফাৎ!

আমরা দুজনেই, আমি আর বঙ্কিম, বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম।

সেন আবার সেই চিঠি ফেলা-লোকটির গালে আর এক চড় বসিয়ে বল্লেন—লজ্জা করছে না দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে।

চড়ের শব্দের প্রতিধ্বনি না মিলুতেই খোট্টার দল 'রেন্‌দি' করে' লাফিয়ে উঠ্‌ল; আমার বুকও ধড়াস ধড়াস করতে লাগল।

সেন পকেট থেকে একখানা পাঁচটাকার নোট সেই সদ্য-রঞ্জিত-দেহ

ছেলেটির হাতের উপর দিয়ে, ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলেন। ছেলেটির হাতের দিকে পড়ল সবার নজর !......সেন উপরে এসে বল্লেন -ভালো হাঙ্গাম সকাল-বেলা !

যেন সব সময়েই হাঙ্গামাটা শোভণীয়, এই সকাল ছাড়া ! বঙ্কিম হেসে বল্লেন—ছেলেটা চলে গেল !

সেন বল্লেন- যাবে না ? হাতে রুধির পড়েছে যে ! শুধু যে পুলিশই রুধির পেলে সন্তুষ্ট হয়, তা নয়—সবাই। বুঝলে ?

সে গল্পটা বলা হয় নি। কাল সন্ধেবেলা এক পুলিশ (টিকটিকি হ'বে) এসে হাজির.—টিকে দেওয়া হয়েচে কি না—পাড়াটায় না-কি ভয়ানক কলেরা হচ্ছিল—সেন একধমকে তাকে দূর ক'রে হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজে দিয়েছিলেন। পুলিশ হাতে টাকা পেতেই রিপোর্ট লিখলে, এদের হাতে টিকে আছে। আজও টাকা দিয়েই তিনি বিবাদ মিটিয়ে দিলেন। এই পর্য্যন্ত ছিল এর বেশ, কিন্তু জাঁক করাটা না-কি কোন সময়েই উচিত নয়—তাই সেটা আমার ভাল লাগল না। আমি বল্লাম—আপনি কি মনে করছেন, পাঁচটা টাকা পেয়েই থোট্টারা থেমে গেল ?

সেন পরিহাসের স্বরে বলে উঠলেন—মনে করাটা ত আশ্চর্য্য নয়—বরং স্বাভাবিক। যদিও আমি তা মনে করি নি। আমি যা মনে করেচি তা একেবারে উল্টো। এত আকস্মিক ও-ভিড়ের মধ্যে যে কেউ ঢুকত সেই পারত—গেলে মিটিতে দিতে ! দেখুন, হঠাৎ কাজ করার এই একটা মস্ত গুণ ! কুম্ভীর বাহারলি আর কি ! কোথাও কিছু নেই —একেবারে আচমকা !

আর কিছু বল্লাম না।

সেন ভাবলেন হয়ত, তখনও আমি বুঝতে পারি নি। একটু হেসে বল্লেন—কি! আপনি বুঝতে পারলেন-না?

বুঝেছি।

বঙ্কিম বল্লেন—সারনাথে যাওয়াই ঠিক ত?

সেন আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—ঠিক বৈ-কি! গাড়ীর কথা বলে দিই······বলে তিনি নেমে গেলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেরিয়ে যাচ্ছি—বঙ্কিম দরজার সামনে এসে বল্লেন—এক গাড়ীতেই যাওয়া হ'বে ত?

এ-পর্য্যন্ত এ-চিন্তা আমার ছিল না, কিন্তু তাঁর মুখে সে-কথা শুনে আমার মন আর বশ মান্‌লে না; আমি সেনের পাশে দাঁড়িয়ে বল্লাম—দু'খানা গাড়ী করবেন।

সেন বঙ্কিমের দিকে চেয়ে বল্লেন—আচ্ছা!

আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়—আমি দ্রুতপদে পাশের ঘরটায় ঢুকে পড়লাম।

আহারাদির পরই সেনের গাড়ী এসে লাগল। সেন-যে ধনী যুবক সে ত নিশ্চয়ই, এবং ধনগর্ব্বও তাঁর অনেক দেখেছি, কিন্তু সেই সত্য মিথ্যার গর্ব্বের তলে বেশ একটু মাধুর্য্য ছিল। যা' কাউকে মুগ্ধ করবেই! অন্ততঃ আমাকে করেছে। একজোড়া ঘোড়া আর একজোড়া গাড়ী কাশীতেই থাকৃত,—বাবু বছরে দু'তিনবার এসে থাকেন।

দুখানা গাড়ীই এসেছিল, দরজার কাছে এসে সেন বল্লেন—আপনার কষ্ট হ'বে না ত মুখটি বুজে একগাড়ীতে একলা—অনেক পথ কি-না!

চলুন—এক গাড়ীতে যাই।

সেন আর কথা কইলেন না। কথাটা বলেই আমার জিভ্ বেরিয়ে গেছল—নইলে বঙ্কিমের মুখটা দেখবার ইচ্ছা ভারি বলবতী হ'য়েছিল।

আমাকে পিছনের আসনটায় বসিয়ে তাঁরা সামনে বসে পড়লেন।

আমি বল্লাম—আপনারা এদিক্‌টায়……

সেন হেসে বল্লেন—অতিথি যে আপনি!

পকেট থেকে সিগারেট কেস্‌টা বার করে বঙ্কিমের মুঠোর মধ্যে পুরে দিয়ে বল্লেন—আর, আপনার কথাতেই আমরা সন্তুষ্ট হ'য়েচি।

"ভবতীনাং সুনৃতয়ৈব গিরা কৃতমাতিথ্যম্"—

বুঝলেন ত।

স্কুলে সংস্কৃত আমার প্রিয় ছিল না। নইলে আমার যেমন মেধা ছিল, এমন না-কি অনেক মেয়ের কেন, ছেলেরই থাকে না। এ আত্মপ্রশংসা নয়—নিছক সত্য। কিন্তু সে রহস্য প্রকাশ করতে সাহস ছিল না, একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বল্লাম—কিসে আছে বলুন ত?

সেন বল্লেন—অভিজ্ঞান শাকুন্তলম। সেই যে, রাজা দুষ্মন্ত এসেছেন, —প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে পাদ্যঅর্ঘ আনতে পাঠাচ্ছেন, রাজা বল্লেন— আহা পাদ্যঅর্ঘে আমার দরকার নেই। মুখের মিষ্ট কথাই যথেষ্ট— তোমার মনে আছে ত বঙ্কিম?

যা ভেবেছি তাই, আমারই জোড়া!

ঠিক মনে হ'চ্ছে না, তবে হ্যাঁ……আর—যেন বল্লেন না।

মনে আছে নিশ্চয়ই, এখন হয়ত মনে পড়ছে না…বলে সেন তাঁর হাত থেকে একটি সিগারেট নিয়ে অগ্নিসংযোগ করলেন।

কাশীর রাস্তায় মনোযোগ দিলাম। কিন্তু রাস্তার দুধারে খুবরী কাটা জান্‌লার বাড়ী আর মাঝে মাঝে পাচিল দেওয়া বাগান...এর চেয়ে আমাকে উৎসাহিত করে ফেলেছিল, সে একটা গল্প।

এক যে ছিল রাজা, তার ছিল দুই রাণী,—দুয়ো রাণী আর সুয়ো রাণী। রাজা সুয়েরাণীকে ভালবাসেন ভারি! আর দুয়োরাণী আস্তাবলে না থাকলেও প্রাসাদেরই এক কোণে থাকেন; আর ঠিক চাকর দাসী নয়, এই রাঁধুনি বামণীর মত! তবে রাজা লোকটি বড ভাল, সুয়োরাণীর বেণারসী, পার্শি হয়, দুয়োরাণীও বাদ পড়েন না,—জামা সেমিজও পান! সুয়োরাণী হাজার টাকার হার বালা পরেন, দুয়োরাণী একশ' টাকার মটর-মালাও পান। মোটের উপরে একেবারে বঞ্চিত রাজা দুয়োকেও করেন না। এবং—এবং দুয়োরাণীর দুটি একটি ছেলেপুলেও হ'ল।—গল্পটা আমি কি-রকম যে ঠিক শুনেছিলাম, আজ তা আর মনে করতে পারি নে, কাজেই এর সবটা সত্যি গল্প অথবা আমারই কল্পনা প্রসূত [illegible] ঠিক নেই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

'অতিথির সর্ব্বস্ব।'

গত রাত্রের কথাটা না বলে থাকতে পারছি নে। ফিরতে আমাদের সাড়ে সাতটা বেজে গেছল। আমি এসেই নিজের ঘরটিতে দ্বার বন্ধ করে শুয়ে পড়েছি, খাব না শুনে চাকরটা দুবার দু'বার এসে

ফিরে গেচে—সেন নিজে এসে কক্ষদ্বারে করাঘাত করতে লাগলেন। তবুও অনেকক্ষণ আমি সাড়া দিলাম না—কিন্তু ত'াতেও তাঁর উৎসাহ কম্‌ল না। তিনচারঘণ্টা আমাদের কথা-বার্ত্তা ছিল না, সমস্ত গাড়ীটা মুখ বুজেই আসা গেছে। তিনিই কথা বন্ধ করেছিলেন, তিনিই আহ্বান করছেন—আমার সারা হৃদয়ে তুফান উঠেছিল। তবু আমি উঠবার চেষ্টাও করলাম না। তিনি যে অকারণেই আমার প্রতি বিরক্ত ক্ষুব্ধ হ'য়েচেন—আমার তাতে কোনই অপরাধ ছিল না এ কথাটা জানাবার ইচ্ছে হ'লেও পারলাম না। সে একটা সামান্য কথা, এক গ্রুপে ফটো তোলাতে রাজী হই নি।—এই তাঁর রাগ!

সেন যেন চলে যাচ্ছেন, এমনি ভাবে বল্লেন—খুলবেন না ত।

আমি আস্তে আস্তে বল্লাম—খোলা আছে।

ধাক্কা দিয়ে দরজাটি খুলে সেন বল্লেন—এ কি অন্ধকার যে! আলো দেয় নি?—পাছে হাঁক ডাক সুরু করে দেন, আমি ত্রস্তে বলে উঠলাম, আলো আছে, সহ্য হ'চ্ছে না, নিবিয়ে রেখেছি।

আপনি নাকি খাবেন না বলেছেন?

হ্যাঁ—আমার ক্ষিধে নেই, আর বড় পরিশ্রান্ত।

কেমন—বলিনি! পাহাড় দেখেছেন আর ছুটেছেন—বলিনি আমি! আচ্ছা দাঁড়ান।—বলে তিনি চলে গেলেন, মিনিটপাঁচেক পরে ফিরে এসে বল্লেন—এইটুকু খেয়ে ফেলুন ত! না-কি? লক্ষীটি, খেয়ে ফেলুন। আবার না! আমি বল্‌ছি এ ওষুধ!—বলে সেই অন্ধকারেই হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে ধরতে এলেন; তাঁর হাত আমি দেখ্‌তে পাইনি সত্যি, কিন্তু একটা প্রোজ্জ্বল হীরা তাঁর মাঝের আঙুলটায় দিবারাত্রই

জলত—সেই আলো অনুসরণ করেই আমি তাঁর বাহুপাশে ধরা দিয়ে বল্লাম—আপনি আমাকে রক্ষা করুন। অসহায়, অনাথা, আশ্রিতা আমি, বলুন আমাকে রক্ষা করবেন?—বলুন।

সেন আস্তে আস্তে বল্লেন—ক-র-ব।—হাতটি সরিয়ে নিয়ে আরো আস্তে আস্তে চলে গেলেন। কি খাওয়াতে এসেছিলেন, আবার না খাইয়েই কেন চলে গেলেন—কে জানে, শতসহস্র কণ্ঠের গীতবাদ্যের মত সেই তিনঅক্ষরের কথাটি আমার কানের মধ্যে হো হা করে কোলাহল জুড়ে দিলে - ক-র-ব!

দু'মিনিট পরেই শূণ্য হস্তে ঘরে ফিরে এলেন। এবারে—আরো কাছে, তাঁর উষ্ণ নিঃশ্বাসের শব্দ, আর তাঁর দেহের একটা সুমিষ্ট সুগন্ধ আমি অনুভব করতে লাগলাম। সেন আস্তে আস্তে বল্লেন—আপনি ভাববেন-না, আপনি আমার অতিথি, অতিথির সম্মান আমার দ্বারা চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে, আর - যে আশ্রিত তা'কে ত্যাগ করব, এমন ধর্ম্ম—আমার নয়, বাংলার নয়, ভারতবর্ষের নয়!

তাঁর কণ্ঠ ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠছিল। সে স্বরে আর কিছু থাক্ না থাক্ তাঁর হৃদয়ের বীণার ঝঙ্কার জেগেই আমি অন্ধকারে, নীরবে, মুখে কাপড় দিয়ে·········

সেন বলে উঠলেন—যে মুহূর্ত্তে আপনি আশ্রয় চেয়েছিলেন, তন্মুহূর্ত্তেই আপনি যে আমার কী হ'য়েছেন তা আমি মুখে বল্লেও আপনি হয়ত বুঝতে পারবেন না।

কিন্তু আমি সত্য সত্যই বুঝতে পেরেছিলাম। একদিন আগে গোলাপজলের শিশিটা রেলগাড়ীর গদির'পরে রেখে সরে' দাঁড়িয়েছিলেন,

আর আজ, অন্ধকারে একহাতে একটা গ্লাস না-কি, অন্য হাতে আমায় হাতে ধরে বললেন—খেয়ে ফেলুন ত, লক্ষ্মীটি ! খেয়ে ফেলুন !

সেন আবার বল্লেন—একটু কিছু খাবেন না ? একটু দুধ, কি দু' একখানা গরম.........

আমি বল্লাম—অমন করে বল্‌চেন কেন ?.........

তবে থাক্ বেশ করে' ঘুমিয়ে নিন ; কাল ঠিক হ'য়ে যাবে।—বলেও তিনি গেলেন না ; দরজার কাছটিতে দাঁড়িয়ে বল্লেন—কোন্ দেশে অতিথিকে নারায়ণ জেনে লোকে পূজা করত জানেন ? জানেন না ? জান্‌বেন কোথেকে ? সে ত আর ইতিহাসে ভূগোলে জিওমেট্রিতে ছাপা নেই—কাজেই জান্‌বার সুযোগ হয় নি—সে এই দেশে, এইখানে ! নিজের বুকের 'পরে সেই হীরাশুদ্ধ হাত রেখে বল্লেন—আর সে এরাই, —আর কেউ নয় !—বলে চলে' গেলেন।

আততায়ীর আক্রমণে আত্মরক্ষা করতে আমি যেন একটা দৃঢ় দুর্গের অধিপতির আশ্রয়ে এসে পড়েছি—এমনই ভাবে আমি ঘরের আলোটা জেলে দিয়ে নির্ভয়ে নিঃশ্বাস ফেললাম ।

কাল সেনের একটা চাকর না-জানি কি দরকারে কলকাতা যাচ্ছিল, সেন তা'কে অনেক কি উপদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন, সে একখানা একা করে' চলে গেল। আমরা তার খানিক পরেই বেড়াতে বার হ'লাম। ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশনে পৌছেচি কলকাতা-গামী এক্সপ্রেসখানা ভীষণ শব্দ ক'রে প্ল্যাটফরমে ঢুকল। আর সে কি ঠেলাঠেলি, মারা-মারিই না আরম্ভ হ'য়ে গেল ! স্ত্রীপুরুষ বাছবিচার নেই ; যে যা'কে পারচে ধাক্কা ধুক্কি মেরে এগিয়ে যাচ্ছে। সুখের বিষয় তারা বাঙ্গাল

স্ত্রী-পুরুষ নয়! তাদের পুরুষরা কোঁচার খুঁট ঝুলিয়ে কাপড় পরে না; তাদের মেয়েরা কেবলমাত্র সামিজে আবরু ঢেকে, দশহাত কাপড়ে সুসভ্য হ'য়ে পথে বার হয় না! কাপড় পরার ধরণটি বেশ শক্ত, হাত-পা-গুলো আরো মজবুত! আমার মনে হয় এই জন্যই বোধ করি তাদের ঘোমটা আমাদের চেয়ে অল্প দীর্ঘ হয়; তাদের হাত-পা চাল-চলন-ই তাদের আবরু পর্দ্দা বজায় রাখে, ঘেরাটপ ঢাকা তোরঙ্গ বাক্সের সামিল করে' চিরসুখজাবিণী বঙ্গবধূর মত টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হয় না। একটা স্ত্রীলোক এক বুড়োকে এমন ধাক্কা মারলে বুড়োটা তার পিঠের আড়াইমণি বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে হুড়মুড় শব্দে একেবারে আমার ঘাড়ে। সেন ক্ষিপ্রহস্তে আমাকে জড়িয়ে সরিয়ে নিয়ে এলেন, তাই রক্ষে! তবু সেই বোঁচকাটার কোণটা সামান্য একটু লেগেছিল আমার বাহুতে তাইতেই জামাটা ছিঁড়ে, খানিকটা মাংস আর রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল। সেনের হাতটা ঠিক সেই জায়গাতেই ছিল, ভিড়ের তফাতে এসে আমাকে ছেড়ে দিলেন - যখন হাতটা ~~তাঁর চো~~খে পড়ল, সসব্যস্তে বলে উঠলেন, দেখি, দেখি?

বঙ্কিম তফাতে ছিলেন, আমি নিঃশব্দে, কেবল একটিবার ব্যগ্রমুখ-খানায় একটি দৃষ্টিপাত করে' বাহুটা এগিয়ে দিলাম। সেন দুহাতে স্থানটি পরীক্ষা করে' বল্লেন—চলুন, চলুন, 'মারে'র * ঘরে, একটু বরফ টরফ দিয়ে বেঁধে দিই।

এই সময়েই বঙ্কিম এগিয়ে এসেছিলেন, আমি তাঁকে দেখেই বলে উঠলাম—কি-ই-বা হয়েছে যে বরফ দিতে হ'বে—হ্যাঁ!

* আউধ রোহিলখন্দ রেলের খাদ্য সরবরাহকার—মারে এন্দ কোম্পানী।

সেন গম্ভীরভাবে বল্লেন—কিচ্ছু হয়নি ত! তাহ'লেই হ'ল।

বঙ্কিম বেদনায় আর্ত্ত হ'য়ে বল্লেন—হয়নি বৈ-কি! রক্তে যে হাতটি ভেসে যাচ্ছে। দেখি দেখি—বলে কোন অপেক্ষা না করেই আমার হাতটা হাতের মধ্যে বেশ করে' চেপে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন। যেতে যেতে আমার চোখটা যা দেখলে—তা'তে সর্ব্বাঙ্গ-শীতল অবশ হ'য়ে এলো। সেনের এমন বিষণ্ণ ম্লানমুখ আর কখনো দেখিনি যে।

একবার হাতটা ছাড়াবার ইচ্ছেও হ'ল, কিন্তু কাঁচপোকার জোর আর্সুলের চেয়ে ঢের বেশী, একেবারে রিফ্রেসমেন্ট রুমে পুরে ধাঁ ধাঁ করে' বরফ টরফ লাগিয়ে দিলেন। সব শেষ করে বল্লেন—কেমন, একটু কমছে কি না?

উত্তর দিতে পারলাম না। প্ল্যাটফরমে বেরিয়ে এসে দেখি একটা ফার্ষ্টক্লাশ গাড়ীর জানেলায় হাত রেখে সেন একটি বঙ্গ-রমণীর সঙ্গে হাস্যপরিহাস করচেন। বঙ্কিম আর আমি পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলাম, তিনি দেখেও দেখলেন না। আবার ঘুরে, চাইতে চাইতে গেলাম, সেন এবারেও দেখতে পেয়েছিলেন, তবুও ফিরলেন না।

আমি তখন রোগা সন্ন্যাসীকেই জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হ'লাম যে ঐ ডুগাছি ব্যাঙ্গল পরা বাঙ্গালী যুবতী সেনের আত্মীয় কি-না।

বঙ্কিম বল্লেন—নিশ্চয়ই। তা ছাড়া আর কি?

গাড়ী ছেড়ে গেল। সামনেই বইয়ের ষ্টল্, আমি নির্দিষ্টচিত্তে সেই সব দেখতে লেগে গেলাম। সেন বঙ্কিমের সঙ্গে কথা কইতে কইতে ফিরে এলেন—আমি কিন্তু দেখেই বুঝলাম সেন অত্যন্ত অন্যমনস্ক, বঙ্কিমের সঙ্গেও কথা তাঁর জমছে না।

এর মূলে কোথাও হয় ত আমি-অভাগিনীই আছি কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে সেই মন বিমুখ হ'য়েচে তার কাছ থেকে, ভেবে আমি অনেক ক'খানা বই ছবি কিনে বগলে পুরে' বঙ্কিমকেই বল্লাম—রৌদ্র বেড়ে উঠলো যে!

সেন কথা কইলেন না। তবে আমার প্রস্তাবই সমর্থন করলেন। গাড়ীতে উঠে বসে' বল্লেন—বেদনাটা কমেছে?

আমি লজ্জারুণ মুখে চোখ নামিয়ে নিলাম। সেন বল্লেন—এতেও লজ্জা! বলিহারি! আর দেখলেন ত! সেই খোট্টা মেয়েটি—কি ধাক্কাটাই দিলে মিন্সেটাকে! আমাদের মেয়ে হ'লে!—সাতটা লোকে জাহাজের নোঙ্গর তোলার মত তুলতে হ'ত—টেনে টুনে, ঘেমে, নেয়ে! শুধু তাই নয়—ডেস্‌টিনেশনে পৌঁছে স্পর্শদোষ কাটাবার জন্যে স্বস্ত্যয়ন, শান্তি, ব্রাহ্মণ ভোজন, গঙ্গায় অবগাহন এবং ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তিনিও হাস্‌লেন, আমরাও হাসলাম। উদার নীলাকাশে মেঘ স্থায়ী হয় না, তাঁর মনোদুঃখও যে বিদূরিত হ'য়েচে এই সুখে গাড়ীটায় আমি খুব জোরে চেপে বসে রইলাম।

কিন্তু সেইদিন থেকেই সেন-কে কেন যে বিচলিত দেখলাম তা'ও আমি কিছুতে ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। আমার সঙ্গে ত দূরের কথা, বঙ্কিমটি পর্য্যন্ত পাত্তা পাচ্ছিলেন না—তেমন! আমার মনে হ'ল সেই রমণী কে? সেনকে কি সেই এমন করে দিয়ে গেল—কে জানে! ক'দিন ভাবলাম, কিন্তু কারণ আবিষ্কার করতে পারা গেল না।

হঠাৎ একদিন সকালে কতকগুলো ছবিটবি দেখছি, সহাস্যনেত্রে

সেন ঘরে ঢুকে পড়ে, বল্লেন—কেমন আছেন ?

ভালোই ত !

তিনি এদিক ওদিক চাইছেন দেখেই আমি বল্লাম—বসুন না !

ভেবেছিলাম হয়ত তিনি বসবেন না ! কিন্তু তিনি বসে বল্লেন—কি দেখছেন ?

আমি ছবিখানা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম, সেন দেখতে দেখতে বল্লেন—বাঃ চমৎকার ত ! আচ্ছা, আইডিয়াটা কি বলুন দেখি !

বল্লাম--কি জানি !

কে এ মেয়েটি তাও বল্‌তে পারেন না ? – ভারি আশ্চর্য্যের স্বর !

আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বল্লাম -সবই ত আমার জানা নেই।

সেন হাসলেন ; বল্লেন - সব হয়ত কারুরই জানা থাক্‌তে পারে না, কিন্তু এ মেয়েকে না চেনে ভূ-ভারতে এমন লোকও আছে নাকি ? হা হা হা।

আমি তাঁর হাসিতে বাধা দিয়ে, বল্লাম—দেখুন, বিনা বিনয় দান করে—আপনার দেখছি······

আমাকে ইতঃস্তত করতে দেখে সেন বল্লেন—আচ্ছা এ ধারণা আপনার কোত্থেকে জন্মাল বলুন ত যে সত্যকথা বল্লেই আপনি সেটাকে গর্ব্ব ধরে বসবেন। এ ত গর্ব্ব নয়, এ-যে একেবারে সত্য কথা। ভারতবর্ষে এমন মেয়েও আছে যে রাধিকার চেহারা দেখেনি কখনও ?

আপনার বিশ্বাস করা হয়ত খুব শক্ত, কিন্তু তেমন লোকের যে, অসদ্ভাব নেই, তা আমাকে দেখেই বুঝতে পারচেন।

সেন কথা কইলেন না। ছবিটা উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর চুপ্‌ও আমার সহ্য হ'ল না, আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ছবিটা না হয় রাধিকারই হ'লো, কি করছেন উনি?

সেন বল্লেন—এই যে শ্রীরাধা চুলের গোছা দেখছেন, তার মানে উনি যে রঙের দেবতাকে ভাবছেন,—আকাশের গায়েও যে রঙ দেখছেন সে কৃষ্ণেরই গায়ের রঙ—সেই নবঘনশ্যাম মেঘকেই সম্ভাষণ করছেন। ওর একটা গানই আছে, চণ্ডীদাসে ·

"আল্যাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি দেখয়ে আপন চুলি।
সহাসবদনে চাহে মেঘপানে, কি কহে দুহাত তুলি॥"

বাইরে পদশব্দ শুনেই সেন দাঁড়িয়ে উঠলেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বল্লেন—এস।

বঙ্কিম ঘরে ঢুকেই বল্লেন—এই দেখ।·· বলে একখানা টেলিগ্রাফের ফরম সেনের হাতে দিলেন। সেন দু'তিন মিনিট পরে বলে' উঠলেন—তাই ত। তাঁর মুখে চিন্তার ভাবটুকু দেখেই তারখানা আমি তুলে নিলাম।

টেলিগ্রাফ চিরদিন যে খবর দেয়, আজিও তাই—পিতা সাংঘাতিক পীড়িত—ত্বরায় এস—রাখাল।—একবার বঙ্কিমের একবার সেনের মুখের পানে চেয়ে বল্লাম—রাখাল কে?

সেন বল্লেন—এঁর ছোট ভাই! তাইত কি করা যায়? গাড়ী কখন? বস টাইম টেবলটা আনি।

বঙ্কিম মুখখানি বিষণ্ণ করে' বসে রইলেন। এ সংবাদ যে তাঁর গুরুতর ভাবেই লেগেছিল, তার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা সান্ত্বনার কথাও সে সময়ে আমার মুখে এল না।

সেন ফিরে এসে বল্লেন—সেই চারটেয় পাঞ্জাব মেল।

এখান থেকে করেসপণ্ডিং ট্রেণ আছে ত?

নিশ্চয় আছে।

আমি বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করলাম—চারটেয় যে গাড়ী, কলকাতায় পৌছোবে কখন?

সেন তার উত্তর দিলেন, বল্লেন—ভোর ৬টায়।

পুনরায় বঙ্কিমকেই বল্লাম—গিয়েই একটা খবর দেবেন।

সেন বল্লেন—আপনি থাকবেন এখানে ত!

সে কথার উত্তর না দিয়েই আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি?

আমাকেও যেতে হ'বে বৈ কি—বলে বারেকমাত্র বঙ্কিমের মুখের পানে চেয়েই আবার টাইম—টেবলে মনঃসংযোগ দিলেন।

আমি ত ভেবে ঠিক করতে পারলাম না কেন তাঁকেও যেতে হ'বে—তবে আগের থেকেই কল্পনা আমার জেগেছিল, কারণটা অনুমান করতে দেরী হ'ল না। তবু বল্লাম—দরকার আছে না কি?

সেন টাইম টেবল মুড়ে বল্লেন—দরকার! দরকার এমন কিছুই নেই—তবে কি না উনি একা যাবেন……

আমার মধ্যে কোন্ একটা অদৃশ্য মহাশক্তি বলে উঠ্‌লেন—আগলে যাবেন?

সেন হেসে তার উত্তর দিলেন—ছেলে মানুষ!

বঙ্কিম বল্লেন—আমি একটা টেলিগ্রাফ করে দিয়ে আসি।

সেন বল্লেন—রোদ উঠে পড়েছে বেজায়—নিজে না-ই বা গেলে। একটা চাকর দাও না পাঠিয়ে!

আমার আরো রাগ হ'ল। এ বাড়ীটা থেকে পোষ্টাফিস দেখা যায়, দেড় মিনিটের পথও নয়—সেখানে যেতেও রৌদ্রের ভয় দেখে একটু রাগ হ'বারই কথা। বল্লাম – ঐ-ত আফিস?

হ্যাঁ—বলে বঙ্কিম বেরিয়ে গেলেন। সেন-ও উঠতে চাইলেন, আমি বল্লাম—ওঁর বাড়ী কি আপনার বাড়ীর কাছেই?

খুব কাছে, পাশাপাশি বল্লেই হয়।

কি করেন উনি?

আমি যা করি—উনিও তাই। কলেজে পড়ি।

আমি সাশ্চর্য্যে বল্লাম—পড়েন?

হ্যাঁ।

আর একটা প্রশ্ন কণ্ঠে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু বেরুল না। সেন আবার উঠতে চাইলেন, আমি কম্পিতকণ্ঠে বল্লাম—আপনি থাকুন।

সেন একমিনিট আমার মুখে চেয়ে থেকে বল্লেন—সে হয়-না!

কেন হ'বে না?

আপনি বুঝতে পারবেন-না। আমাকেও যেতে হ'বে।

যাবেন—তাই বলুন। যেতে হ'বে কেন বলছেন?

যাই বলি—মানে দাঁড়ায় একই।

তা দাঁড়ায় না। কখনই দাঁড়ায় না। এর থেকেই বোঝা যায় যে আপনি…

সে কথাটা না-কি কোনমতেই ঠোঁটের বার করা চলে না, আমি স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম।

সেন হেসে বল্লেন—এর নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করতে আমি চাইনে। নাঃ।—তিনি চলে গেলেন।

আমার মনে হ'তে লাগল তাঁর সেই হাসিটা যেন বিদ্রূপের শেলসম আমার বুকে বাজল। এ কি দুরপণেয় লজ্জার কালিমা আমার মুখে ছড়িয়ে দিয়ে সদর্পে চলে গেলেন।

অনেক রকমই ভাবতে চেষ্টা করলাম কিন্তু সেই ব্যঙ্গের হাসিটাকে কোনমতেই সহজ করে নেওয়া গেল না। সে ত কেবলমাত্র অবহেলা নয়, তার সঙ্গে যে নিদারুণ ঘৃণা মিশেছিল, নারীচিত্তে সে আঘাত ত বড় অল্প নয়।

ভাবতে আমার মাথা কাটা যায় যে নারীর শ্রেষ্ঠ আভরণ লজ্জা যেন আমাকে ত্যাগ করেই গেছল, নইলে কেমন করে' আমি তাঁর সুপ্রিয় ইচ্ছার প্রতিরোধ করতে দাঁড়িয়েছিলাম—সে শক্তির প্রতিরোধ ত হ'লই না—নিজের মনের গ্লানি রাখবার স্থান খুঁজতে আমি মুখ ঢেকে কেঁদে ফেল্লাম!

মনে আছে আমার—কেঁদে ও আমি সান্ত্বনা পাই নি। পাপ জীবন চিত্র যেদিন থেকে এই চোখের সামনে খুলে গেছল—অশ্রুর উৎস শুকিয়ে চাপ হ'য়ে গেছে—চোখের জলই যদি না ঝরল গুমোট কাটবে কেমন করে?

আবার যখন দেখা হ'ল সেনের সঙ্গে—তাঁর ভাব দেখে আরও আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম যে এ কি—রকমের মানুষ! আমার ত জানা ছিল, আঘাতক আর আঘাতিত দু'জনেরই ব্যথা প্রায় সমান সমান—যে দুর্ব্বহ আঘাতের বেদনায় আমার নারী সম্বল চোখের জলও উঁকে

গেছল, সেনের কি তাতে বিন্দুমাত্র কষ্টও হয় নি? আশ্চর্য! এও কি মানুষ পারে?

দেখা হ'তেই সেন বল্লেন—দেখুন, আপনি কিছু ভাববেন না। চাকর বাকর সব রইল, টাকা কড়িও রইল—আপনি বেশ থাকতে পারবেন। গাড়ীও থাকছে বেড়াবেন, চেড়াবেন। বুঝলেন?

বঙ্কিম বল্লেন—আবার আমরা আস্‌ছি—বুঝলেন?

সেন বল্লেন—খুব ঠাকুর দেবতা দেখুন, পূজো দিন, সুফল করুন—ভাবি পুণ্যি হ'বে ..বলে তিনি হাস্‌তে লাগলেন।

পাঠিকা আমার! হাসি কী সহ্য হয়?

কঠিন স্বরে বল্লাম—পুণ্যি করার অত তাড়া নেই আমার!

সেনের হাসি থামল না।—নেই নাকি! আমার জ্ঞান ছিল, সেইটেতেই আপনার সব চেয়ে আগ্রহ বেশী! কাল সারাপথটা ত নুড়ি দেখেছেন, আর কপাল ঠুকেছেন, তার পর সারনাথের মন্দিরে সেদিন……

ঠাকুর দেবতা নিয়েও ঠাট্টা!

বেশ! ঠাকুর দেবতাকে ঠাট্টা হ'ল কি-করে? আমি ত আপনাকেই বলছি।

বঙ্কিম বল্লেন—না, না—ঠাকুর দেখতে হ'বে না আপনাকে। কাশীতে থিয়েটারের ত দুঃখু নেই—তাই দেখবেন।

তাই দেখব—বলে আমি বেরিয়ে গেলাম।

একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকে উবুড় হ'য়ে পড়ে ভাবতে লাগলাম—

এ আমার হ'চ্ছে কী! কিসের আশায় কার ভরসায়, কার মুখের পানে চেয়ে পড়ে আছি আমি! মুষ্টিভিক্ষাপ্রার্থী ভিখারীর মতই ত

অবস্থা আমার! এ দর্প করা কি আমার শোভা পায়? কিন্তু নিজের চোখে কতদিন দেখেছি—বিমুখ ভিখারী কটুকাটব্য বলতে বলতে চলে যায়! তার সামনে হয়ত আরও পাঁচটা দরজা খোলা আছে, কিন্তু আমার! আমার যে কোনদিকে কোন আশ্রয়ই নেই! এ আশ্রয় যে আমার সর্ব্ব সুখের আগার হ'য়ে উঠেছে, তাও ত আমি জানি—এর-ছাড়া কোথায় যে মাথা রাখবার স্থানও এতটুকু আমার নেই, তবু যে কেন এ বিদ্রোহ করা—তা ত আমি বুঝি নে! সে-যে কি চায়, কোন্ প্রার্থনা নিষ্ফল হ'য়েচে বলেই তার এত মর্ম্মদাহ,—সে ত আমার কাছেও ধরা দিতে চায় না।

দু'টোর সময় তাঁরা বেরুবেন, আমি জানতাম, তবে আশা ছিল, সেন আমার সঙ্গে দেখা করবেনই। অতিথির সম্মান যে তাঁর দ্বারা এতটুকু ক্ষুন্ন হ'তে পারে না এ ত আমি অক্ষরে অক্ষরে দেখে এসেছি! যার সঙ্গে জীবনে কোনদিন তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না, তার জন্যেই তাঁর ভাবনার অন্ত থাকৃত না। এ ত আমি দেখেচি, নিজে আমার আহারের তত্ত্বাবধান না করে কোনদিন শুতে যান নি, বাবুর দেখা-দেখি চাকর বাকর পর্য্যন্ত গৃহিনীর সম্মান দিতে কার্পণ্য করত না—কাজেই সেনের উপর বিশ্বাস ত আমি এতটুকু হারাই নি। নিজের ঘরের ভেতরে থেকেও বারবার আমি আশা করতে লাগলাম, যাবার আগে দেখা না করে' তিনি যবেন না। কিন্তু চাকর জিনিষপত্র গাড়ীতে তুললে, সিঁড়িতে জুতার শব্দও শুনা গেল, কিন্তু সে পরিচিত পদশব্দ কই, যা আমি ধরণীর মত হাস্ত-কোমল মুখে বুক পেতে নিতে শুয়ে আছি! এক একটি তরঙ্গ হৃদয়কূলে ঘা দিয়ে মাঝখানে অসীমে কোথায় মিলিয়ে গেল।

তখন আর আমি পারলাম না। ছুটে নেমে গিয়ে দেখি, গাড়ী তখনও দাঁড়িয়ে। সাহেবী পোষাক পরে' সেন সরকার মশাইকে কি-সব বল্‌ছেন। আমার দ্রুতপদ শব্দ তাঁর কানে গেছল, ফিরে দাঁড়িয়ে একবার দেখ্‌লেন মাত্র।

বঙ্কিম হাতঘড়ি দেখে বল্লেন—দু'টো দশ হল যে হে !

সেন গাড়ীর হাতল ধরেছিলেন, আমি ডাকলাম—একবার শুনে যান।

পিছু ডাকলেন—হেসে আমার কাছে এসে বল্লেন—কি বল্‌ছেন ?

আমাকেও নিয়ে চলুন—বলেই কাতর মুখখানা থামের আড়ালে লুকিয়ে ফেল্লাম।

সেন বল্লেন—কেন ? থাকুন-না। আর আমরা ত আসঁচি আবার।

আসবেন ?

নিশ্চয়।—কিচ্ছু ভাববেন না। আমি সব বন্দোবস্ত করে গেছি। একা ঘরে গিন্নী হ'য়ে থাকবেন।·· মন্দ কি ?

আমি নতমুখে বল্লাম—কবে আস্‌বেন ?

তা ঠিক কি করে বলি বলুন! তবে আস্‌তেই হ'বে—আর যত শীঘ্র পারি—আসব।

বঙ্কিম বলে উঠ্‌লেন—কোথায় গেলে-হে !

যাই—বলে সেন আমার মুখের পানে চাইলেন। একমুহূর্ত্তের জন্য সে-দৃষ্টি যেন সজল মেঘের মতই আমার বোধ হ'য়েছিল, হয়ত সে আমার চোখের ভুল, কিন্তু এ'টা কল্পনা করতেও তখন একটা সুখের

আবেশ ছিল, আর তারই জোরে আমি হাতদু'টি কপালে ঠেকিয়ে বল্লাম —নমস্কার নেবেন ?

সেন টুপিটা তুলে বল্লেন—নেব না ? কেন নেব না ? না নেবার ত কোন কারণ নেই।—নমস্কার, আসি।

নমস্কার !

ব্যস্—আর কিছু দিতে পারবেন না-ত ? চল্লুম।—তিনি চলে যেতেই গা গুলিয়ে উঠ্‌ল ! আমার সমস্ত বল যেন যাদুমন্ত্রে অপহরণ করে সেন চলে গেলেন।

বঙ্কিম চেঁচিয়ে বল্লেন—বিদায় মিস্ রায় !

কিশোর বয়সে স্কুলে আমি ঐ নামেই পরিচিত ছিলাম ! আজ সেই প্রিয়নাম এই লোকটার মুখে শুনে সেটার উপরেও যেন অশ্রদ্ধা জন্মে গেল। তার গলার স্বরটাই কোনদিন আমার ভালো লাগত না, তা'তে কেমন যেন একটা খোঁচা উঠেই থাকৃত। যারা কখনো শোনে নি, হয়ত তারা বুঝবে না যে সে জিনিষটা ঠিক কি রকমের ছিল, তবে এ আমি শপথ করে বলতে পারি—এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটি লোক ছাড়া সে সুস্বর শোনবার জন্যে কেউ উৎকর্ণ থাকৃত না। হাঁ, একজনের কানে কোন্ রাগিনী আলাপন করত, তা আমার জানা নেই, তবে এ নিশ্চয়ই যে সেনের মন বীনাটা বেজে উঠত,—স্বরটা যেন ছিল একটা আঙুল, তারের উপর পড়ে ঝঙ্কার তুল্‌ত !

কলকাতার রাস্তায় একটা গান এক বৈরাগীর কাছে প্রায়ই শুনতাম,—

"(আমার) রাধা বিপিনে, বসে বাঁশী শোনে—
শোনে, (আঁর) কাঁদে কেন কে-ই বা জানে ?"

—সে বৈরাগীর গানের সম্বল বোধ করি আর ছিল না, রোজই বেলা সাতটা আটটার সময়ে আমাদের বোর্ডিংয়ের সামনে সেই সাদা বাড়ীর দ্বারে দাঁড়িয়ে গাইত—

"ডাকে ধেনু বাজে বেণু ডাকিছে ময়ূরী,
শুনিছে না কিছু রাই, শোনে সেই স্বরই।"

তখন ঠিক বুঝি নি যে, কোন্ নদীর কোন্ কিনারে সে কে রাধা বিনোদিনী সব ভুলে, সব ফেলে, সে বাঁশার ধ্বনি শুনত! এ-যে কল্পনা কুশল কোনো কবির অমৃত কল্পনারই ফল—এই আমি জানতাম! কিন্তু একদিন গভীর সমবেদনায় স্বীকার করতে হ'য়েচে হিন্দু কবির কেবলই কল্পনা নয়! তার ভেতরকার একটা অদৃশ্য সত্যের আলোক এমন রেখাপাত করে ছিল—যে সত্যাশ্রয় করেই এতকালের সেই মধুর স্মৃতি এমন চির মধুর হ'য়ে জেগে আছে। আমার বয়সে যে বিদ্যা অর্জ্জন আমি করেছি, সারাজীবন জীবনটাকে এমন তাতিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি, কোথায় ভেসে গেল সে সব! তারা ত আমাকে এমন কথা একটিবারও শোনায় নি যে…

"কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥"

এ বুঝি আমার সর্ব্ব বিদ্যার কল্পনারও অতীত!

অনেকে বলবেন—সে সত্য মিথ্যা তখনকার নির্ভর করেছিল আমার মনটির পরেই। হয়ত তা বাস্তবিক সত্যি! আমিও যে প্রাণে

প্রাণে গভীর বেদনার সঙ্গে—শুনি নি নি ক কিছু আর, শুনি সেই স্বরই!

বিদায় কালে যদি স্থানটা নির্জ্জন হ'ত, আর একটি অমুপল সেন দাঁড়াতেন আমার সামনে, আমি অকাতরে আমার এ বুকখানাই তাঁর সামনে পেতে দিয়ে বল্‌তাম—তোমাকে দিতে পারি না কি বল? যা দেবার তা কি আর না দিয়েছি? যা দেবার নয়, যা আমার নেই—তুমি চাইলে তা দেওয়াও যে আমার ক্ষমতাতীত নয়—এ প্রত্যক্ষ সত্যও তাঁকে শুনিয়ে দিতে পারতাম!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

'যার কেহ নাই, তুমি আছ তার!'

আমার মনে হয় আমি যখন ভাবতে বসে যেতাম, সুখের কথা ভাবছি ত একেবারে তুর্কীর সুলতান হ'তে চলেছি; আর দুঃখে! সে একেবারে, বলতেই পারিনে! সত্যি বলচি, যখন কূল ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছিল, তখনই হাত পা গুটিয়ে বসে গেছলাম আমি! প্রতিরোধ করে ফল ত নেই-ই—কেবল খানিক কষ্টভোগ—সে ত জানাই আছে—তখন 'রোধ করবার বৃথা চেষ্টা কেন করব! খানিকটা না-হয় দুলব!

মন-যে আমার বিষন্ন ক্ষিন্ন হ'য়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি একটু পরেই উঠে পড়েছিলাম! সরকার মশাইকে বলতেই গাড়ী এসে

গেল। আমি প্রস্তুত হ'য়ে নিয়ে বেরুচ্চি—সরকার মশাই বল্লেন—আমি যাব কি? এহঁ্যা এহঁ্যা ....

বরাবর তাঁর কাসি থাকৃত না, ক'দিন দেখছি আমার সম্মুখীন হ'তেই কোথা থেকে কাস রোগের ভূত তাঁকে পেয়ে বসত! হাসি পায়! বয়স কম করেও ষাট, পয়ষট্টি হ'বে; মাথার একগাচি চুলও ~~কালো~~ নেই, এ পোড়াজাতের সামনে তারও কাসি আসে! স্কুলের গাড়ীতে চড়ে কখনো কোথায় গেছি, কোথাও যদি গাড়ী থেমেচে, অমনি পথচারী কলেজের বাবুরা কাস্‌তে, হাঁচতে, থুথু্‌ ফেলতে লেগে গেছেন!

আমি অন্যদিকে মুখ করে ছিলাম, সরকার মশাই ভাবলেন, আমি শুনতে পাই নি, দুবার কেসে বল্লেন—আমি বলছি কি, বাবুর আদেশ ছিল ... ...এ-হ্যাঁ, এ-হ্যাঁ, ও-হ্যঁ, খ-খ—

ভালুক নাচাতে দেখেচ ত? একবার নিজের হাতে ডুগডুগিয়া বাজিয়ে দেখবার সখ আমার ছিল।

বল্লাম—যাবেন? চলুন-না।

একটু পরেই কাসি আরম্ভ। একটি কথা বলেন, আর কাঁসি! আমার মনে হল, হয়ত এ সত্যই কেসো রোগী। একটু অনুতাপ হল। বল্লাম—সরকার মশাই আপনি কবিরাজ দেখান। আহা! বড় শক্ত ব্যামো। সরকার মশাই অবাক্! হাঁ করে চেয়ে বল্লেন—কবিরাজ কী! আমি বল্লাম, আপনার বড় কাসি হ'য়েছে—ঐ থেকেই আবার যক্ষ্মা হয় জানেন ত?

সরকার মশাই গরম হয়ে চেয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে লাগলেন। এন্‌জেন চলবার আগে যেমন ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস

করে ধোঁয়া ছাড়ে, অথচ তখনি চল্‌চে না—সেইরকম করে' বসে রইলেন।

চক্ পার হোয়ে গাড়ী ছুটছিল, একটা রেলিঙঘেরা মস্ত বাগানের ধার দিয়ে! আমি নামতে চাই কি না সরকার মশাই কাসতে কাসতে সে খবরটিও নিতে ভোলেন নি!

সন্ধ্যার পর ফিরে এসে আমি ঘরটায় ঢুকে শ্রান্ত অবসন্ন দেহটাকে বিছানায় বিছিয়ে দিলাম। দশমিনিট বেড়িয়েই আমার অবসাদ এসেছিল। সে অবসাদ কেবল পথশ্রমজনিতই নয়, এর চেয়ে অনেক পথ আমি পায়ে হেঁটে বেড়াতে পারি, বেড়িয়েচি,— সেবার বোটানিকেল গার্ডেনসে তিনটে চক্র দিয়েছিলাম, আমি আর শান্তি দুজনে!

বাংলা দেশে এ আমি ঢের দেখেচি, যে গাড়ীর খড়খড়ি, জানালার ফাঁক, আলসের ঘুলঘুলি—এ জাতের কোথাও স্থান নেই। লোকের চোখ যেন তাকে ঘিরে ফেলে। এ খোট্টার দেশে, যেখানে দিনরাত মেয়ে পুরুষে হল্লা করে' বেড়াচ্ছে, গঙ্গাস্নান করে গান গাইতে গাইতে চলেচে, হোলিতে রঙ খেলে গাল্ দিয়ে বেড়াচ্ছে, সেখানেও যে বাঙ্গালী মেয়েকে সান্ধ্যভ্রমণ করতে দেখে লোকে চোখের বাণে এমন ক্ষতক্ষিত করে দেবে —সে আমি জান্‌তাম না। যখন দেখা গেল, অভাগ্যের ভাগ্য তার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরচে, স্থান পরিবর্ত্তনেও কোন পার্থক্য নেই, আর সেখানে বেড়ানো সম্ভব হল না।

আমি বুঝতে পারি নে, এ জাতের আশাই বা কি, আকাঙ্খাই বা কিসের! আমি ঢের যুবা দেখেচি, যারা আমাদের বোর্ডিংয়ের জানেলার পানে চেয়ে চল্‌তে পথে হোঁচট পর্য্যন্ত খেয়েচে, গাড়ী চাপা পড়তে পড়তে

বেঁচে গেচে—তবু সেই জানেলা ছাড়া কিছুতেঃ তাদের মন উঠ্‌ত না। একদিন দর্জ্জিপাড়ার ভেতর দিয়ে কবিতাদের বাড়ী যাচ্চি 'বাসে' চড়ে' —স্পষ্ট শুন্‌তে পেলাম, একদল যুবক গলা ছেড়ে গাইছে—

ও গাড়ীর তলে মোরা পড়িয়া মরিতে চাই!

সে না-কি বাংলা দেশের বাঙালীর ছেলে। এখানে টুপি পরা হিন্দুস্থানী অবধি হাঁ করে খেতে আসছিল।

একদিন মনে হ'ত নারীজীবনের বুঝি ঐ পুরুষের সামনে ধরা ছাড়া বড় সার্থকতা নেই, সন্ধ্যাগমে কামিনী ফুলের মতই পাপড়িগুলি ফুটিয়ে তোলাই তার পরম চরমোৎকর্ষতা, কিন্তু আজ এই শত শত দৃষ্টির সামনে হ'তেই আমার সে ভুল বিশ্বাস ভেঙ্গে গিয়েছিল। পাপড়ি আর খুলল'না, দমকা বাতাসে যেন ঝরে পড়তে লাগল।

লোকের কুৎসিৎ দৃষ্টির হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই আমি ঘরে ফিরে এলাম, কিন্তু এখানেও নির্জ্জনতা যেন আমার কণ্ঠরোধ করতে এল। চাকর আলো দিয়ে গেল,—রাত্রে কি খাব জিজ্ঞাসা করলে, এই ঘরেই শোব কিনা জান্‌তে চাইলে—কোন উত্তর না পেয়ে ফিরে গেল।

ইচ্ছা করেই যে আমি জবাব দিই নি, তা নয়, চেষ্টা করেও দিতে পারি নি, বোধ হয় এই বল্লেই যথেষ্ট হ'বে।

সরকার মশাই অনুযোগ করতে এলেন—বাবু সব ভার তাঁরই উপর দিয়ে গেচেন, আমি তাঁর মর্য্যাদা রাখ্‌চি নে ইত্যাদি।

আমি তাঁকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—বাবু তাঁকে কী কী ভার দিয়ে যেতে পেরেছেন?......

সরকার ম'শাই একখানা ক্যাটালগ মুখস্থ বলে গেলেন। তার

মোদ্দা কথাটি আমি বুঝেছিলাম এই যে—গৃহকর্ত্রীর অনুরূপ যন্ত্রের আদেশই তিনি দিয়ে গেচেন। সে ত আমি নিজেই জানি! কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হ'বার মত স্বল্পস্থান ব্যেপে ত আমার মন ছিল না। আমার মন যে সাগরের চেয়েও বড়, তার চেয়েও উত্তাল! আজও আমার মনে আছে সে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারলে—সেনকেও আমি ছাড়তাম না।

বল্লাম এমন কিছু বলে গেচেন কি—যদি আমি চলে যেতে চাই, তার ব্যবস্থা করে দেবেন আপনি?

সরকার মশায়ের আবার কাসি এল থক্ থক্ থক্। কাসি থাম্‌লে, খানিকটা দম্ নিয়ে ম্লানমুখে বল্লেন—হ্যাঁ তাও করে দেব, তবে দোষটা কিন্তু আমার ঘাড়েই পড়বে!

কিসের দোষ পড়বে আপনার ঘাড়ে?

আপনি চলে যাবেন—এ ত বাবুর আদেশ নেই।

তাঁর বাবুর আদেশের খুব বেশী মূল্য যে আমার কাছে নেই ইচ্ছে হলেও সে কথাটা বলা সহজ ছিল না। কয়েকমিনিট নিঃশব্দে বসে থেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার বাবুর কে কে আছে, সরকার মশাই?

সবাই আছে। এই বাপ, মা, বোন্।

স্ত্রী?

না। বলে' সরকার মশাই কাস্‌তে সুরু করে দিলেন। এতে আমার অভ্যাস হ'য়ে গেছল, তাঁর কাসি থাম্‌লে পর, বল্লাম—দেখুন এখানে থাকা আমার সুবিধে হ'বে না।

তবে কি কলকাতা যাবেন?

কলকাতায় যে আমার স্থান নেই তাও বলা হ'ল না। আমি চুপ করে আছি দেখে সরকার মশাই বল্লেন—কিন্তু বাবুর… ‥(আবার কাসি)

আমি বল্লাম—দেখুন, কাল পরশু দু'দিন অপেক্ষা করব আমি, তার পর যা-হয় একটা করা যাবে।

সরকার মশাই কি যেন বলবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কাসির চোটে সে আর বলতে পারলেন না। এমন করে বৃদ্ধকে সামনে বসিয়েও রাখা চলে না, আমি বল্লাম—কবরেজ দেখালেন না ত!—আজও বৃদ্ধ এ কথায় বিরক্ত হ'য়ে উঠলেন;

এইবার কাসির জোরটা একটু বেড়েই গেল। সরকার মশাই কাস্‌তে কাস্‌তে কোমরটা টিপে ধরে যে কথা কটি বল্লেন, তা যেমন অমূল্য, তেমনি উপাদেয়। তাঁর তত্ত্বাবধানে আমি সুখী নই, যদিও তাঁর প্রাণান্ত চেষ্টার এতটুকু ত্রুটী নেই—ইত্যাদি...ইত্যাদি!

আমি হাসি চেপে বল্লাম, আমি বেশ আছি সরকার মশাই। আপনি এত আদর যত্ন করেন, আমার কোন কষ্টই নেই। তবে আপনার কাসিটার জন্যে বড়ই দুঃখ হয় আমার।

সরকারের মুখ যেন একেবারে চন্দ্রকিরণে এঁদো পুকুরটার মত হেসে উঠলো। দেখে 'ভালুক নাচাবার' সখও আমার রইল না। বল্লাম যান্—আপনি কবরেজ দেখান।

রাস্তা দিয়ে হিন্দীসংস্কৃত স্তোত্র গাইতে গাইতে একদল লোক যাচ্ছিল, শুন্‌লাম তারা বিশ্বনাথের আরতির দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। যে আমাকে এ সংবাদ দিলে সে একটি হিন্দুস্থানী বধু, বয়স বড় জোর পণেরো ষোল, এ বাড়ীতে তারা স্বামীস্ত্রীতে চাকরী

করে। সে মন্দিরে আরতি দেখতে যাচ্ছিল, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—সে আমাকে দেবমন্দিরে নিয়ে যেতে পারে কি না।

সে পারে - স্বীকার করলে, তবে আজ দেরী হ'য়ে গেছে, ভিড়ে আমার কষ্ট হ'বে সে কথাও বল্লে! ভিড় আমি কোন দিনই পসন্দ করতাম না, ভিড়ে যেন প্রাণটা হাফিয়ে উঠত! জনসঙ্ঘের ভীতি দেবদর্শনের লোভ আমাকে ত্যাগ করাতে পারলে না। আমি পূর্ব্বেই বলেচি, দেবতাভক্তি কোনদিনই আমার প্রবল ছিল না; তবে অভক্তিও ছিল না। জীবনাবধি কখনও যা চোখে দেখিনি, কানে শুনিনি, এমন জিনিষেও ভক্তি আস্‌তে পারে যদি তার স্বরূপটা কেউ আমাকে ছাপার কেতাবের দিয়ে পড়িয়ে দিত! তা ত কেউ দেয় নি - এদানী যা দু'চারখানা বাংলা ভালো উপন্যাস পড়েছিলাম, তার থেকে আমার একটা কথা শিক্ষা হ'য়েছিল, জীবন-দেবতা! এই জীবন দেবতা কি, সত্য কি কল্পনা, কেমন তার রূপ, বর্ণ, গন্ধ, কোথায় তাঁর প্রকাশ—কোন সন্ধানই আমি পাই নি। এই জীবন দেবতাকে অনুভব করতে আমার হৃদয় মন হয়ত খুব দৃঢ় ছিল না, নইলে একটা মহিমাময় রূপ গড়তে আমার সর্ব্ব কল্পনা ব্যর্থ হ'বে কেন? কোন্ বিধাতা বাংলার মেয়ে সৃষ্টি করেছিলেন, কেমন ক'রে তাদের মনে একটা সলতে শিশু-কাল থেকেই জ্বালিয়ে রেখেছেন তার আলো একদিন না একদিন কোনো দেবদুয়ারের আলোর তেজে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে! আমার ভিতরেও একটা এমনি আলোক যেন জ্বলছিল, হঠাৎ পথচারী লোকের সমাগমে তার জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হ'য়ে পড়ল —আমি সেই যুবতী বধূটিকে সঙ্গে করে' বেরিয়ে পড়লাম—বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখতে!

সরকার মহাশয়ের নিষেধবাক্য স্মরণ করে হাসি এল। তিনি যে একেলা (তিনি ছাড়া) আমাকে কোথাও যেতে দিতে পারবেন না—তাঁর মনিবের এ কঠিন আদেশ আমি আগেই বারবার শুনেছি কি না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কোথায় নামিয়াছি ?

বধুটি ঠিক কথাই বলেছিল, এত ভিড় এইটুকু জায়গার মধ্যে জমাট হ'য়েছিল যে বিশ্বেশ্বরের চৌকাঠ পার হ'য়েই আমার চক্ষুঃস্থির হ'য়ে গেল। মস্ত মস্ত বিশাল দেহ আর কালো কালো বোঁটাওয়ালা তরমুজের মত মাথা ছাড়া আর আমার চোখে কিছুই পড়ল না। হিন্দুস্থানী বধুটি খুব সাহসী,—লম্বা চওড়া পুরুষগুলি দু'হাতে ঠেলেঠুলে জলে সাঁতার কাটার মত ভিড় কাটিয়ে চলতে লাগল. মাঝে মাঝে পেছনে আমি আসছি কি না তাও দেখছে। এই জনতার মধ্যে সুন্দরী বধুটি যে একটু আধটু নির্য্যাতন না পাচ্ছিল তা নয়, বাঙ্গালীর মেয়ে হ'লে হয়ত মূর্চ্ছাই যেত সে, কিন্তু দীপ্তচক্ষে আগুণ ছুটিয়ে মুখের রাস্‌ও ছেড়ে দিয়ে, হাত পা এগিয়ে দিলে। আমি তা'কে জড়িয়ে ধ'রে বল্লাম—কাজ নেই বৌ, ফিরে চ।

বধু চোখে চেয়েই আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে ফেরা এখন একদম অসম্ভব। বরং পেছনের ঠেলাঠেলিতে আপনা হ'তেই কতকটা এগিয়ে যাওয়া যাচ্ছে, ফিরতে গেলে পিষে যেতে হ'বে। কিন্তু এমন করে' কি

যাওয়া যায় ? চারিদিকে লোকের চোখ মুখ হাত পা যেন উদ্যত হয়ে আছে —কোনটাতেই সংযমের লেশ নাই, একেবারে সাপের মত ফণা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। আর সে অজগর বিষজিভের মত হাত বাড়িয়ে ধরতে উদ্যত।

তাকে আর একটু জোরে টেনে বল্লাম—এ কি যাওয়া যায় ?

সে পরিষ্কার বাংলাতেই বললে—তবে কি হবে ?

আমি গলা ছেড়েই বল্লাম—তুমি দাঁড়াও, ফিরব।

আর্ত্তের মত চারিদিকে চাইতে চাইতে সবিস্ময়ে যা দেখলাম—চোখের সামনে গাছের মাথায় বাজ পড়লেও আমি অনন হ'য়ে যেতাম না। চোখে আমার একজোড়া পাঁশনে চশমা থাকৃত— হয়ত তা থেকে অনেকে ভাবতে পারেন যে দৃষ্টির দোষ অসম্ভব নয় কিন্তু সত্যি বল্‌ছি—কোন দোষই আমার চোখের ছিল না। অনেকদিন আগে একজনকে আমি ভালোবাসতাম—তখন রমলা 'চলে' গেছে! হয়ত সে কাব্যের ভালোবাসা—আমরা কিন্তু দুজনাই ভালোবেসে ফেলেছিলাম। যখন তার চোখ খারাপ হল, তার সঙ্গে আমার চশমা নেওয়াও আবশ্যক হ'য়ে পড়ল। হঠাৎ আমার চোখে চশমা দেখে শান্তি ভট্টাচার্য্যিও খুসী হ'য়েছিল। আমি কেবল তা'কেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেম যে, sympathetic চশমা, তারই সঙ্গে sympathyতে।

অনেকক্ষণ অবধি আর মুখ তুল্‌তে পারলাম না। কিন্তু তখনও নাকি ঠিক দেখা হয় নি, আবার চাইতে হল—মন্দিরের একটা কোণে কি যে বীভৎস কাণ্ড হ'চ্চে সে আর কি বলব। আমার মুখ চোখ দিয়ে আগুন ছুটতে লাগল! এই দেবমন্দির! এরই জন্ম দেশদেশান্তর থেকে লোক ছুটে আসে!

আমার স্মরণ আছে, মোগল সম্রাট আকবর সাহের খুসরুজ মেলায় রাজপুত রমণীদের যে অবস্থা হ'ত—আধুনিক দেবসভায় যা নিজের চোখে দেখলাম, হুবহু ঠিক।

দু'হাত দিয়ে জনতা ঠেলে আমি ফাঁকে এসে দাঁড়ালাম। আমি যে স্বেচ্ছায় আসি নি—এই মুহূর্ত্তে আমার মনের অবস্থা থেকে তা বোঝা শক্ত হ'ল না। খোট্টা বৌ ভিড়ের মধ্যেই আটকে পড়েছে—যদিও আমার চেয়ে এমন ভিড় তার অনভ্যস্ত নয়—সেত যাবার সময়ই দেখেছি।

এক মিনিট পরেই আমার কাছেও লোক জম্‌তে লাগল। আর এমনি অবস্থা যে এক পা কোনদিকে বাড়াবার যো নেই। বাইরে অপরিচিত বারাণসীর গলি ঘুঁজি, এই-ই লোকজন, আর ভেতরে সামনে এই বীভৎসতা!

অনেক প্রশ্ন বর্ষণ হ'তে লাগল। সে-সব আমি স্মরণ কত্তে পারি নে, তবে একটা কথা ভুলিনি এ জীবনে, যা ভুলব বলেও কস্মিনকালে আশা নেই—সেটি হচ্ছে এই যে—আমার জন্য যে স্থান তিনি নির্ব্বাচন করেছেন তা যেমন সুন্দর, তেমন সুখকর!

এতক্ষণ আমি চোখ তুলতে পারি নি, এ-কথায় ঠাসা বন্দুকের আওয়াজ হ'য়ে গেল। আপনি ভদ্রলোক! বন্দুকের গুলি কোথায় গিয়ে পড়েছিল জানি নে—কিন্তু বন্দুক একেবারে অবসন্নের মত পড়ে গেল।

জীবন আমার কাছে অবহ ছিল না। দুঃখভারে, মর্ম্মপীড়ায় কিছুতেই আমার জীবনের প্রতি মমতাশূন্য হ'তে পারি নি। মাতৃ-অঙ্কে শিশুটীর

মত তার উপর যত অত্যাচার অবিচার নির্ব্বিরোধে চ'লে গেছে—সব আমি বুকে পেতে নিয়েচি। একটার পর একটা উপদ্রব লেলিহান বুভুক্ষুর মত এসেছে, রক্তও শোষণ করেচে—তবু আমি দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের ফিরে দিয়েছি। এমনই ছিল দৃঢ়তা, আর সহিষ্ণুতা! এমন একটা নারীজীবন কল্পনা করতেও অনেকে শিউরে উঠবেন, কিন্তু আমার ত সে কল্পনা বা স্বপ্ন নয়—সে না-কি আমার নিজেরই জীবন, তাকে সহ্য করে নিতে আমার কষ্ট হ'লেও আমি তা পেরেছি।

কিন্তু আজ আর জীবনে বাসনা রইল না। সন্ধ্যার মৃদুল বাতাসে, চন্দ্রকিরণে ঠিক স্ফুটনের মুখেই কলিটাকে কে যেন নৃশংস হ'য়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিয়ে গেল। হিন্দুর দেবমন্দিরে, হিন্দুরমণী হিন্দুর হাতেই নির্য্যাতন পেলে, তবে আর কাকে বিশ্বাস করি? আজ—আমার—সেনকেও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি রইল না।

সেনের গৃহে সসম্মানে বাস করার বিপক্ষে আমার হৃদয় দ্বন্দ্ব বড় অল্প ছিল না—কিন্তু সেই দ্বন্দ্ব বিদ্রোহ সব দমন করে' এই খানেই শান্ত সুকোমল নীড় রচনা করছিলাম, আমার মনের কাছেও যে এই গূঢ় ইচ্ছা অজ্ঞাত ছিল! সে ত কোন দিন স্বপ্নেও ভাবে নি যে সব বিরোধ ধ্বস্ত করে দিয়েচে কিসের এক সুখ লালসা, সব ব্যথা কার মোহন অঙ্গুলি স্পর্শে এরই মধ্যে সঙ্গীত হ'য়ে উঠেচে।

সে ঘর নাকি নিজেরই হাতে গড়া, নিজেই তার দেওয়াল দিয়েছি, চাল ছেয়েছি, নিজের চোখে ভাঙ্গতে দেখা ত সহজ নয়। তার সঙ্গে সঙ্গেই এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের এক একটা অঙ্গ ভেঙ্গে পড়বে, সে কি আর আমি জানি নে! কিন্তু যত শক্তই হোক, তার শিরে বাজ পড়েছিল, কেউ

তার ধ্বংস প্রতিরোধ করতে পারবে না। মূঢ়ের মত বসে বসে আমি তার পরিণাম দেখতে লাগলাম।

একদিন আশা হ'য়েছিল, দু'চারদিন পরে সেন ফিরবেন, অন্ততঃ একটা খবরও দেবেন। ছ'দিন কেটে গেল, না চিঠি না খোঁজ। চোখের সামনে তাঁর নির্লিপ্তভাব প্রত্যক্ষ করেছি—তা'তে ত এত বেদনা অনুভূত হয় নি—চোখের বার হ'য়ে যে তিনি চিঠি লিখবেন—এও দুরাশা, অথচ সেইটে চেয়েই আমি যেন প্রাণ ধরে বসেছিলাম, প্রতি মুহূর্ত্তেই ভেবেচি কখনও চিঠি আসবে না—তবু সারাদিন বারান্দায় বসে সামনের ডাকঘরটার দিকেই চেয়ে থাকতাম। পিওনের দল চিঠি বিলি করতে বেরুত, কেউ বারান্দার দিকে চাইত, আমি ভাবতাম, তার দৃষ্টি আমাকে নেমে যেতে বলচে—বুঝি আশাতীত সামগ্রীই ভাগ্যবশে এসে পড়েছে। ছুটে নীচে এসেচি, পিয়ন তার মাথা নেড়ে, ব্যাগ দুলিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেচে—চোখে অন্ধকার দেখে ফিরে এসেচি। এমনই করে কটা দিন কেটছিল—সমুদ্রের তীরে বসে ঢেউ গুণে ক'দিন কাটে আর! বিক্ষুব্ধ উত্তাল নীলিমা হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরতে আসছিল—সে অসীম নীলিমার কি সৌন্দর্য্য যে আমাকে পেয়ে বসল আমি তা'তেই ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলাম।

ক'দিন প্রাণধনের কাসিটা কম ছিল, আমি ডেকে পাঠাতেই কাস রোগ নতুন করে তাঁকে আক্রমণ করলে। আমি তাঁকে ডেকে বল্লাম—কলকাতা যেতে চাই।

প্রাণধন ভেবে চিন্তে বল্লেন—বেশ।

বেশ নয়—আজই আমি যেতে চাই।

প্রাণধন বল্লেন—আজ ত হয় না। বৃহস্পতিবার...

তার হ'য়েচে কি?

কাসি থামিয়ে প্রাণধন বল্লেন—যদি পাও রাজ্যদেশ, না যেও বেস্পতির শেষ। শাস্ত্রে বলেচে—এ কি অমান্য করা উচিৎ?

শাস্ত্র আমি মানি নে।

আপনি না মান্‌লেও আমাকে মান্‌তে হয়। আর, আপনাকে একা ত ছেড়ে দিতে পারি নে আমি। যখন আপনার সব ভারই আমার ওপর রয়েছে।...প্রাণধন কাস্‌তে লাগলেন।

না-হয় কালই যাওয়া যা'বে।

প্রাণধন খুসী হ'য়ে বল্লেন—সেই ঠিক!

একটু পরে আবার বল্লেন—কলকাতায় কি আমার বাবুর ওখানেই উঠবেন?

না—আমার নিজের বাড়ী আছে সেখানে।

বাঃ বাঃ—তবে ত উত্তম হ'য়েচে। আনন্দাতিশয্যে কাসি বৃদ্ধি পেয়েছিল, কাসির ধমকে স্বর বন্ধ হ'য়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে হাঁফাতে হাঁফাতে বল্লেন—বাবুকে খবর দেবেন না-কি?

না।

কি ভেবে না বলেছিলাম, তা আমিই জানি নে। কি উদ্দেশ্যে, কার আশায় প্রলুব্ধ হ'য়ে যে আমি কলকাতা যেতে চেয়েচি—তাও জানি নে।

প্রাণধন পরমাত্মীয়ের মত কোমল স্বরে বল্লেন—তাহ'লে ঐ ঠিক রইল, কি বলেন? আমাকেও যখন যেতে হ'বে, একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নেবার দরকার।

কি গোছাবেন ?

প্রাণধন একটু চম্‌কে বল্লেন—এই বাড়ী-ঘর-দোরের একটা বিলি-বন্দোবস্ত করতে হ'বে ত !

আমি তাঁর মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে বল্লাম—তা বৈ-কি !

প্রাণধন ওঠবার নাম করলেন না। বসে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে বল্লেন—আপনার নিজের বাড়ী ? অট্টালিকা ?

সে কথার উত্তর না দিয়েই আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার বাবুর কলকাতার বাড়ী কি-রকম ?

কি-রকম মানে ?

এই - খুব বড় ?

তা বড়ই বৈ-কি।

কে-কে আছেন ?

প্রাণধন বল্লেন—এই যে সেদিন বল্লাম আপনাকে—ভুলে গেছেন ? বাবা, মা, বোন্—

আমি লজ্জিত হ'য়ে বল্লাম—হ্যা হ্যা বলেছিলেন বটে !

প্রাণধন জিজ্ঞাসা করলেন—সেখানে যাবেন না কি ?

স্নান করতে যাই—বলে আমি ঘর ছেড়ে চলে এলাম। কথাটা ত চাপা দিতেই আমি চাই, কিন্তু সে যে বুদ্‌বুদের মত জলের উপরেই ভেসে ওঠে ! স্নান করে দরজা বন্ধ করে' আমি ভাবতে লাগলাম—সেখানে আমি যেতে পারব কি-না !

প্রাণধন ভারি ব্যস্ত ! বাড়ীতে টিকি দেখবার যো নেই, দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছেন—বাজার করে ! আমার পক্ষে তাঁর অনুপস্থিতি সুখেরই

হ'য়েছিল ! আমার মনের তখন এমনই অবস্থা যে লোকজন যেন সহ্য হচ্ছিল না। হাতা বেড়ী খুন্তী সব নতুন নতুন বাজার থেকে আসচে— চাকরেরা বল্লে—সরকার মশাই কলকাতা নিয়ে যাবেন ! হবেও বা ! কাশির লোহার সামগ্রী সম্ভবতঃ উৎকৃষ্ট আর তা নিয়ে যেতেও বোধ করি মাটির জিনিষের মত কোন বাধা নেই।

রাত্রে কাস্তে কাস্তে বল্লেন—মত বদলায় নি ত ?

সে মূর্খ ত জানে না, এ মতের কি পরিবর্ত্তন সম্ভব ? ঘাড় নেড়ে তা'কে বুঝিয়ে দিলাম যে সব স্থির আছে—কস্মিনকালেও বদলাবে না ; শুনে তাঁর মুখ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো।

জিজ্ঞাসা করলাম—এত বাজার কিসের ? এ যে একটা ঘর সংসার দেখছি।

একমূহূর্ত্ত স্তব্ধ থেকে প্রাণধন বল্লেন—কি জানেন, কাশী থেকে যাওয়া হ'চ্চে—পাঁচটা জিনিষ না নিয়ে গেলে লোকে বলবে কি ! আর ঠাকরুণ আমাদের ! তাঁর আবার দু'হাতে পাড়ায় বিলোনো অভ্যাস। আমি যদি শুধু হাতে যাই—রক্ষে আছে কি। কলকাতার জিনিষপত্র থেকে আরম্ভ করে', টাকা পয়সা বিলিয়েও তাঁর আশা মেটে না, আমাদের ওপর হুকুম আছে, হপ্তায় একদিন করে', লোক দিয়ে কাশীর নতুন নতুন জিনিষ পাঠাতেই হ'বে। বুঝলেন না ? বড় লোকের বড় কথা ! আমরা কোথায় মরি পাঁচটা সামগ্রীর তরে আর তিনি দু'হাতে বিলিয়ে যাচ্ছেন।

কাদের বিলোন ? গরীবদের ?

গরীবদের শুধু ? তা হ'লে ত বাঁচতাম—পাড়াময়—গরীব বড় লোক নেই। সব বাড়ীতে যাবে জিনিষপত্র। বুঝছেন না—বড় লোকের খেয়াল !

পাড়ায় ত আরো লোকের অবস্থা ভালো আছে, তারা নেবে কেন?

নেবে না আবার! আপনিও যেমন! মিনি খরচায় পেলে না নেবে কে? আমি ত নিঃখরচায় বিষ খেতে পারি। হা হা খ-খ ··· ..

তাঁর কাসি থামলে আমি বল্লাম—সবাই কি আপনার মত! কখখন নয়!

না—হোকগে-ছাই! তা'তে ক্ষতি নেই, তবে নেয়—এই জানি! আর গিন্নীমা কি দান করছেন বলে দেন যে লোকে নেবে না? বন্ধুতা বন্ধুতা। লোক ওঁরা সবাই চমৎকার! পাড়ায় সকলকার সঙ্গেই বন্ধুতা আছে, যখন যা বাড়ীতে আস্‌ছে, সকলকে পাঠাচ্ছেন—তা'দের যখন যা আসে তারাও পাঠিয়ে দেয়!

আমার মনে বিশ্বাস হ'ল ইহা অসম্ভব নয়! এরই সঙ্গে যে একটি মহিয়সী মহিলার গম্ভীর মূর্ত্তি আমার মানসপটে ফুটে উঠল—সে যেমন স্থির তেমনি ভাস্বর! তাঁরই গর্ভ সম্ভূত সেন-যে আমার সকল চিন্তা ভরে আছেন—তাঁর চেয়ে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুরুষ মূর্ত্তি আমার চোখে পড়ে নি—কাজেই তাঁর জননী মূর্ত্তির এই বিশেষত্ব আমার অস্বাভাবিক বোধ হ'ল না।

সরকার মশাই মোগলসরায়ে এসে বল্লেন—কোন্ কেলাসের টিকিট করব।

আমার বেশ মনে অছে, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কতভাড়া এখান থেকে কলকাতার?—নীচু ক্লাসের দুর্দ্দশা চোখে দেখেচি বলেই এ কথাটা জিজ্ঞাসা করতে হল। সরকার মশাই একটু ভেবে বল্লেন—চারটাকা ন' আনা।

আমি বল্লাম—এত কম!

ঐরকমই ত ভাড়া! তা বলুন, কোন্ কেলাসের আনব?

যা-হয় আনুন-না ছাই, গাড়ী কোন্দিকে আস্বে?

এইখানে লাগবে।—বলে তিনি চলে' যাচ্ছিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঠিক জানেন আপনি? এ-নয় মনে হ'চ্চে যেন। বরং ঐ টিকিট বাবুর কাছে·····

প্রাণধন বিরক্তভাবে বল্লেন—আমি জেনে এসেছি।

প্রাণধন যেতেই আমি একটা মুর্ত্তিওয়ালা ডেকে ডাউন প্ল্যাটফরমের খবর নিয়ে নিলাম। এটা আপ প্ল্যাটফরম! আমার ঠিক মনে আছে সেদিন সেন এইখানটাতেই নেমে টিকিট-কালেক্টারের সঙ্গে কথা ক'য়েছিলেন! প্রাণধন জানে না, তর্ক করলে, আসুক একবার! কিন্তু তাই যদি তার মনে থাকে, না, না, সেও কি সম্ভব হ'তে পারে কখনও?

কুলিটা একটু দূরেই দাঁড়িয়ে পাগড়ী দিয়ে ঘাম মুছছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বল্লে—পচ্ছিম যানেকা গাড়ী—বাবু বলিয়াছেন। প্রাণধনের কাসিটা বরাবরই আমার কি-রকম যেন লেগেছিল। এখন একেবারে সাফ হ'য়ে গেল! তার বাঙ্গার করা থেকে সবটা আমি যেন খোলসা দেখতে লাগলাম।

ভীষণ শব্দ করে' দুদিক থেকে দু'খানা গাড়ী এসে দাঁড়াল, আমিও ছুটে ওপারে গিয়ে একটা মেয়ে কামরায় ঢুকে পড়লাম। অন্য স্ত্রীলোকেরা নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছল, তার সন্দেহ নেই, তবে সৌভাগ্যের বিষয় বাঙ্গালী একটিও ছিল না।

যতক্ষণ গাড়ী থেমে ছিল, আমার বুক যেন থেকে থেকে স্তব্ধ হ'য়ে যাচ্ছিল। কখন্ গাড়ীটা ছেড়ে যায়—এই যেন আমি চোখ বুজে প্রার্থনা করছিলাম। ফিরিওয়ালার বিরাম নেই, সিঁদুর কৌটা, ঝুমঝুমি, চাবি-কাঠি, চুনারের মাটির বাসন, বাঙালীর সামনেই বেশী করে ধরতে লাগল, আমি তাদের বারণ কর্ত্তে পারি নে, অথবা কোন জিনিষ ভালো ক'রে দেখে নেবারও সাহস আমার ছিল না। এককোণে আড়ষ্ট হ'য়ে বসে-ছিলাম, গাড়ী ছেড়ে দিলে।

ঐ বুঝি কে লাফিয়ে উঠছে ভেবে—গাড়ী খানা যতক্ষণ না প্ল্যাট-ফরমের বার হ'য়ে গেল, আমি চোখ চাইতে পারলাম না। গাড়ী যখন হুহু করে ছুটছে, আমি বেশ একটু স্থান দখল ক'রে বসে প্যোটম্যাণ্টু খুলে একখানা বহি বার ক'রে পড়বার চেষ্টা করতে লাগলাম। পড়া হ'ল না,—কোথা থেকে নানা চিন্তা মনটি ঘিরে ফেল্লে। এই-যে আজকের কাণ্ডটা, যেমন অদ্ভুত, তেমনি অস্বাভাবিক! আমার মনের এত জোর, এত সাহস কোথা থেকে এসেছিল, তা' আমি জানি নে—কিন্তু খানিক বাদেই মনে হ'তে লাগল—সে যেন স্বকৃত নয়! স্বকৃত হ'লেও তার যেন আরাম বা স্বস্তি ছিল না। কিসে আমি নিশ্চিত বুঝে-ছিলাম যে প্রাণধনের মতলব ভাল ছিল না—তা' এখনও ঠিক করতে পারি নি, এখন মনে হ'তে লাগল যে প্রাণধন তা পারত না। সে অতি বৃদ্ধ, দরিদ্র—সে কখনই এমন কাজে সাহসী হ'ত না।

গাড়ী যেখানেই থামে হিন্দুস্থানীরা কি সব কিনে খায়। আমি দেখলাম, এতটুকু একটু টুপি-মাথায় ছেলে, সেও বসে গেচে তার মার সঙ্গে চিনে বাদাম কুড়িয়ে খাচ্ছে। তার মা যে সে দেখছে না, তা নয়

—সে-ই ছড়িয়ে দিচ্ছে, শিশুটি ছোট হাতের কম্পিত আঙ্গুল দিয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছে। আর সকলে মিলে মাঝে মাঝে এমন হাস্‌ছে যে আমার কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। একটা দশ বারো বছরের মেয়ে আমার দিকে চেয়ে থু থু করে থুতু ফেলচে, আর সকলে হেসে লুঠোপুটি। এদের সঙ্গে কথা কয়ে বারণ কর্ত্তেও আমার প্রবৃত্তি হ'ল না—অন্য একটা গাড়ীতে যেতে আরও ভয় হ'তে লাগল—এরা তবু স্ত্রীলোক, সেখানে না জানি কারা আছে। মেয়েটিকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দিলাম, সে কিছুক্ষণের জন্য থাম্‌ল বটে, পাশের একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে কি পরামর্শ কচ্ছে দেখে আমার মনে হ'ল, আবার আমাকে তাক্ত করবার ফন্দী করচে। এই গয়নামোড়া হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের কাছে বাঙালী মেয়ের একটুও সম্ভ্রম নেই, বুঝেই আমি তাদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। ধমকে যা হয় নি, এবার তা হ'ল। তারা মন খুলে আলাপ জমিয়ে দিলে। চিনের বাদাম, কাবলী মটর মুঠো করে আমার দিকে এগিয়ে দিতে লাগল! ফেরাতে পারলাম না, হাতে করে নিলাম। এক সময়ে জানেলার বাইরে হাত ঝুলিয়ে সেগুলির ব্যবস্থা করে দিলাম। একটি বিশেষত্ব তাদের মধ্যে আমি দেখেছি তারা যখনই যা কিছু কিনেছে আমাকে তার অংশ দান করতে কার্পণ্য করে নি।

রাত্রে তারা সব শুয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে হিন্দুস্থানী দু'একটি যুবক তাদের তথ্য নিচ্ছিল, তাও বন্ধ হ'য়ে গেল—আমি যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তারা নীরব নিদ্রিত হ'য়ে পড়ল, আমার ভাবনা হ'ল নিজেকে নিয়ে। প্রাণধনের কি উদ্দেশ্য ছিল সেই জানে, তবে

কলকাতায় যাবার সংকল্প যে তার ছিল না—আমি নিশ্চয়ই জেনেছিলাম। কোথায় নিয়ে যেত, কোন আশা সে পূর্ণ করত—কিছুই জানিনে, কিন্তু এখন আমার মনে হ'তে লাগল শেষ অবধি দেখলে হ'ত! যে আমি তার ফাঁদ থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলাম সেই আমিই ভাবতে লাগলাম—একবার দেখলে মন্দ হত কি!

ভোরে জিলুথায় হিন্দুস্থানী একটি যুবক এসে এই স্ত্রীলোকগুলিকে কতকগুলো হলদে রঙের টিকিট দিয়ে গেল। আমার মনে পড়ল, আমার ত টিকিট নেই। যে সুন্দাঙ্গিনীর সঙ্গে রাত্রে আমার আলাপ হ'য়েছিল তাকে বল্লাম—আমার একখানা টিকিট যদি করিয়ে দিতে পার।

এ ভুড়া, ভুড়া করে স্ত্রীলোকটি তাকে ডেকে একখানা টিকিটের কথা বল্লে. সে বল্লে—উসমে ক্যা হ্যায়, লিজিয়ে।

আমি টিকিট নিয়ে বল্লাম—আপনার কি হ'বে?

ও ঠিক হ্যায়! হিঁয়া হামলোককা কুচ ডর নেহি হ্যায়!

টিকিট কালেকটার আসতেই আমি টিকিট খানা দিয়ে দিলাম,—তার কি হ'ল কে জানে!

শেষাশেষি তারা আরও ভদ্রতা দেখিয়েছিল। আমি একলা জেনে হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী করে' আমার পোর্টম্যাণ্টটা তুলে দিয়ে 'রাম রাম' করে অন্য গাড়ীতে গিয়ে বস্‌ল। কোচমান আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—কাঁহা যাগ্যা!

আমার বাড়ীর ঠিকানা বলে দিলাম!

গাড়ীতে বসে আমি ভাবতে লাগলাম—সেদিনের কথা। যে-দিন সব ছেড়ে প্রথম এই রাস্তা দিয়েই ট্যাক্সি চড়ে হাওড়া ষ্টেশনাভিমুখে

ছুটে এসেছিলাম। কি আশার দীপ্ত আলোক মেখে সেদিন এসেছিলাম, আর কি ক্লান্তি অবসাদ নিয়েই ফিরে আসছি আজ! যে পথ সেদিন চোখের পলক না ফেলতে পার হ'য়ে গিয়েছিল, আজ পলে পলে দগ্ধ করতেই যেন তার দূরত্ব বহুগুণ বর্দ্ধিত হ'য়ে গেল। হয় গাড়োয়ান পথ ভুল করেছে, নয়ত তার বেতো ঘোড়া দু'টো নিতান্তই অকর্ম্মণ্য এই ভাবছি, গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করলে,—কেত্তা নম্বর?

প্রথমদিন বোর্ডিং থেকে এসে সে বাড়ীটার আপাদ মস্তক আমি দেখে নিয়েছিলাম, নম্বরটা ৮৬-২—তাই বলে দিলাম: একটু পরেই গাড়ী সেই বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। সামনের উঠানে চার-পায়ে বসে এক হিন্দুস্থানী দরওয়ান কলকে খাচ্ছিল আমাকে দেখেই উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলে—কা'কে চাই আমি!

এ ব্যবস্থা যে সেনের সে আমি আগের থেকেই জানি। তা'কে বল্লাম যে, আমার বাড়ী।

সে সেলাম করে' গাড়ীর চাল থেকে প্যোটমাণ্টু নামিয়ে বল্লে—আইয়ে!

উপরের ঘরগুলির চাবী খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে ·বাবু আয়া হ্যায়? তবিয়ৎ খুস্?

তাকে বিদায় দিয়ে আমি একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। গাড়ীতে এক বিন্দুও ঘুম হয় নি—চোখ দুটির ভেতর লাল, বাইরেটায় কে-যেন খানিক কালী লেপে দিয়েছে। মাথার চুল শুষ্ক রুক্ষ—অনেক দিন আমি সযত্নে চুল বাঁধিনি বটে, তাহ'লেও সংস্কার করতে কোনদিনই অবহেলা ছিল না আমার। কোন্ একটা গল্পের নায়ক এমন ঘুমিয়েছিল

যে জেগে উঠে দেখ্‌লে—তার উপর একটা রুইঢিপি জন্মে গেছে, ছেলেবেলায় এ গল্প আমি স্কুলে পড়েছিলাম বা কারু মুখে শুনেছিলাম মনে নেই, সত্যও হ'তে পারে, মিথ্যা হওয়াও অসম্ভব নয়,—আজ নিজের বাড়ীতে সেই বড় আর্শীখানায় চেয়ে দেখলাম সে আমি আর নেই! জামা ভেদ করে অস্থিপঞ্জর ঠেলে উঠেছে; চোখের সে দীপ্তি নেই; শীর্ণ পঙ্গুর হাতদুটি যেন নড়বড় করছে—একদিন এই আর্শীটাই আমার মুকুলিত যৌবনের পরিপূর্ণতায় বিভাসিত হ'য়ে উঠেছিল, আজ যেন আর্শিতে ধুলো জমে' আমার চেহারাখানাকে বিবর্ণ কৃশ করে দেখালে! নিজের বস্ত্র প্রান্ত দিয়ে আমি আর্শীখানাকে মুছে ফেল্লাম, কিন্তু রূপের জ্যোতিঃ বিকশিত হ'ল না। আমার চোখে জল এল। যা'কে সুন্দর সু... করে তুলতে বোধ করি একদিন দেবতাদেরও আগ্রহ দেখা গেছল—আজ তা'কে ব্যর্থ নীরস দেখেই আমার চোখ ফেটে গেল।

নারী জন্মের কোন সার্থকতাই আমার মন বাঁধতে পারলে না, নারী জীবনেরও সব আশা-ভরসা ফুরিয়ে গেছে বলেই মনে হ'তে লাগ্‌ল—আমি আর স্থির হ'তে পারলাম না।

দরওয়ান আত্মীয়তা জানাতে এসেছিল, তা'কে দেখে আরো অধৈর্য্য হ'য়ে গেলাম। এ যে তারই আজ্ঞাবহ যে আমাকে এমন দীন করে দিয়েছে। সেনের অন্তঃসারশূন্য আন্তরিকতাই আমার এই সর্ব্বনাশ করেছে বুঝেই আমি তীব্রস্বরে তা'কে চলে যেতে বল্লাম। সে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল, নড়ল না।

আমি বল্লাম—বাবুকে বলগে, আমি এসেছি, তোমাদের এখানে থাকবার আর দরকার নেই।

সে একটু ভেবে চিন্তে বল্লে, বহুৎ খুব।······সে চলে গেল, এত সহজে যে যাবে আমার সে ধারণাই ছিল না। এ বাড়ীতে আমার পুরোণো চাকরদের একটাও ছিল না। একটা লোক ঘর দ্বার সব ঝাঁট দিচ্ছিল, সেও সেনের নিয়োজিত ভেবে তা'কেও আমি চলে যেতে বলে দিলাম। দরওয়ান এক কথায় চলে গেছল, এ কিছুতেই যেতে চাইলে না। রুটি মারছি বলে কেঁদে ফেল্লে। যত বোঝাই তাকে, যে কলকাতা সহরে তার কাজের দুঃখ কি—সে ততই কাঁদে, আর বলে—ছোড়নে হাম নেই সেকেগা! তার এত জেদের কারণ আমি পরে বুঝতে পেরেছিলাম। কাজ সে করতেই পারত না, যেমন কুড়ে তেমনি অপদার্থ! যে কাজটি করতে বলি, সেইটে ছাড়া সবই সে করবে বলে আমাকে অভয় দেয়। সে নিজেই বল্লে যে, বাবুর বাড়ীতেই থাকৃত গিন্নিমা খিটখিটে মেজাজের লোক, তা'কে ভারি বকৃতেন, তাই খোকাবাবু (সেন) তার জন্তে এই ব্যবস্থা করেছেন। আরো সে জানিয়ে দিলে যে পয়সা দিচ্ছে বলে চাকর বাকরকে বেশী খাটানো কি বকাবকি করা অত্যন্তই অনুচিত। এবং আমার কাছ থেকে সে সম্পূর্ণ অনুরূপ আশা করেই বসে আছে, এক নিঃশ্বাসে সব কথা বলে সে দীন নয়নে আমার পানে চেয়ে রইল।

এ আমি অনেক দেখেছি যে মুখের অনেক কথায় যে কাজ হয় না, চোখের একটা দৃষ্টিতে অনেক সময়ে তা সুসম্পন্ন হ'য়ে পড়ে। এই অপদার্থ জীবটাকে আমার রাখবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না—সে-যে কাজ করতে পারবে না বলে তা নয়—সেনের লোক আমি রাখব না, অন্ততঃ তাঁকে এটি আমি দেখাতে চাই যে তাঁর ঐ ঐশর্য্যের দ্বারে আমি

মুষ্টিভিক্ষার তরে হাত পাতি নি! যদিও, কার কাছে এই নারীদেহটা যে-না বিলিয়ে দিতে চেয়েছি—তা ত জানি নে! থাক্ সে কথা, খুবলাল রয়ে গেল।

খুবলাল বল্লে—মা-ঠাকরুণ খাওয়া দাওয়া কি হবে?

তার নিজের ব্যবস্থা করে নিতে বল্লাম, সে তাতে দুঃখিত হ'ল, বল্লে—আমার খাবার জোগাড় না দেখ্‌লে সে রাঁধবে না।

তবে তুমিই যা পারো করো, তাই যা-হয় হ'বে খন।

সে বল্লে—সে ভালো রাঁধতে জানে না। আর তার হাতে কখনও কেউ খায় না।

খায় না তাতে তার দুঃখ নেই এ তার কথার ভাবেই বোঝা গেল। সে নীচ জাতীয় নয়—(হ'লেও আমার বাধা ছিল না) কেন খায় না জিজ্ঞাসা করতে সে জানালে যে-সে রাঁধতে জানে না। ও পারে না।

পারে না নয়—এ তার কুড়েমি, সে আমি বুঝেছিলাম। রাঁধা কাজটা এমন কিছুই নয় যে পারি না বল্লে খালাস পাওয়া যায়! আর একটা কুড়ে নিষ্কর্ম্মা লোক যে বসে বসে আমার অন্নধ্বংস করবে—এ সহ্যও আমি করতে পারি নে, তাকে বলে দিলাম যা পারে, যেমন পারে সেই রাঁধুক।

আমার এই বাড়ীটা তিনটে রাস্তার ঠিক সংযোগ স্থলে। সামনে দিয়ে একটা বড় রাস্তা দু'দিকে বেড়ে চলে গেছে, এপাশেও একটা ছোট গলি ট্রামের রাস্তায় গিয়ে পড়েছে পেছনেও একটা গলি কোন্ দিকে গেছে কে জানে! জানালা থেকে ট্রামের রাস্তা দেখা যায়—বেলা দশটা বাজে, রাস্তায় খুব ভিড়, সব অফিসের বাবুরা গলদঘর্ম্ম হ'য়ে ছুটেছেন!

বুকে চাদর বাঁধা, বাঁ হাতে কাগজে মোড়া একটি করে খাবারের কৌটা, কারু কারু হাতে আবার বহি, মাসিকপত্র! একটি লোক দেখলাম, তিনি আবার বহি পড়তে পড়তে চলেছেন—এই গাড়ীঘোড়া মোটর ট্রামের পথে মানুষ বহি পড়তে পড়তে চলতে পারে না কি? আমি ভাবলাম হয় ত ইনি কবি! তন্ময় হ'য়ে চলেছেন! কিন্তু যত তন্ময়ই হৌন, গাড়ীঘোড়া দেখে না চল্লে যে তাঁর বিপদের সীমা থাকবে না এ-যেন কল্পিত কবিটিকে আমার বলে দিতে ইচ্ছা হল, কিন্তু বলা ত আর সম্ভব নয়!

আহারাদির পর আমি খুবলালকে একখানা চিঠি দিয়ে বল্লাম এলোকেশী থিয়েটার জানিস?

সে ত্বরিত উত্তর প্রদান করলে, সে জানিত কিন্তু সম্প্রতি ভুলিয়া গিয়াছে। আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে ভুলিলে চলিতেছে না—এই চিঠি লইয়া তাহাকে যাইতেই হইবে।

খুবলাল সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে কক্ষত্যাগ করলে। আমার ভয় হ'ল হয় ত বা সে পথে পত্রটি ফেলে দেয়! ডেকে বলে দিলাম, চিঠির জবাব চাই।

প্রতিমুহূর্ত্তেই আমি ব্যস্ত হ'য়ে পড়ছিলাম। কিসের তরে এ ব্যস্ততা তা ত জানিনে। ফুলী আমার চিঠি পেলে আসবেই, কিন্তু যদি সে থিয়েটারে না থাকে? চিঠিটা ফেরৎ আনতে বলে দেওয়াই উচিৎ ছিল। খুবলাল যে রকম সুবুদ্ধি, আবার পরিশ্রমের ভয়ে চিঠিটা ফেলে না আসে,—এই ভয়েই আমি সন্ত্রস্থ হ'য়ে পড়েছিলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে একখানা গাড়ী এসে দরজার কাছে থামল।

ফুলী যে এরই মধ্যে সময় করে আসতে পারবে আমার আদৌ ভরসা ছিল না। আমি ভাবলাম হয় ত অন্য কেউ এসেছে,—হাত পা অবশ হ'য়ে গেল।

একটু পরেই নীচে থেকে ফুলী বলে উঠল—কোথা গো মা-ঠাকরুণ!

পুলকাতিশয্যে আমার কণ্ঠরুদ্ধ হ'য়ে গেল,—আমি সাড়া দিতে পারলাম না।

ফুলী আবার বল্লে—রাধে-কৃষ্ণ, জয় হোক মা, দু'টি ভিক্ষে পাই গো।

আমি বারান্দায় বেরিয়ে বল্লাম—গান গাও, অমনি ভিক্ষে কে দেয় বল?

একগাল হেসে সে উপরে উঠে এল। তার শান্তস্নিগ্ধ চোখ দু'টি আমার পরে ন্যস্ত করে বল্লে—কি ভাই, কেমন আছ? বলি—সব খ-ব-র কি?

আমি তার হাত ধরে বসিয়ে দিলাম। সে বসে আমার দিকে চেয়ে বল্লে—দিব্যেশবাবু কোথায়?

আমি কি উত্তর দিই তাই ভাবছি, সে আবার জিজ্ঞাসা করলে আজই এসেছ?

হ্যাঁ। এসেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আর আমার বিশ্বাস ছিল যে তুমি আসবেই। অবশ্য যদি থাক থিয়েটারে।

তা ছিলাম, এসেছি ও—বলে সে তার হাতের কৌটা খুলে একটি পান নিজে খেলে, আর একটি আমাকে দিয়ে বল্লে—খাও।

আমি পান খাই নে।

বল কি! অবাক করলে যে ভাই! পান খাও না!—সে নিজে

আর একটা কৌটা থেকে খানিকটা দোক্তা গালে ফেলে দিয়ে বল্লে—তার পর কাশীর খবর কি বল।

আপনি কোথায়?—উপরে নাকি?

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

ফুলী বল্লে—কে? তিনি?

না—বলে আমি বেরিয়ে গেলাম। সেন উঠানে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে চেয়েছিলেন, আমাকে দেখেই বল্লেন—কি ব্যাপার-বলুন ত!

আমি তাঁকে উপরে আস্‌তে বলে আরো বিপদে পড়ে গেলাম। কোন্‌ ঘরে বসাই, কি করি ভেবে ঠিক করতে পারলাম না।

সেন সোজা ঘরের সামনে এসে বল্লেন—চলে এলেন যে?

ফুলী বেরিয়ে এসে বল্লে—আসুন, নমস্কার।

সেন প্রতিনমস্কার করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

ফুলী বল্লে—ঘরে নিয়ে এস না ভাই!

অনুরোধ তাঁকে আমি করতে পারলাম না। যদি ফুলীর সামনেই সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন—আমি ত তাঁকে ভালো করেই জানি! ফুলী অতশত জানে না, সে সেনের কাছে দাঁড়িয়ে বল্লে—আসুন বসা যাক্—বলে সে হেসে আমার হাতটি ধরলে, বল্লে—কি বল বন্ধু?

সেন কি ভেবে নিলেন যেন, তার পর বল্লেন—চলুন, বস্‌ছি।

ফুলীর সাহস দেখে আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম, সে যেন সেনের বহুদিনের পরিচিত—এমন অবাধ ব্যবহার করছে। ম্যাসফেরো সিগারেটের টিনটি খুলে দু'টি লবঙ্গ মোড়া পান তাঁর হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তামাক খান্‌ কি?

আমি বল্‌তে যাচ্ছিলাম, তামাক পাবেন কোথা এখানে যে খাবেন ?

ফুলী সেনের দিকে ক্ষুদ্র একটি ডিবা বাড়িয়ে দিতেই তিনি তা থেকে খানিকটা দোক্তা গালে ফেলে দিলেন।

আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই এরা পূর্ব্ব থেকেই সুপরিচিত !

সেন বল্লেন—আচ্ছা, আপনি কি এলোকেশী থিয়েটারে শকুন্তলা সাজেন ?

ফুলী তার সুন্দর চোখ দুটি নামিয়ে বল্লে—করি। কেন বলুন দেখি।

না তাই বল্‌ছি—বলে সেন আমার দিকে চাইতে লাগলেন। তাঁর দৃষ্টির অর্থ কিছু না বুঝতে পেরে আমি ফুলীকে বল্লাম—আমাকে একদিন তোমার শকুন্তলা দেখাবে ভাই ?

সে সেনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি বলেন ?

মন্দ কি। দেখবার জিনিষ, অন্ততঃ আপনার পার্টটি অতি চমৎকার হ'য়েচে। আমি ত থিয়েটারের পোকা, অনেকেরই পার্ট দেখেচি, কিন্তু এমনটি আর দেখিনি।

ফুলী বল্লে—সে আমার গুণ, না শকুন্তলার গুণ ?

ওদু'টোই এক কথা—বুঝলেন না ? শকুন্তলা পার্টটি না-হয় ভালোই হ'ল, কিন্তু সে নির্ভর করছে কার ওপর—যে অভিনয় করছে, তার ওপরই না ! আমার মনে আছে, লতাবিতানে শকুন্তলা যখন পত্র রচনা করচেন, আপনাকে চিঠি লিখতে দেখে……

ফুলী বলে উঠ্‌ল—কি আর করেছি বলুন ! তোতাপাখীকে যা

শিখিয়েচে তাই শিখতে হ'য়েচে। একটু থেমে আবার বল্লে—আমাদের থিয়েটারে আবার চন্দ্রগুপ্ত খুলচে এই শনিবারে।

সেন বল্লেন—আপনি কি—হেলেন ?

ফুলী সহাস্যে মুখ নত করে রইল।

দেখুন, ঠিক ধরেছি কি-না ?

যাবেন দেখ্‌তে ?

নিশ্চয়ই।

সোনাকে নিয়ে যাবেন—বুঝলেন ? আপনার সঙ্গে গেলেই ভালো হয়।

সেন বল্লেন—বেশ ত তাই হ'বে। যাবেন—আপনি শনিবারে ?

হঠাৎ কোন কথা আমি বল্‌তে পারলাম না। যাব—বল্লে হয়ত তিনি বিপদে পড়ে যাবেন ; যাবনা—বলাও চলে না, কি উত্তর দেব ভাবছি, ফুলী সেনের পানে চেয়ে বল্লে—একটু আগে থেকেই সিট রিজার্ভ করে রাখবেন, নইলে শনিবারে মেলা দায় হ'বে।

সেন পকেট থেকে পার্স বার করে দুখানি নোট তার হাতে দিয়ে বল্লেন—দেবেন আপনি, বক্স একটা আমার নামে রিজার্ভ করে ?

দেব—বলে সে নোট দু'খানা পানের ডিবায় বন্ধ করে' বল্লে—ভাই, তোমার চাকরকে ডেকে বলে দাওনা, একখানা গাড়ী এনে আমাকে পৌঁছে দিক।······সেই এগারোটায় বেরিয়েছি—দুপুরে আজ রিহার্স্যাল ছিল কি না চন্দ্রগুপ্তের। আপনি অগেও বইটা দেখেচেন ত ? সে সেনকেই প্রশ্ন করেছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না, কারণ প্রথম দিন থেকেই সে আমার জীবনেহিতাস জান্‌ত, আমি যে কোনদিন বাংলা থিয়েটার দেখি নি তা' তা'কে বলেছিলাম।

সেন বল্লেন—দেখেছি বৈ কি। কম করে বার আষ্টেক দেখেচি।

আচ্ছা—ঐটেই কি ডি-এল-রায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বহি নয়? আপনারা ঠিক বলতে পারবেন।

সেন বল্লেন—এ ধারণা কিসে করলেন বলুন ত!

কেন—আপনি কি বাংলা পড়েন না, না কি?

সেন বল্লেন—ওকথা বল্লে জিভ্ খসে যাবে। বাংলা বয়ের আমি অক্লান্ত পাঠক। দ্বিজু্রায়ের নাটক, রবী ঠাকুরের উপন্যাস, প্রভাত মুখুয্যের গল্প এ সব আমি ভয়ানক পড়ি। এঁদের সব বহিগুলো খুব কম হয়ত পঁচিশ ত্রিশবার পড়েছি।

আর কারু বহি পড়েন নি?

তা কি বল্‌ছি ছাই! ধরুণ-না, শরৎ চাটুর্য্যের উপন্যাস, গোবর্দ্ধন দত্তের ডিটেকটিভ্ এ সবও পড়েছি।

ফুলী বল্লে—নাটক কার কার পড়েছেন?

সেন বল্লেন—নাটক! নাটক বোধ করি ঐ ডি-এল রায়েরই পড়েছি। অন্য লোকের পড়ে থাকলেও তা আমার মনে নেই, কেবল গিরিশ বাবুর দু'একখানার একটু একটু মনে আছে।

কিন্তু থিয়েটারে গিরিশ বাবুর নাটকের সব চোয় প্রতিপত্তি।

তা ত হ'বেই। আমারও যে ভালো লাগে না, তা নয়,—তবে তা মনে থাকে না, কারণ তার ভেতরে আমাদের প্রাণের যে আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেচে আজ কাল তার কোন সাড়া নেই বলেই বোধ হয় আমার মনে স্থায়ী হয় না। ... ...

দিশেহারা।

তিনি নিম্নস্বরে আর একটা কথা বল্লেন, যার কতকাংশ আমার কানে গেলেও সবটা আমি শুনতে পাই নি।

ফুলী বল্লে—সে কথা ঠিক। অমন গান কেউ লিখতে পারবে না। দেশকে ভালোবাসতে আর ভালোবাসাতে অমন আর কে পেরেছে? তুমি পড় নি?

আমি বল্লাম—না।

ফুলী সেনের মুখের দিকে চাইতে লাগল। ভাবটা যেন, আমি একটা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য ব্যাপার। সেনও সেই ভাবেই বল্লেন—একখানাও পড়েন নি?

আমি যেখানে থাকতাম—নাটক ঢুকত না।

ওঃ—বলে ফুলী চুপ করল। একটু পরে আবার বল্লে—আমি একখানা নাটক লিখেছি।—এ কথায় আমি আশ্চর্য্য হই নি, কারণ তা'কে বিদুষী বলেই আমি জেনেছিলাম।

সেন বল্লেন—তাই না কি? প্লে হ'বে?

আশা ত আছে, তারপর বরাত আমার! এলোকেশীর অনেকেই শুনেচে সেখানা। ·· বলতে সাহস হয় না, আপনি কি ···

খপ করে' সেন বলে উঠলেন দেখতে যাব কি-না জিজ্ঞাসা করছেন নিশ্চয়ই যাব। যাব-না আবার! একে থিয়েটার, তার ওপর আপনার বই।

তা নয়, আমি বলছি কি, আপনি যদি একদিন শোনেন সেটা! বুঝতে পারছেন ত আমাদের বিদ্যে কতদূর—তা'তে কি আর হ'বে বলুন? আপনারা পাঁচজন যদি শুনে বলেন—ভালো হয়েচে, দিই থিয়েটারে।

সেন হেসে বল্লেন—আমাদের বলার বিশেষ মূল্য নেই। আপনার থিয়েটারের ওরা ত ভালো বলেছে ?

ফুলী বল্লে—তা বলেছে, কিন্তু তা'তে মন উঠ্‌ছে না। তাদের আবার ভালোমন্দ বিচার! আপনিও যেমন! শুন্‌বেন, একবার একটা কি কাণ্ড হয়েছিল।

বলুন না শুনি!

উত্তরোত্তর আমার বিস্ময় বেড়েই চলেছিল যে সেনের আজ এত অবসর কিসে? আর কোন দিনই ত তিনি গল্প শুনতে এমন জমে যেতেন না। বারান্দায় বেরিয়ে আমি খুবলালের খবর করতে গেলাম। ফুলীকে বিদায় করতে যে-তা নয়, খুবলালকে ত আমি জানি, সে শুর্তে পেলে আর কিছুই যে করতে চায় না এও আমার অজানা ছিল না। যা ভেবেছি ঠিক তাই, সে মনঃস্থির করে হুঁকো টান্‌ছে। আমাকে দেখেই বল্লে, গাড়ী আভি লে-আতা!

ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েই আমি শুন্‌তে পেলাম, ফুলী বল্‌ছে—কি বলব আর আপনাকে আমি! আর আমাদের মত অভাগিণীর কথার মূল্যই বা কি! তবু একটা কথা বলি, বইটা শুনে যদি আপনি কেবলমাত্র ভালো হ'য়েচে বলেন, আমি অভিনয় করিয়ে তবে ছাড়ব।

একটু থেমে সে আবার বল্লে—আপনি, ভাল হোক্, মন্দ হোক, সত্য গোপন্ যে করবেন না, এ কথা আপনার সামনে বলাই আমার ধৃষ্টতা! আমরা জানি ত……

তার জ্ঞান প্রকাশ হবার পূর্ব্বেই আমি নতমুখে ঘরে ঢুকে ফুলীর হাত ধরে বল্লাম, চল, গাড়ী এসেছে!

ফুলী দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল, সেন-কে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে এল! শান্ত উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি বাড়ীটার চাদ্দিকে ফিরিয়ে বল্লে—বাড়ীটা সারিয়ে নাও।

দেখি—বলে তা'কে সঙ্গে করে নীচে নেমে গেলাম। গাড়ী এসেছিল, তা'তে উঠিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে আমি সিঁড়ির পাশের ঘরটায় ঢুকে পড়লাম। বেশীক্ষণ থাকা হ'ল না। একজন ভদ্রলোক আমার অপেক্ষাতেই বসে আছেন একলা,—এ অনুচিত এই ভেবে এ ঘরে আস্‌তেই সেন বল্লেন—কোথায় ছিলেন?

সেনের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়েই আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তিনি কোথায়?

কে—বঙ্কিম! তার বে হ'য়ে গেছে!

বে হ'য়ে গেছে। কবে হ'ল?

কাশী থেকে ফিরেই।—কথা তিনটি বল্‌তে সেনের কণ্ঠ যেন আর্দ্র হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি নতমুখে একটা দেশালাইয়ের কাঠি ভাঙ্গতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কাশীতে তার গেছ্‌ল তাঁর বাবার অসুখ।

হ্যাঁ।—তিনি চুপ করে রইলেন। আমি কিন্তু তাঁকে নীরব হ'তে দিলাম না। খুঁচিয়ে যেমন লোকে শীতের দিনে আগুনকে উজ্জ্বল করে, তেমনি করে জিজ্ঞাসা করলাম—তবে বিয়ে হ'ল কি করে?

সেন বোধ করি একটু বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন, বল্‌লেন—বাংলা দেশের কোটি কোটি ছেলের যেমন করে হয়, তেমনি করে।

সে আমি জানি। আমি বল্‌ছি—তাঁর বাপের অসুখ।……

অসুখ নয়। আমি-ই অসুখ করিয়েছিলাম।

আপনি?

হঁ্যা। মনে আছে আমার চাকর কাশী থেকে কলকাতা চলে এল। যেদিন আপনার হাত কাটে, সেই বুড়োর বোঁচকায়, মনে আছে? তার ঠিক তিনদিনের দিনই সকালে তার পৌঁছেছিল।

তা পৌঁছেছিল। কিন্তু তা'তে হ'য়েছে কি?

তাইতেই সব। আমার চাকর রাখালের নাম দিয়ে টেলিগ্রাম করলে, পেয়ে বঙ্কিম এল। আমি তার বাপকে চিঠি লিখে সব কথাই জানিয়ে রেখেছিলাম। আপনার কথাও।

আমার কথা-ও?

হঁ্যা। আর আপনার জন্যেই ত এত শীঘ্র এ ব্যবস্থা। নইলে বিয়ের বয়স তার যায় নি।

সেন বলতে লাগলেন—আমাকে থাকবার জন্যে আপনি পীড়িপীড়ি করছিলেন, আপনার কথা রাখ্‌তে পারি নি বলে আপনার মনে কত কষ্টই না হ'য়েছিল কিন্তু সে-ও আমাকে করতে হ'য়েছিল— আর কেন হয়েছিল জানেন? কেবলমাত্র একটি ভেককে সাপের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে। দেখুন হ'য়েছে কি-না! লাঠিটায় রক্ত পর্য্যন্ত লাগে নি।— বলে তিনি হাতটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

ইচ্ছে হ'ল ঐ রক্তাভ করতলটা দাঁতে চেপে পড়ে থাকি, দেখি রক্তপাত হয় কি-না, কিন্তু ভেকের সাহস লাঠি দেখ্‌লে গ্যাঙর গ্যাঙর করে কূপেই প্রবেশ করে। আমি চোখ দু'টি মুদিত করে গাঢ়স্বরে বল্লাম আপনি কি……

সেন বল্লেন—মানুষ!

আমি বল্লাম—মানুষ নন, দেবতা!

সেন হো হো করে হেসে উঠ্‌লেন। তাঁর প্রচণ্ড হাসির শব্দেই আমার ধ্যান, মনের একাগ্রতা সব ঘুচে গেল। খেই খুঁজে পেয়ে, নতুন করে জিজ্ঞাসা করলাম—

তার গেচল তাঁর বাবার অসুখ।

সেন শুষ্ক হাস্যে বল্লেন—নইলে কি-সে ফিরত! বিয়ে সে করতই নয়—জোর করে দিয়েছি।

বল্লাম, জোর করে কি আবার! জোর করে কি করান যায় না কি?

সেন বল্লেন, যায় কি-না দেখুন—তার গেল বাবার অসুখ, সে এল ছুট্‌তে ছুট্‌তে; এসে দেখ্‌লে বাপ বিছানায় শুয়ে গোঁ গোঁ করছেন দেখে ছেলের চক্ষুঃ স্থির। বাপের সেবা করতে লাগল। বাবা বল্লেন—বাবা, আমি আর বাঁচব না।......মরবার সময়েও আমি সুখে মরতে পারছি নে। এই পৃথিবী, ঘর সংসার, আত্মীয় স্বজন পুত্র কন্যা ছেড়ে যেতে হ'চ্ছে বলে আমার দুঃখ নয়—আমার দুঃখ এই যে তো'কে সংসারী করে যেতে পারলাম না।

বলতে বলতে তিনি চুপ করলেন। আমি বল্লাম—তারপর!

"তারপর থেকেই তার বাবার যন্ত্রণা বাড়তে লাগ্‌ল। এক সময়ে আমার ডাক্ পড়ল,—আমি যেতেই তাঁর দুঃখের কারণটি আমাকেও বল্লেন। আরো বল্লেন যে, মরে আমি পৃথিবীর সঙ্গে নিঃসম্পর্ক হচ্ছি নে। নিঃসম্পর্ক করছে আমার ছেলে! আর কেউ কথনো বলবে না

শ্যামারায়ের বংশ আছে। যদি সে মনস্তাপ আমারই একা হ'ত, আমি সহ্য করে নিতাম, কিন্তু বংশলোপ, জাতিলোপ, ধর্ম্মলোপ এ সব সমাজের ক্ষতি তুমি ত সবই বুঝছ।---আমি তাঁকে বলতে পারলাম না যে সমাজ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজনই হয় নি—সেখান থেকে উঠে পড়তে হ'ল। বঙ্কিমের মা বোন্ও দেখি আমার মুখেরপানে চেয়েই মুখ মুছতে লাগলেন।

বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা হ'তেই আমি তা'কে বল্লাম বিয়ে কর!—সে রাজী হ'ল না। আমি তা'কে বুঝিয়ে দিলাম, নৈলে সে আমাকেও হারাবে!......

সেন চুপ করলেন। আমি একটু ইতঃস্তত করে জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন বউ হ'ল দেখেছেন?

না। বৌ দেখে বেড়ানোর সখ্ আমার নেই। প্রথাটা আমার পসন্দ হয় না।

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছল, এ ত কুমারী মেয়েদের পুরস্কার সভা নয়! সুখের বিষয় তিনি শুনতে পাননি; বল্লেন—আশীর্ব্বাদ আমি করে পাঠিয়েছি। হাজার টাকার একগাছা হার যৌতুক দিয়েছি।

তিনি আর কিছুই বল্লেন না। তাঁর দিকে না চেয়েও বুঝতে পারলাম যে কথাগুলি তাঁর ভিজে ভিজে উঠ্ছে, আর সেই আর্দ্রকণ্ঠস্বর গোপন করবারই চেষ্টা সেন প্রাণপণে করছেন।

আমি বল্লাম—আপনি তাঁর বিয়েতে যোগ দিলেন না!—বঙ্কিম তা'তে দুঃখিত হ'য়েছেন, নিশ্চয়ই।

কি জানি! আমার সঙ্গে দেখা হয় নি।--বলে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

শোকে মানুষ কাঁদতে চায় সেই তার সান্ত্বনা—সেন ও গভীর দুঃখের সহিত ঘটনাটি বিবৃত করছিলেন, তাঁর পক্ষে সেইটেই সান্ত্বনা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল—কিন্তু শোকের সময় যেমন লোক সাক্ষ্য থাক্‌লে কণ্ঠরুদ্ধ হ'য়ে যায়.-- সেনেরও তেমনি স্বর বন্ধ হ'য়ে গেল।

আপনার খুব আনন্দ হচ্ছে বুঝি?

সেন দু'পা পেছিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। যেন ভয় পেয়েছিলেন। তাঁকে স্তব্ধ থাকতে দেখেই আমিও সরে গেলাম। আবার যখন তিনি আমার কাছে এসে বল্লেন—কেন আপনি রাগ করছেন আমার ওপর! আমি ত আপনার বন্ধু বৈ আর কিছুই নই।

আমার ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল, আমি নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সেন কাতরকণ্ঠে বল্লেন—দেখুন, আমার মনে হ'চ্ছে এ শুধু আজকের ঐ একটা কথার জন্যে আপনার এত রাগ নয় --অনেক দিনের রাগ যেন ভেতরে জমা হ'য়েছিল, আজ প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে? কিন্তু আমি ত ভেবে পাই নে কিসে আপনার রাগ হ'তে পারে। সাধ্যমত আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করতেই চেষ্টা পেয়েছি। যদিও বুঝতে পারছি যে আমার সব চেষ্টাই বিফল হ'য়েছে আমি আপনাকে সুখী করতে পারি নি।

তিনি থামতেই আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌লে। বাঁ হাতে রেলিংটা ধরে আমি নীচের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সেন বল্লেন—বাপমায়ে আমার নাম দিয়েছিলেন সন্তোষ। সেই

থেকেই আমার কেমন একটা গর্ব্ব দাঁড়িয়ে গেছল, দুনিয়ার লোককে আমি সন্তুষ্ট করতে পারব, অন্ততঃ আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করবে। এতদিন কমবেশী সেই রকমই হ'য়ে এসেছিল, কিন্তু আপনার কাছে আমার দর্প চূর্ণ হ'য়েছে। আমার মনে হয় আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করতে ত পারি-ই নি, বেশী দুঃখ দিয়েছি। নৈলে আপনি এত অপ্রসন্ন বিমুখ হ'বেন কেন? কিন্তু তবু সত্যি কথা বলছি যে চেষ্টার আমি ত্রুটী করি নি। কি-যে চান আপনি, আর কি-না পেয়েই এমন ক্ষুব্ধ হ'য়েছেন, তা আমি জানি নে। জানতে পারলে একবার দেখতাম, আমার দ্বারা সে সম্ভব হ'তে পারে কি-না।

দিব্যেশ কোথা?

সেন কয়েকমুহূর্ত্ত স্থিরনেত্রে আমার পানে চেয়ে বল্লেন—বুঝেছি!

একটু থেমে আবার বল্লেন—বেশ আমি তার সন্ধান করব।

আমার চুলের মুঠি ধরে কে যেন সেখান থেকে টেনে ফেলছিল আমাকে, আমি চলে যাচ্ছি, সেন বল্লেন—আমাকে বিশ্বাস করুন। আমি তা'কে হাজির করে তবে ছাড়ব।

কি বলতে গেলাম কথা বেরুল না। প্রস্থানোদ্যত সেনের পথে বুক পেতে শুয়ে পড়তে ইচ্ছা হ'ল—সেন তার কিছুই জানলেন না। আমার দুর্দ্দমনীয় অশ্রুস্রোত যে সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করে দিচ্ছিল তিনি সেদিকে লক্ষ্যও করলেন না—ধীর পদক্ষেপ সিঁড়িতে নামতে লাগলেন।

আজ মনে হয় আমার দু'বাহু কি এতই শক্তিহীন হ'য়েছিল যে তাঁর উদ্যত পা দুটি মাটির সঙ্গে চেপে ধরতে পারলে না! তারা শক্তিহীন না হ'লে হয় ত সেদিনই এ জীবনের ধারা অন্য পথে প্রবাহিত হ'তে

পারত, সব আশা আকাঙ্খা সাফল্যের বাতাসে ফুলে ফুলে দুলে দুলে উঠ্‌ত কিন্তু সে সব আকাশকুসুমের মত রঙীন হ'য়ে ফুটল, আর চোখের পলকেই বাষ্প হ'য়ে উবে গেল!

সেন নীচে থেকে বল্লেন—দিব্যেশকে পেলেই তবে আবার আসব, নৈলে এই শেষ!

তাঁর জলদমন্দ্রস্বরে যেন আমার বুকের উপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল!......

আমি কেঁদেছিলাম, কি করেছিলাম, কিছুই আমার স্মরণ নেই, শুধু এইটুকু মনে আছে যে দৌড়ে নীচে নেমে এসেছিলাম। খোলা সদর দরজার সামনে একমিনিট দাঁড়িয়ে থেকেই কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েছিলাম। এটা মনে আছে, তার কারণ, দরজার পাশেই একটা টুল ছিল, তা'তে মাথা ঠুকে আধঘণ্টা ধরে অনর্গল রক্ত বেরিয়েছিল! সে ক্ষত সারতে বড় অল্পদিন লাগে নি।

মরতে আমি কেন যে দিব্যেশের নামটা উচ্চারণ করতে গেছলাম সে ত জানি নে; সে হতভাগাকে স্মরণ করতে যে আমার নারীর লজ্জা, নারীর গর্ব্ব, নারীর শালীনতা, সব চেয়ে বেশী রমণীজাতির সতীত্ব গৌরব পর্য্যন্ত ঘৃণায় লজ্জায় সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ত. কেন তা'কেই মনে করে এই অনর্থটা যে ঘটালাম তা'ত জানি নে! তার মত পিশাচের নাম যে-কোন রমণীর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হ'বার যোগ্য নয় সে আমি জান্‌তাম্!—যদি আনমনে কোনদিন দুঃস্বপ্নের মত তার চেহারাটা, তার চেয়ে তার কদাকার কাজটা আমার মনে উঠ্‌ত আমি আতঙ্কে শিউরে উঠতাম। সেই নামটাই করে বসলাম তাঁর কাছে, যাঁর সামনে

হৃদয়ের গোপনতম প্রদেশের একটা গূঢ় ইচ্ছাই প্রকাশ করবার জন্যে কত পল কত অনুপল, কত দিন কত রাত্রি, কত নিদ্রা জাগরণের মধ্যে আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় সজীব হয়ে থাকত! কতদিন তাঁর মুখের দিকে চাইতে চাইতে বিভোর হ'য়ে সেই কথাটাই বল্‌তে প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, কত রাত্রি স্বপনে সে কথা কত জোরে তাঁকে শুনাতে বুক ফেটে মরেচি, তবু পারি নি। কেন পারি নি, তাও জানি নি। এবং যত-না পেরিচি ততই ক্ষোভ বেড়েছে, —নিজের অক্ষমতা নিজেকেই জ্বালিয়ে দিয়েচে। জল্‌তে জল্‌তে ব্যর্থ অভিমানের জ্বালায় তাঁর বিরুদ্ধতা করতে কত চেষ্টাই না ক'রেচি, আবার যেই দেখ্‌লাম সে আগুনের ঝাঁজ এতটুকুও তাঁর গায়ে লেগেছে, অমনি চোখের জল ঢেলে, কপালের রক্ত গেলে দিয়ে নিবিয়ে দেবার জন্যে ছট ফট ক'রে মরতে গেলাম।

কোন্ আঘাতের যে এত যন্ত্রনা, তা ত আমি জানি নে। মাথাটা আমার বেশই কেটেছিল—খুবলাল কোত্থেকে বটের আঠা এনে লাগিয়ে দিতে, যন্ত্রণা একটু কমেছিল, আবার দু'চার মিনিট না কাটতেই মাথাটা দপ দপ্ করে উঠ্‌ল। ছট্‌ফট্ করছি, খুবলাল আবার খানিকটে আঠা লাগিয়ে দিতে এল। আমি তাকে চলে যেতে বলে দিলাম। সে বল্‌তে বল্‌তে গেল এর চেয়ে বড়িয়া দাওয়াই আর নেই। কথাটা তার খুব ঠিক রক্তস্রাবে মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছিল—বটের আঠায় তা শান্ত হ'য়েছিল কিন্তু যে যন্ত্রণা আমার বুকথেকে মাথা পর্য্যন্ত কেটে কেটে উঠ্‌ছে—তার কি কোন প্রলেপই ছিল ভূভারতে!

তাঁকে গাড়ীতে উঠ্‌তে দেখ্‌লাম, গাড়ী ছুটে যেতেই আমার মনও

সেই দীপ্ত মধ্যাহ্নের রৌদ্র ঝলকিত পথেই ছুটে যেতে চাইলে ; চুড়ি চাই হেঁকে দাড়ীওয়ালা, একটা লোক বল্লে—চুড়ী চাই ? থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রঙ্গরহস্য অসহ্য।

এক-খানা বেতো ঘোড়ার গাড়ী এসে থাম্‌তেই আমি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এ-গাড়ীতে যে ফুলীই এসেচে তার আর সন্দেহ নেই এই ভেবেই আমার ভাবনা আর রইল না।

ফুলী নেমে ভাড়া দিলে, মুচ্‌কি হেসে বল্লে—এইচি ভাই!

উপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে গাইতে লাগল—

এয়েচি সজনী, এয়েচি আবার,
এনেচি পরাণ ফিরায়ে আমার—
তব মধুময় পাশে গো।...

তিক্ত ওষুধও রোগী খেতে চায় এক-এক সময়, আমার সেই অবস্থা হল, বল্লাম—গানটা গাও আগে!

হারমোনিয়মে চল, নৈলে আর কি গাইব ?

হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইতে দিতে আমার ইচ্ছা হ'ল না। আমি বল্লাম—অমনিই গাও।

ফুলী বল্লে—পাড়ায় গোল আছে না কি ?

কিছু না। আমি ত এখানে বেশ শান্তই আছি।

ফুলী হয়ত আমার কথাটি বুঝেছিল, আর কথা না বলে উঁ উঁ করে গাইলে— এয়েচে সজনী এয়েচে আবার—

হেরগো বসন্ত দুয়ারে তোমার,

প্রাণ বিনিময় আশে গো।

ধরনী হাসিছে জোছনা-কিরণে

তটিনী ধাইছে সাগর সঙ্গমে

তুমি কেন ভাস নিরাশে গো!

একি মান সখী, তোমাতে নিরখি,

অথবা একি-এ দেখিছ এ পরখি—

বাঁধা যে চরণে,

জীবনে মরণে,

নূপুরের ফাঁসে গো।

গান থামাইয়া বলিল - শুনলে! কেমন লাগল।—বলিয়াই গাহিল

শুনিতে শ্রীমুখে, হৃদে বহু আশা জাগে···

কালো এ অঙ্গ প্রিয়ে জাগে কত রাগে

ভালবাসি বল ভালো বেসে।···গো।

আমি বল্লাম – কত গান তুমি জান?

ফুলী বল্লে—একহাজার তিনশো তিপ্পান্ন।···সে হাস্‌ছিল।

এত?

এত···তব নাম সখী, লক্ষবার বলি······

আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লাম—তুমি কি খুব সুখী।—বলেই আমার ভয় হ'য়েছিল, এ রাগ না করে!

ফুলী হেসে বল্লে—মন্দ কি, বেশ আছি।...কৈ সেন কৈ তোমার?

আমার কাণ যেন জুড়িয়ে গেল। একবার আমার কাণের অসুখ হ'য়েছিল বোর্ডিংএ, মিস্ মন্দাকিনী কি একটা তেল গরম করিয়ে কানে ঢেলে দিয়েছিলেন, সেদিনও এমন জুড়িয়েছিল।

বল্লাম—তিনি আসেন নি, বোধ হয় আ-আসবেন না।

ফুলী সবিস্ময়ে বলে উঠ্ল—আসবেন না? বেশ যাহোক! আমি কোথায় এই খাতাটি মশাই, ঘাড়ে করে আসছি আর বড় লোকের দরজায় এসে দেখলাম—নট্ এ্যাট্ হোম।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় আবার দেখ্লে নট্ এট্ হোম!

দেখেছি গো দেখেছি। কলেজেই না হয় না পড়িছি, তা বলে আমরাও ত মানুষ, আর রূপযৌবনও ত একটু আধটু আছে ..

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম, থিয়েটারের মেয়ে বলে' সে কি রমণীত্বই ত্যাগ করেছে একেবারে! নিজের রূপের গর্ব্ব সে করলে কেমন করে! আর তাও আবার আমার সামনে! নিজের মুখে জাঁক করব না, সে আর এ!

ফুলী বল্লে—তুমি অবাক হ'য়ে গেলে নাকি কথাটা শুনে?

বল্লাম, না, একটু পরে আবার বল্লে—

রূপ নহে চিরস্থায়ী,
রবে তব আজ্ঞাবাহি

সে যে রজনী কুসুম
প্রভাতে ভাঙ্গিতে ঘুম,

অরুণ কিরণে

উন্মুখ মরণে—

পাপড়িটি পড়ে খসি—

এ রূপ তব নহে চিরস্থায়ী।

এ আমার নিজের লেখা গান।

এতক্ষণ আমার ধারণা অন্য রকমের ছিল। সে যে নাটক রচয়িত্রী তাতে গান নিশ্চয়ই দিয়েচে, সন্দেহ নেই, কিন্তু সে যে নিজের ঢাকই পিটে বেড়াচ্চে ঘাড়ে করে তা ত জানিনে। বল্লাম, এ গানটার তোমার মানে কি ?

সে হেসে বল্লে—গাণের আবার মানে!

আমি বল্লাম—মানে থাকে না ?

সে একটুখানি ভেবে বল্লে—থাকে হয় ত একটু ..বলেই গাইলে –

সখি দু'দিনের তরে—

রেখ বেঁধে হৃদি তারে।

আপনি নিভিলে হায়!

ক্ষোভ এ থেকে যায়,

হ'ল নাক দীর্ঘস্থায়ী!

বুঝলে ? তাই আমি তা'কে গর্ব্ব করে' জাগিয়ে রাখ্‌তে চাই। নইলে যে বুড়ো হ'য়ে যাব ভাই।

তাঁর এ কথাটিও আমি বুঝলাম না যে কিসের তরে যৌবনের গর্ব্ব সে জাগিয়ে রাখ্‌তে চায়! কে যে তার যৌবন পদমূলে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আছে, তা ত আমি জানিনে। হঠাৎ আমার মনে হ'ল—এ

দিশেহারা

হয়ত তার সত্য সন্ধানই পেয়েচে, তাই তার জীবন ধন্য হ'য়ে গেচে! এ-সব না-কি বহুদিনের পরের লেখা তাইতে বল্‌তে পারচি যে আমারও ইচ্ছা হ'য়েছিল, তার পায়ে ধরে মন্ত্রটা আমিও শিখে নিই!

খাতার পাতা উল্টোতে উল্টোতে বল্লে - তবে আর কি হবে! একটু পরেই দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল, আমি বল্লাম—এখ্‌নি চল্লে।

আর কি করব বল! তুমি ত আর শুন্‌বে না!

আমি পরিহাসের সুরে বল্লাম—কেন বুঝতে পারব না?

সে বল্লে—এ-কি পাঠ্‌কেল ছুড়লে ভাই? স্বরটা তেমন প্রফুল্ল নয়। হাসি তার মুখে লেগেই আছে, শান্ত চোখের দৃষ্টিট পর্য্যন্ত যেন বাতাসে পাতার মত কাঁপে। এই একযোড়া চোখ—তার জুড়ি আর দেখলাম না এজীবনে, কেবল একটি জায়গা ছাড়া! সে আমার মনের পাতায়! এই চোখেরই ছায়া মনের চিক্কণ পাতায় প্রতিবিম্বিতে হ'ত!

এই তার ব্যতিক্রম দেখ্‌লাম।

সে বল্লে—কাল থিয়েটারে যাচ্ছ ত?...ওরে অ-খুকলাল না-কি বাপ, একটা গাড়ী ডাক ত! এ রত্নটি কোত্থেকে আমদানি করলি ভাই? কাল থিয়েটারে যাবার সময় নিয়ে যাস্—কালকে একবার গেছল, থিয়েটারের সবাই হেসে লুঠোপুটি খেয়েছিল। আজও আমার তুপুর বেলা রিহার্স্যাল ছিল কি-না সবাই ওর খোঁজ করতে লাগল। এ-কি ভাই প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা করে পেয়েছ?—বলে আবার সে মুচকে মুচকে হাসতে লাগল।

আমি বল্লাম—সেনের চাকর।

ফুলী হাসতে হাসতে বল্লে—তা এ কাণা গরু বামুনকে দান করে' সেন কি স্বর্গ কামনা করে' বসে আছেন ?

তার হাসিটা সব সময়েই ছিল উপভোগের। আমার এ পোড়া মনের কত গ্লানি না কতবার উঠেছে, তার হাসিতে তখনি বিদূরিত হ'য়েচে।

খুবলাল হাঁকলে—গাড়ী আয়া হ্যায়।

ফুলী আমার হাত ধরে' বল্লে—চল্লাম। কাল দেখা হ'বে আবার।

আসবে ?

কেন—থিয়েটারে। সাইড বক্সই করিয়ে দিয়েচি তোমাদের জন্যে, সেখানেই দেখা হ'বে।

থিয়েটারে যাওয়ার আমার ঠিক নেই।

ফুলী হাসি গোপন করে' গাইলে—এত মান সাজে না সখী তোমার রে।

কি ভাই, কথায় কথায় গান—আমার ভালো লাগে না।

ফুলী হেসে ফেল্লে, বল্লে—তা ত লাগবেই না। "মানিনি করেছে মান—"

আবার।

আচ্ছা আর নয়, চল্লাম। যাও যদি দেখা হ'বেই-খন।—বলে সে নীচে নেমে গেল। আমি তাকে তুলে দিতে এলাম। সে গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে বল্লে—আচ্ছা তিনি কি আসবেন না ? বইটা শোনানো হ'ল না !

আমি বল্লাম, আর একদিন হ'বে—তার আর কি !

সে গাড়ীতে উঠে চলে গেল। আমি উপুরে এসে নিজের ঘরটিতে বসলাম। থিয়েটারের কথাটাই বারবার আমার মনে চলাফেরা করতে লাগল। তার কোন স্থিরতা না থাকলেও আমার মন বলতে লাগল যে আমাকে যেতেই হ'বে। কিন্তু যে আমাকে নিয়ে যাবে, সে যদি না আসে! সে ত বলে গেছে—আসবে না, দিব্যেশকে না পেলে।

এ-কিঁ প্রতারণা করেচি আমি নিজের সঙ্গে। দিব্যেশের কথা মরতে আনি কেন তুলেছিলাম, তা'কে ত আমাব কোন দরকাই ছিল না; সে নামটা আমার অজ্ঞাতসারেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছ্ল, নইলে তার নাম করব কেন আমি! সে ভুলটা নিশ্চয়ই খুব বড় নয়, কিন্তু সেন যে সেটির সংশোধন করতেই চলে গেছেন, আমি ত তাঁকে মানা করতে পারি নি—এ শাস্তির কি আমার শেষ আছে?

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সহ্যের সীমা আছে।

যদিও সেন বলে চলে গেছেন, দিব্যেশকে না নিয়ে তিনি ফিরছেন না, আমি ভাবতে লাগলাম. কোথায় তার দেখা পাবেন তিনি! সে যে কোথায় অন্তর্ধান হ'য়েছে কে জানে! কোন দেশেই কোন কালেই তার দেখা যেন তিনি পাবেন না, এ ত শুধু বিশ্বাস নয়, আমি এই কামনা করতে লাগলাম! সে যেন হিমালয় গহ্বরেও আত্মগোপন করে, জনসমাজে তার না দেখা দেওয়া উচিৎ—এই ভেবেই আমার

মনে হচ্ছিল, নিরাশ হ'য়ে খবরটিও তিনি আমাকে দিতে আস্‌বেন। কিন্তু সারাদিন মোটর গাড়ীর ভেঁপু শুনতে কর্ণ বধির হ'য়ে গেল, এ বাড়ীর দরজায় কারু ভেঁপুই বাজল না। পরহিতাকাঙ্খা বরাবরই সেনের মধ্যে প্রবল দেখেছি—তাতে এমন বিতৃষ্ণা কোন দিন জন্মায় নি আমার —এখন যেমন হ'তে লাগ্‌ল। হিতচেষ্টার ছলেই যে তিনি আমার অহিত টেনে আন্‌ছেন—যদি এটাও তাঁতে বুঝিয়ে দিতে পারতাম, হায়! হয়ত কোন গোলই হ'তে পারত না, কিন্তু এখন প্রহর অতীত তা'র!

সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, সেন এলেন না। আমি খুবলালকে গাড়ী ডাকতে বলে দিলাম! সে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যেতে হ'বে?

তোর বাবুর বাড়ী—

সে চলে যেতে উদ্যত দেখে আমি আবার বল্লাম—না, না—এলোকেশী থিয়েটারে!

আচ্ছা বলে সে চলে গেল। আমি কাপড় চোপড় পরে নিলাম, জুতো পরব কি-না ভাবছি, খুবলাল গাড়ী হাজির করলে! থাক্‌গে জুতো—বলে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে এতটুকু জানাশুনা ছিল না আমার, তার সামনে এসে গাড়ী দাঁড়াতেই গাড়োয়ান দরজা খুলে দিলে। আমি নেমে একটি লোককে জিজ্ঞাসা করলাম—বক্স কোন দিকে?

সে লোকটি টিকিট বেচছিল, তার অদূরে এক স্থূলাঙ্গী রমণী দাঁড়িয়ে আমারই আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছে—তার দিকে চেয়ে বল্লে—কাদু, এঁকে বক্সে পৌঁছে দিয়ে এস।

কানু অন্য একটা সিঁড়ি দিয়ে আমাকে আন্‌তে আন্‌তে জিজ্ঞাসা করলে—কোন্ বক্স চাই ?

আমি বল্লাম—রিজার্ভ আছে।

কানু বিস্মিত হ'য়েছিল, তার সন্দেহ নেই, একটু পরেই বল্লে—ঐ বাবুটিকে নাম বলুন—উনি দেখিয়ে দিবেন।

আমি সেনের নাম বল্লাম। পাঞ্জাবী গায়ে কৃশকায় ব্যাক্তি হাতের সিগারেটটি ফেলে দিয়ে বল্লে—আসুন।

একেবারে শেষে একটা গদি মোড়া যায়গায় সে আমাকে এনে বসিয়ে চলে গেল। তখনও অভিনয় আরম্ভ হয় নি, কনসার্ট বাজছিল। আমি একবার চতুর্দ্দিকে চেয়ে দেখে নিলাম। কত লোক যে এসেচে তার যেন সংখ্যাই নেই। তবু আন্দাজ কত হো'তে পারে—দেখছি—হঠাৎ মনে হ'ল—সেই অগণিত চোখের অপলক দৃষ্টি আর কিছুতেই বদ্ধ নেই—সুতীক্ষ্ণ বাণের মতই আমাকে বিদ্ধ করচে। চকিতে মুখ সরিয়ে নিলাম।

আমার ঠিক সামনে তিনটি সুদর্শন যুবক বসে হাস্যালাপ করছিলেন—আর মাঝে মাঝে এদিকে দৃষ্টিক্ষেপেও কার্পণ্য করছিলেন না, পলকে বিস্বাদে আমার মনে হ'তে লাগল—থিয়েটার যেন আর কেউ দেখবে না। একবার—একমুহূর্ত্তের জন্য শতরূপে শত মূর্ত্তিতে প্রকাশ পেতে চেয়েছিলাম কিন্তু তখনি চিত্ত অবশ হ'য়ে গেল যে এ-কি অভদ্রতা !

কোন দিকে চাইব না ভেবে ঘাড় নীচু করে বসে রইলাম। কিন্তু কি দেখ্‌তে যে চোখ্ আমার ঠেলে ঠেলে উঠ্‌তে লাগল, তা ত জানিনে আমি। ড্রপ উঠ্‌তেই প্রথম নজর পড়ল, সামনের সেই বক্‌সটায় !

এদেশের প্রতি মায়া মমতা সত্যিকারের ছিল না কোনদিন কিন্তু গ্রীকসম্রাটের মুখে এই সোনার ভারতবর্ষের এমন একটা ছবি সজীব হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ল আমার মানসপটে, যা একেবারে অপূর্ব্ব সুন্দর! ভূগোল-ইতিহাস ছাড়া ভারতবর্ষের পরিচয় আমি রবিবাবুর গোরায় দেখেছিলাম। একদিন আমার দেশের সেই স্বরূপ মূর্ত্তিতে আমার মন প্রাণ ভরে গেছল, কিন্তু তার পরই নানা আবর্ত্তনে পড়ে ভারতবর্ষ, জন্মভূমি কোথায় ভেসে গেছল আমার মনের থেকে. আজ আবার সেই ছাইচাপা আগুণ পুনঃ প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

বল্‌তে লজ্জা নেই, একদিন বাঙ্গালীর ছেলের ইংরেজী বেশ আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল; কলেজে থাকৃতে একদিন ভেবেছি, এই আমি—চাই। ধুতি চাদর কেবলমাত্র দরিদ্রের পোষাক, অনেক মেয়ের সে কাম্য হ'তে পারে, আমার নয়। আজ এও আমাকে স্বীকার কর্ত্তে হ'ল যে এই দরিদ্র বেশই আমাদের দেশের সনাতন বেশ। তার ধুতি-চাদরে যে শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে আছে, আমার চোখে কোন দেশের কোন পোষাকই তার চেয়ে গৌরবের বলে মনে হল না। সামনের বক্‌সে তিনটি যুবক বসেছিলেন। দু'জনের অঙ্গে সুন্দর বিলিতি পোযাক, আর একজনের শুদ্ধ ধুতি, একটা জামা আর একখানা শুভ্র উত্তরীয়। নিবিড় বনে সেই ধুতিচাদর যেন একঝাড় মল্লিকের মত ফুটে উঠেছিল।

ড্রপ পড়েগেছে, কনসার্ট বাজছে, সেন এসে দাঁড়ালেন। হর্ষোল্লাসে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গেছল, আমি একটি কথাতেও তাঁকে অভ্যর্থনা করতে পারলাম না। সেন ছড়িটি গদির 'পরে ফেলে বল্লেন—শকুন্তলার সঙ্গে দেখা হ'য়েচে?

না।

কিছু খাবেন ?

আমায় ক্ষুধা পেয়েছিল, কিন্তু মুখে সে কথা বলা চলে না, আমি ঘাড় নাড়লাম। সেন বল্লেন—খেয়ে এসেছিলেন ?

আবার আমি ঘাড় নাড়লাম।

সেন বল্লেন—ঘাড়ইত নাড়ছেন, কথাটা কি তাই খুলে বলুন-না !

আমি তাঁর মুখের পানে চেয়ে দেখলাম, রাগের লক্ষণ তা'তে নেই। বল্লাম—খাব না।

সেন হেসে বল্লেন—খেয়েও আসেন নি, খাবেন-ও না। বেশ মজা ত! হা হা!

তাঁর হাসিমুখ অসহ্য ভেবেই সামনের বকুলের দিকে চোখ পড়ে গেল, তখনি দৃষ্টি নত হ'য়ে ফিরে এল। সেন বল্লেন—প্রাণধনকে এমন বিব্রত করেছেন কেন বলুন ত ?

কা'কে ?

আমার সরকার প্রণধনকে ! সে বেচারা আজ হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বল্লে—আপনি পালিয়েছেন।

পালিয়েচি ?

তাই ত বল্লে সে !

পালাব কেন ?

আমিও ত তাই ভাবছি। কি ব্যাপার—বলুন ত !

বল্‌তে পারলাম না. কি-আর বল্‌ব ! প্রাণধন ত একা নয়—অভিযোগ করতে হ'লে কেউ বাদ যায় না !

একমিনিট পরে জিজ্ঞাসা করলাম—আর কি বল্লে প্রাণধন ?

কাশীতে সে দিব্যেশকে দেখেছে। তাই আবার আমি তা'কে পাঠিয়ে দিলাম, দিব্যেশকে খুঁজে আন্‌তে!

সেন থামলেন, পকেট থেকে সিগারেটের কেস্‌টি বের করে' বল্লেন—আপনার বাড়ী গেছলাম, আপনি থিয়েটারে এসেছেন শুনে—এখানেই আস্‌ছি। ইউ বেয়ারা··তোম্ ভিতর যানে সক্তো?

জি হুজুর, বলে বেয়ারা পাখা থামিয়ে সেলাম করলে!

সেন তাকে বল্লেন যাও, ভিতরমে ফুলী বিবিকে সেলাম দেও।

আমি আড়ষ্টের মত বসে রইলাম। সেন বল্লেন—প্রথম দৃশ্যেই দেখেছিলেন তা'কে?

দেখিনি· বলে আমি স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। সত্যিই আমি দেখিনি—তখন ভারতবর্ষ, তার সনাতন বেশভূষা, সামনের বক্‌সের ধুতি চাদরই ভাবছিলাম আমি! ভাবনা যেন ধোঁয়া হ'য়ে আমার চোখ্‌কে দূরের জিনিষ থেকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল!

সেন বল্লেন—দেখেননি কি বল্‌ছেন? ফুলী নামেনি হেলেন সেজে! ঐ যে, ঐ যে—বলেই তিনি কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। আমি তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম—রং চঙে বেশভূষায় সুসজ্জিতা ফুলী দাঁড়িয়ে হাস্‌চে।

বেয়ারাটাও ফিরে এল, একটুকরা কাগজ সেনের হাতে দিয়ে পাখা দোলাতে লাগল। সেন চিঠিটা পড়ে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—ভিতরে আস্‌বেন? চলুন-না···দেখেই আসি।

ফুলীর সঙ্গে আলাপ হওয়া থেকেই তার জীবনটিকে এমন স্নেহের চোখে আমি দেখেছিলাম যে, থিয়েটারের ভিতরে ঢুকতেও আমার

আপত্য ছিল না, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সেন আগ্রহ প্রকাশ করলেন, আমার মন বিমুখ হ'য়ে উঠ্‌লো।

আমি বল্লাম—থাক্!

সেন বল্লেন—তবে বস্থন-আপনি,—আমি দেখা করে' আসি।... তিনি দাঁড়িয়ে উঠ্‌তেই বল্লাম—দাঁড়ান, আমিও যাব।

সেন আমাকে সঙ্গে করে নীচে নেমে গেলেন। একটা ছোট দরজার কাছে আস্‌তেই কে-একজন লোক বেয়ারাটাকে জিজ্ঞাসা করলে—কোথারে ভজা?

ফুলী বিবি ডেকে পাঠিয়েছে—বলে সে ভেতরে ঢুকে গেল।

একমিনিট পরেই ফুলী এসে বল্লে—ত্বামাভিবাদয়ে।

সেন বল্লেন—নমস্কার।

আমি কিছুই বল্‌তে পারলাম না।

ফুলী আমাকে লক্ষ্য করে বলে উঠ্‌ল—এ ভাই তোমার অন্যায়। গ্রীক্ রাজকন্যা, ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞী, মগধের দেবস্তুত মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মহিষী হেলেনকে তুমি অভিবাদন পর্য্যন্ত করলে না!

আমি উত্তর দেব কি! কোথা থেকে উন্মুখ মুখ চোখ্ আমাকে গ্রাস করতে আস্‌ছিল। ফুলী বল্লে—আলাপ করবে ছায়ার সঙ্গে?

আমি বল্লাম—না।

সেন বল্লেন—আমার ভারি অপরাধ হ'য়ে গেছে, আপনার বক্তি শোনবার কথা ছিল কাল, কিন্তু আমি তা ভুলেই এঁর ওখান থেকে চলে এসেছিলাম। আপনি এসেছিলেন পরে শুনলাম।

আমি তাঁকে কোন কথাই বলিনি, কিন্তু ফুলী বোধ হয় মনে করলে যে আমিই বলেছি, হেসে বল্লে—খুব লাগিয়েছ বুঝি ?

আমি কেন লাগাতে যাব—বলে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

সেন বল্লেন—না, না উনি কিছুই বলেন নি. আমি একটু আগে ওঁর বাড়ী গেছলাম, সেই খানেই খুবলালের কাছে শুনে এসেছি।

একটু থেমে আবার বল্লেন—তা' আর একদিন কি সুবিধে হ'বে আপনার ?

ফুলী আমার পানে চেয়ে বল্লে—কি বল ?

আমি বল্লাম—আমি কি জানি ?

ফুলী নিম্নস্বরে বল্লে—আপনার সুবিধে হ'লেই হল। কিন্তু কোথায়......

কেন আপনার বাড়ী,—আমি যাব। তবে আপনার ঠিকানা ত জানিনে আমি।

ফুলী বল্লে—কাছেই. মধু চক্রবর্ত্তীর গলি ২নং।

কখন আসব, বলুন ?

দুপুরবেলা হ'লেই সুবিধে হয়। সন্ধ্যে থেকেই ত আমার আবার থিয়েটার কি-না—বলে সে মুখখানি বিষণ্ণ করে' শান্ত স্নিগ্ধ চোখদুটি আমার মুখের 'পরে স্থাপিত করলে।

আমার সেখানে দাঁড়াতে একটুকু প্রবৃত্তি ছিল না আর! স্নায়ু অবশ হ'য়ে গেলে যেমন ইচ্ছাসত্ত্বেও কাজ করা চলে না, আমিও নড়তে পারলাম না।

সেন বল্লেন—বেশ, কাল দুপুরবেলা যাব। কেমন?

আমি দেখ্‌তে পেলাম, ফুলীর চোখের সে উজ্জ্বল চাহনি, তার মুখের সে উৎফুল্লতা!

সে বল্লে—আস্‌বেন?

নিশ্চয়ই আসব।

একটি ছ'বছরের মেয়ে এসে তার হাত ধরে বল্লে—হ'ল?

ফুলী আমাদের নমস্কার করে বলে উঠ্‌লো—চল্লাম, আমার আবার পার্ট আছে এখনি।

সে ভেতরে ঢুকে গেল। একটি মেয়ে পোষাক পরে তামাক খাচ্ছিল, সে জিজ্ঞাসা করলে—কে গো?

উত্তরটা আমি শুন্‌তে পেলাম না। বেরিয়ে এসে সেনকে বল্লাম—আপনার গাড়ী আছে?

সেন বল্লেন—কেন? আর দেখবেন না?

না। যদি আপনার গাড়ী থাকে······

সেন বল্লেন—তা কি হয়? বন্ধুর পার্টটা দেখে যান।

আমি বল্লাম—সে আপনি দেখুন।

সেন আমার পানে চেয়ে সবিস্ময়ে বল্লেন—আপনার হঠাৎ এত অরুচি হ'ল কিসে? ভেতরটা দেখে বুঝি?

যেখান দিয়ে আমরা চলেছি, হঠাৎ যেন আলো আলোময় হ'য়ে গেলো, আর অনেক লোক চলাফেরা কর্‌ছিল—আমি কথা বলতে পার্‌লাম না। কোন গতিকে আলো এড়িয়ে দ্বিতলের সিঁড়ির সামনে এসে বল্লাম—গাড়ী······

চলুন—বলে সেন পথে এসে দাঁড়ালেন। শিশ্ দিয়ে কাকে ডাকতেই ভক্ ভক্ করতে করতে একখানা মোটর থামল এসে।

সেন বল্লেন—উঠে পড়ুন।—তাঁর সোফেয়ার দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল, আমি উঠে পড়ে বল্লাম—আপনি থাকবেন বুঝি?

নিশ্চয়ই—তিনি দরজাটি বন্ধ করে দিলেন, গাড়ীর দরজায় হাতটি রেখে বল্লেন—একটা কথা বলব?

কি?

আমার দরওয়ানকে না রাখেন, না-ই রাখুন,—একটা মোদ্দা লোক রেখে দিন। খুবলালের ওপর ভরসা করে থাকাটা বেশ সঙ্গত নয়। বুঝলেন? বলেন ত আমি একটা লোক দেখে শুনে পাঠিয়ে দিতে পারি।

না-ই না থাকল দরওয়ান?

সেটা ঠিক নয়, ছেলেমানুষ একলা থাকেন, তার ওপর কিঞ্চিৎ আছে। ঐ কিঞ্চিৎ যদি না থাকত, ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ঐ 'কিন্তুর' জন্যেই নিজের প্রাণটি বিপন্ন করে বসে আছেন, আপনি! সামান্য বিশ পঁচিশটে টাকার জন্যে……

টাকার জন্যে নয়। আমি ওখানে থাকব না।

কোথা যাবেন? হরিদ্বার না কাশী?

আমি আরক্ত মুখে বলে উঠলাম—বোর্ডিংএ।

থিয়েটারের বারান্দা ঘেরা আলোর মালা জ্বলছিল, তারই আলোকে যা দেখেছিলাম, কি বলব আর! যেন নিমিষে শত সূর্য্যের রশ্মি পড়ে তাঁর মুখখানাকে উদ্দীপ্ত করে ফেললে!

তা দেখেই আমি বল্লাম—নমস্কার !

সেন বল্লেন—ন-ম-স্কা-র।

বল্লাম—প্লে আরম্ভ হ'য়ে গেচে।

সেন আবার হাত ছ'টি তুলে বল্লেন—নমস্কার !

নমস্কার করে তিনি চলে যেতেই গাড়ী দৌড়তে লাগ্‌ল।

বোধ হয় তিনি চার মিনিটের ভেতরই গাড়ী আমার ভগ্ন গৃহের সামনে এসে দাঁড়াল, সোফেয়ার কড়া নাড়তেই খুবলাল দরজা খুলে দিলে।

বাড়ীতে আলো ছিল না, তার জন্য নয়, নিজের বাড়ীর পরিচিত সিঁড়িতে উঠ্‌তে কারো বাধে না—কিন্তু আমার পা টলতে লাগ্‌ল। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে খুবলালকে ধমক দিয়ে আলো আন্‌তে বলে দিলাম। অন্ধকারের মধ্যেই চিক্ চিক্ ক'রে চোখের জল মাটিতে টপ্ টপ ক'রে পড়ল।

সারাদিন কেটে গেল, সেন এলেন না। আশা নিরাশার মধ্যে ডুবে ডুবে এই ভেবে আমি হাঁফ ছাড়ছিলাম যে. ফুলার বহি শুনে তিনি অন্ততঃ একটি বারও আসবেন। কিন্তু তিনি এলেন না—ফুলীর বাড়ীর আবাহনটা মোটেই আমার ভালো লাগে নি। আমি অনেক আগেই বলেছি যে আমার মনের চাওয়া না চাওয়ার অন্ত পাই নি কোনদিন। কখন যে সে কি চায়,—তার ঠিক নেই। ফুলীকে আমি ভালবেসেছিলাম, —তার শান্ত চোখের চাহনি আমাকে মোহাবিষ্ট করেছিল বলেই বুঝি সেনকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করাটা আমার পসন্দ হয় নি। এ-যে কেবলমাত্র বহি শোনানো, তা নয়—এরতলে একটা গূঢ় অভিসন্ধি আছে বলেই

মনে হ'তে লাগল। সে অভিসন্ধির আভাষ আমি পেয়েছিলাম থিয়েটারে। সে-যে কতবার তা আর কি বল্‌ব। কোন্ এক রাজ-সভায় নটিরা রাজাকে তুষ্ট করতে গান গাইছে, নাচছে—কিন্তু সে-সব প্যাখম ধরা ময়ুরের মত তা'দের নজর রয়েছে বক্সে! যখন আমরা ভিতরে গিয়েছিলাম, তখন সেইসব মেয়েরা যে সেন-কেই দেখ্‌ছিল সে ত আমি নিজের চোখেই দেখেছি। সেই সমস্ত রংমাখা পরীদের মধ্যে ফুলী ছিল না বটে কিন্তু এ ত সেই জাতেরই জাত!

তার পরদিনও সেন এলেন না। ফুলীর বাড়ীর নেত্যকে ত আমি ভুলি নি,—শেষ দিনে দিব্যেশকে খাতির যত্ন করতে যা দেখেছি, সেন যে তার চেয়ে বেশী করেই পাবেন সেখানে, সে সন্দেহও ছিল না আমার! তাই থেকেই আমি বুঝতে পার্‌লাম যে-সে ব্যুহ ভেদ করা সেনের পক্ষে শুধুই কঠিন নয়, একেবারেই অসম্ভব।

সন্ধ্যে হ'তেই গাড়ী আনিয়ে খুবলালকে ক্যোচবক্সে বসিয়ে আমি সেনের বাড়ীর দিকে চল্লাম। খুবলাল প্রথমটা বিড বিড় ক'রে আপত্তিই জানিয়েছিল, কিন্তু তা'তে আমি কানই দিই নি। গাড়ী যতই অগ্রসর হ'তে লাগল, ভয়ে ভাবনায় আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হ'য়ে আস্‌ছিল, সেনের বাড়ীর সম্বন্ধে প্রাণধনের কাছে যা শুনেছি, যদি সত্য হয় তার মা'র সম্মুখীন হ'তে কিছুতেই সাহস হ'চ্ছিল না।

আমার মন যে পরিমাণে পেছিয়ে যাচ্ছিল, গাড়ী তার চেয়েও দ্রুততর-বেগে এগিয়ে চলেছিল। মস্ত বাড়ীর ফটকের ভেতর ঢুক্‌তেই আমি চেঁচিয়ে বল্‌তে গেলাম, যে গাড়ী ফিরিয়ে নেওয়া হোক—গলা দিয়ে কথা বেরুল না।

একটু পরে খুবলাল গাড়ীর জানেলার ফাঁক দিয়ে বল্লে—বাবু বাড়ী নেই, মা আপনাকে সেলাম জানাচ্ছেন।

চট্ করে' ভেবে নিলাম—কি কৈফিয়ৎ আমি দেব, তাঁর মাকে? বল্‌ব, কালই বোর্ডিঙে যাচ্ছি, তাই একবার দেখা করতে এসেছিলাম!

মা! সেনের মা! প্রাণধন তাঁর যে বর্ণনা করেছে—তা'তে ত আমার আদৌ ভরসা হয় না। আমি বল্লাম—কে?

তখনি কে স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্লে—নেমে আসুন।

এস্বর যার হৌক, সেনের মা'র নয়—এ কোন তরুণীর স্বর।

নামতেই সে এসে আমার হাত ধরলে! রূপ যেন তার উছলে পড়ছে, সিল্কের শাড়ীর ভেতর থেকে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত রক্তাভ হাতটি বার করে' আমার হাত ধরে বল্লে—কোথা থেকে আসা হ'য়েছে?

আমার মনে হচ্ছিল, যদি ঐ বড় বাতিটা নিভে যেত, তবেই আমি নড়েচড়ে সাড়া দিতে পারতাম। সে আলোও নিভল না, আমিও উত্তর দিতে পারলাম না।

উপরের একটা ঘরে বসিয়ে মেয়েটি বৈদ্যুতী পাখার কল-চাবিটা নামিয়ে দিয়ে বল্লে—আপনার কোথা থেকে আসা হ'য়েছে?

সেন কি বাড়ী নেই?

এ সময়ে ত তিনি বাড়ী থাকেন না। আপনার নামটি কি বলুন, এলে বল্‌ব।

আপনি তাঁর কে?

কি মনে হয়? ব'লে মৃদু হাস্য করে আবার বল্লে—আপনার নাম-টি?

নাম বল্লাম। আর বল্লাম, স্ত্রী!

দরজার বাইরে থেকে ঝি বল্লে—বৌ মা, খাবার আনব কি?

নিয়ে আয়—বলে মিসেস্ সেন আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—থাবেন কিছু, একটু চা কি আর কিছু? ঝি, দু'পেয়ালা চা আন্‌তে বলে দে।

বলতে গেলাম, চা-র দরকার নেই, মিসেস্ সেন তার আগেই বল্লেন—খাবেন না, এই ত বলতে চান্ আপনি। সে আমি জানি। কিন্তু তা বল্লে ত চলছে না।

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

সে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—আমি ভাই, বাড়ীতে বড় একলা। দিনরাত্ একলা কি মানুষে থাকতে পারে?

জিজ্ঞাসা করলাম কেন—আপনার শ্বাশুড়ী?

আমার শ্বাশুড়ী! তাঁর ছেলে যখন দু'বছরের, তখনি তিনি স্বর্গলাভ করেছেন। আপনাকে কে বল্লে·····

প্রাণধন! আপনাদের কাশীর বাড়ীর সরকার?

ওঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, সে না-কি মঙ্গলবার দিন এসেছিল, তখনি চলে গেছে। তা সে জান্‌বে কোথেকে? সে নতুন লোক, এখানে কখনই আসে নি ত আগে!

আমি আর কথা বল্‌তে পারলাম না। প্রাণধনের গোপন অভিসন্ধি আমি আগেই জান্তে পেরেছিলাম; এখন একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম যে ষাট বছরের বুড়ো প্রাণধন আমাকে নিয়ে কি চমৎকার একটি উপন্যাসের সূচনা করে তুলছিল। তার কাসি থেকে সুরু করে' বাজার করা পর্য্যন্ত

দিশেহারা

সব একেবারে শরতের বর্ষাধৌত আকাশের মত সাফ্ হ'য়ে গেল। আচ্ছা, সে-কি ভেবেছিল! মনের মধ্যে বুঝেও আমি বুঝ্‌তে পারলাম না। একবার ভাবলাম, দিই বলে। আবার মনে হ'ল—থাক। অনিষ্ট সে আমার করতে ত পারে নি। তবে আর বৃদ্ধকে লাঞ্ছিত করিয়ে কি সুখ হ'বে আমার! নিজের ক্ষোভ ত একবিন্দুও কমবে না, বরং ঘাঁটাঘাঁটিতে আরো বিশ্রী হ'য়ে পড়বে!

মিসেস্ সেন বল্লেন—আমার দুঃখ এই যে নিরবচ্ছিন্ন একলা আমাকে বাস করতে হয়!

আমার মুখ চোখ লাল হ'য়ে যে কথাটি জিভে আটকা পড়ে গেল, সেটি এই যে, দিনেরাতে একলা সে কেন থাকে? সেন কি রাত্রেও আসেন না? যদিই না আসেন, সে কবে থেকে?

বল্লেন—আজ আপনাকে পেয়েছি, ইচ্ছে হচ্ছে না যে ছাড়ি।

নিঃশব্দে চেয়ে আমি তার মুখের রেখা গুণে নিচ্ছিলাম। আমাকে সে আদর যত্ন করছে বলে যে আশ্চর্য্য হয়েছি তা নয়—স্বামীর সম্বন্ধে তার নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য, তার ওপর এই অমায়িক মধুর ব্যবহার দেখে এবং পেয়ে আমি যেন কোনমতেই তার নাগাল পাচ্ছিলাম না।

ঝি দু' রেকাবী ভর্ত্তি করে নানাবিধ ফল ও মিষ্টি এনে শ্বেতপাথরের টেবিলটায় রেখে দিলে, বগলের ভেতর থেকে একখানা ডাকের চিঠি বের করে বল্লে—তোমার!

মিসেস্ সেন খামটি ছিঁড়ে চিঠিখানি পড়তে লাগলেন; আমি খামটি উঠিয়ে নিয়ে পড়লাম—শ্রীমতী লীলাবতী দেবী—সাবিত্রী সমানেষু।

বোধ হয় পাঁচছত্রের চিঠি, লীলা সেখানা মুড়ে খামের ভেতর পুরতে পুরতে বল্লে—মা'র চিঠি!

ঝি জিজ্ঞাসা করলে—খবর ভালো বৌ-মা।

হ্যাঁ। যেতে লিখেছেন। কৈ, চা?

দিই পাঠিয়ে বলে ঝি চলে গেল।

আমি বল্লাম, বাপের বাড়ী যাবেন?

লীলা হেসে বল্লে—হ্যাঁ ভাই যাব একবার।—একটু থামল আবার হাসিতে গাল দু'টি ফুলে হেসে উঠল, বল্লে—নামেই যাওয়া, একঘণ্টা, দু'ঘণ্টা। তার বেশী থাকার যো নেই।

কেন? এই ত বল্লেন এখানেও একলা.....

রাত্রে ত আর একলা নই। নিম্নস্বরে এই কথাটা বলেই সে হেসে খাবারের রেকাবি টেনে নিলে! আমাকে বল্লে—নিন্।

এর স্পষ্টবাদিতায় আমি আরো আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। কিন্তু আর প্রশ্ন করতে সাহস হ'ল না।

লীলা বলে—আপনি আমার কাছেও লজ্জা করছেন? আমাদের একই বয়স, রমণী আমরা, লজ্জা কিসের। নিন্—নিন্—শুনচি নে আমি। উঁহু—খেতেই হ'বে আপনাকে ছাড়ছি নে।

আমি বল্লাম, অনেক খেয়েছি।

লীলা বল্লে—অনেক? বলেন কি! তাই ত করলেন কি?—অসুখ হ'বে না ত! আহা!

তার হাসিতে আমারও হাসি এসেছিল, বল্লাম—এর বেশী খেলে অসুখ করবে।

তবে থাক্, আর কাজ নেই। ওরে মিছে, একটা সোডা নিয়ে আয়—ঝট্ করে। কি বলেন?

আমি চুপ করে রইলাম। লীলা তা দেখে আমার বাহু স্পর্শ করে বল্লে—দেখুন, আপনি যদি সব না খান, ভারি রাগ করব আমি। তা বলে' রাখচি।

আমি ভাবলাম, তার রাগে বিশেষ কোন ক্ষতিই আমার নেই—বল্লাম—রাগ করেন, কি আর করচি বলুন।

আপনি কি করবেন, তা জানি নে—আমি কি করব বলতে পারি।

কি করবেন?

ছাড়ব না আপনাকে। আটকে রাত্রে খাইয়ে দাইয়ে তবে পাঠাব। তখন বুঝবেন—সাজাটি কেমন হয়?

এ-ত জানে না যে গৃহের আকর্ষণ আমার কত অল্প। সে হয়ত ভাবছে, তারই মত সংসার আমার! সারাদিনের দুঃখভোগের পর সুখনিশি আমাকে প্রত্যুদ্গমন করতে লজ্জাঞ্চল টেনে সন্ধ্যারাণী নেমে আসছেন! সে তবু রাত্রের জন্য নিশ্চিন্ত! হায়, আমার দিবারাত্রের যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই এ ত তা জানে না।

নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যে একটি ক্ষুদ্র তটিনী যেন বনান্তরাল দিয়ে কুলকুল করে বেয়ে চলেছিল হঠাৎ ঝড়ে যেমন তার কুলুধ্বনি গর্জ্জনে পরিবর্ত্তিত হয়, এর সাজা দেওয়ার কথা শুনে আমার মধ্যেও সুপ্ত চিন্তা হিংস্র হ'য়ে জেগে উঠ্লো।

চাকর চা নিয়ে এল, দুজনের সামনে দু'টি পেয়ালা নামিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল—বাটিটায় নাম লেখা—শ্রীমতী লীলাবতী দেবী।

তার ঘোমটা খোলা মুখ চোখ দীপ্ত হ'য়ে উঠলো, সে বল্লে—বিলেত থেকে করিয়ে আনা হ'য়েচে। খরচ অনেক। তা আর কি হবে বল, আমাদের দেশে ত আর অমন করতে পারে না।

আমি বল্লাম—নাই বা করলে! আমাদের দেশে যে বাটী পাওয়া যায়, চা খাবার পক্ষে সেই যথেষ্ট। তার জন্যে আবার বিলেতে অত পয়সা ঢালার কি দরকার ছিল!

লীলা হেসে বল্লে তুমি বুঝি—আপনি বুঝি—স্বদেশী?

তার মানে?

কার দল, গান্ধী মহারাজের না-কি?

তখন গান্ধী মহারাজের নামই আমি শুনেছিলাম, তাঁর অন্য পরিচয় আমার জানা ছিল না।—অবশ্য পরে জানতে পেরেচি। শুধু জানতে পেরেই নিশ্চিন্ত হই নি, তাঁকে পূজা করেচি। আমাদের দেশের লোক যারা বিলিতি ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তা'দের অন্ধ নেত্র যে এ'তেও খোলে নি, এই আশ্চর্য্য! যা ছাড়তে এই জাত উৎপর, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার হ'য়ে এসেও, তাদের সর্ব্ববিদ্যার অধিকারী হয়েও ইনি তা সাদরে তুলে নিয়েচেন। সে যাক্, তিনি ত আমার জীবনের, এই গল্পের বিষয়ীভূত হন—তাঁর নাম এ কলম দিয়ে লিখেচি ভাবতেও আমার কষ্ট হয়।

বল্লাম—হাস্‌চেন যে! তাঁর নাম শোনেন নি?

লীলা হাসি থামাতে পারলে না, বল্লে—না শুনব যদি বল্লাম কি-করে?

তবে হাস্‌ছেন কেন? বিশ্বাস করেন না?

তাই বা না করব কেন ?

বিশ্বাস করেন, অথচ ভক্তি হয় না আপনার ?

লীলা আমার উষ্ণায় হাসিগন্ধ করলে ; যেন একটু ভেবে জবাব দিলে, ভক্তিও নেই, অভক্তিও নেই ! তাঁর নাম শুনেচি, তিনি যে কত বড় বড় কাজ করচেন তাও জানি, তবে নিজের থেকে কখনই তার স্বাদ পাই নি বলেই হোক. আর বুঝতে অক্ষম বলেই হোক, ভক্তিও আমি করি নে, অশ্রদ্ধাও যে আছে তা'ও নয়।

প্রায় দু'মিনিট পরে আবার বল্লে -এই দেখুন, আপনার সম্বন্ধে আমি আগে থেকেই অনেক কথা শুনেচি, তবু আপনাকে ভালোমন্দ কিছুই আমি মনে করিনি. আজকের আগে। আজ অবশ্য······

বৌমা হাওয়াগাড়ী এসেছে। - তুমি যাবে কি ?—বাইরে থেকে চাকর বাকর কেউ একথা বল্লে। লীলা আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে বল্লে—আচ্ছা, আসছি এখনই। আমার দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বল্লে—একটু বসুন আপনি। আমি দশমিনিটেই আসচি।

আমি বল্লাম—আজ কি ভেবেছেন, বলুন।

লীলাবতী হেসে উঠলো, বল্লে—কি আর ভাবব ?

এই যে বলতে যাচ্ছিলেন, এখনই ভুলে যান নি কখনও।

ভুলি নি, এসে বলচি। তিনি ফিরেচেন, দেখাটা করে আসি।

'তিনি' কে তা বুঝতে পেরেই আমি লীলার হাত ধরে বল্লাম--একটু দাঁড়ান, একটা কথা বলি।

লীলা জিজ্ঞাসা করলে—কি ?

আমাকে এখনি পাঠিয়ে দিতে পারবেন ?

লীলা একমিনিট আমার মুখে নির্নিমেষে চেয়ে বল্লে—পারি।

তবে চলুন। আর একটা কথা, আমি এসেচি—তাঁকে বলবেন না?—আপনার হাতে ধরে—

লীলা হাতটি ছাড়িয়ে নিয়ে বল্লে—দিব্যি দিও না ভাই, রাখতে পারব না। ভারি বদহজমের ধাত আমার—যা থাকে পেটে, কিছু সহ্য হয় না, সব উঠে পড়ে!

আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। আমি যে সেনের আগমনে অধীর হয়েই এমন ব্যস্ততা করে ফেলেচি তা বুঝতে পেরেই লজ্জায় মুখ বোধ করি লাল হ'য়ে উঠেছিল। যা তা একটা কথা বলে লীলার মন থেকে সেটি মুছে দিতেই আমি বল্লাম—তা বলবেন, ক্ষতি নেই।

তা বলব—বলে সে আমার হাত ধরে একটান মারলে। এমনই আচমকা টান দিয়েছিল, যে আমি পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেলাম। সে বল্লে চলুন, আগে আপনাকে কারে তুলে দিয়ে আসি।......সত্যই দেখা করবেন না?

না—বলে আমি চলতে আরম্ভ করে দিলাম।

গাড়ীতে তুলে দিয়ে লীলা অম্লানস্বরে বল্লে—আবার এসো!...আর তোমাকে 'আপনি' বল্‌ব না। অনেকদিন থেকেই আমি তোমাকে জানি, আজ আলাপ হ'য়ে খুব খুসী হলাম। এসো, বুঝলে?

হ্যাঁ-না বলবার আগেই সে পুনরায় বল্লে—দেখেই ত গেলে ভাই, একলা কি কষ্টেই থাকি, তোমার মত একটি সঙ্গী পেলে বর্ত্তে যাব!

শোফেয়র জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় যেতে হ'বে বৌ-মা?

বৌ-মা বল্লে—সেদিন থিয়েটার থেকে আপনিই এঁকে পৌঁছে দিয়ে-ছিলেন না?

ওঃ—তিনি! বলে সে চাকাটা ঘোরাতে লাগল।

গাড়ী থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে লীলা বল্লে—কি বল্‌ব গুড-নাইট না নমস্কার?

নমস্কার।

গাড়ী ফটক পার হ'য়ে গেল।

গ্যাসালোকিত জনবহুল রাজপথে পড়তেই আমার মনে হল, এখনি যেন আমি পোষাক পরে থিয়েটারে অভিনয় করে আস্‌চি। সে বেশভূষা নেই, সে রঙ্গরহস্য নেই, প্রেমের খেলা বা হতাশার লীলা কিছুই নেই, একা আমি, দীননয়নে শুষ্কমুখে ধাবমান মোটরের ভেতর চুপ করে বসে আছি।

বিংশ পরিচ্ছেদ

আশ্চর্য্য বৌ-টি।

রাত্রে বিছানায় পড়ে ভাবতে লাগলাম, তা'কে! যে কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন ধূম গিরির মত আমার সামনে অভ্রভেদী তুঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। সেনের দৃঢ়তা আমি দেখেছি, সে-কেমন-যেন আমার সয়েই গেছলো, লীলার কথা ভাবতে আমার মন অচল হ'য়ে যায়। তার প্রত্যেক

কথাটি, মুখের সজীব রেখাগুলি সব আমার মনশ্চক্ষে দেদীপ্য হয়ে আছে।

সে বলেছে—আমার কথা সে আগেই শুনেছে—কি শুনেছে কে জানে! আমার কি পরিচয় সেন তা'র কাছে দিয়েছেন, লীলা তা ভেঙ্গে বলে নি। সেইটি জেনে নেবার জন্যে আমার মন যেন ছটফট করতে লাগলো। কিন্তু আর কোনদিন, কোন অছিলাতেই যে সে বাড়ীর ফটক পার হ'তে পারব—এমন ভরসাও আমার হ'ল না। সে লৌহদ্বার যে কোনদিনই আমার সামনে রুদ্ধ হবে না—গৃহস্বামিনীর মুখে ও ব্যবহারে তার যথেষ্ট আশ্বাস পেলেও কেন যে সে ফটকের কল্পনাতেও দুর্ব্বিসহ ভয়ে ভাবনায় বেঁকে বসলো আমার মন, তাইবা কে জানে।

পূর্ব্বাপর ভেবে দেখতে পেলাম যে সেনের স্ত্রীর অস্তিত্ব জানা থাকলে সে বাড়ীতে ঢোকবার দুরাশা কোনদিনই আমি করতে পারতাম না। হেঁয়ালীর মত লীলার অস্তিত্ব আমার কাছে কখনই প্রকাশ হয় নি। প্রাণধন কোন কথাই জানত না—কতকগুলো সত্য মিথ্যা সাজিয়ে একটা গল্প ক'রে গেচে, সেন নিজে কখনও বলেন নি! আজ লীলাকে স্বচক্ষে দেখে এসেচি, তার দৃঢ় মধুর ব্যবহার পেয়ে এসেচি বলেই আমার মনটা তৃপ্তিতে ভরে গেলেও কোন্ একটা জায়গার ফাঁক যেন আর পুরলই না। হৃদয়ের কোন্ স্থানটি এমন শূন্য হ'য়ে আছে যে এত বড় বিস্ময়ের চাপেও পুরচে না—তা ত' জানি নে, সে শূণ্যতা পরিপূরণের কোন সম্ভাবনাই দেখ্‌তে পেলাম না।

সারারাত্রি আকাশ পাতাল কত কি যে ভেবেচি তা বলা চলে না। আমার জীবনের অনুপাতে ফেলে লীলাকে যেন অঙ্ক কসে' বার করতে-

গেলাম। কঠিন সমস্যার সমাধান হ'ল না. উত্তরোত্তর ভাবনাও বেড়ে গেল, মাথার ভিতরে দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠলো। ঘুরে ফিরে যে কথাটা বৃশ্চিকের মত আমার বুকে হলাহল ঢেলে দিচ্ছিল, সে এই যে সেনকে আমি আর দেখতে পাব না। তিনি আমার বাড়ীতে আসবেন না, বলে যে তাঁর দর্শন অপ্রাপ্য হ'য়ে পড়বে—তা নয়;—আর যে আমি এখানে থাকব না—এ কথা যে নিজেই সেনকে বলে এসেচি। হ্যাঁ আমি যাব, এ'ও যেমন সত্যি, তাঁকে দেখতে পাব না, সে'ও তেমনি সত্যি!

কোন্ কথাটি ভাব্তে ভাব্তে আমি কেঁদে ফেলেছি. বালিশ ভিজে গেচে—তা জানি নে, ভোরের মৃদু আলোক ঘরে আসতেই ধড়ফড় করে উঠে পড়েই দেখি—বালিশের ওয়াড়ে এতটুকু স্থান শুষ্ক নেই! অশ্রুর উৎস সারারাত ধরে চোখ্ ফেটে বেরিয়ে গেচে, আমার ভিতর এমন শুষ্ক ও নীরস বোধ হ'তে লাগল, যেন একটা খুঁটির মত দাঁড়িয়ে আছে এই দেহটা! না আছে তার নড়বার শক্তি না আছে বিন্দুমাত্র অনুভূতি! আর্শিতে যে ভূতের মত চেহারটা দেখলাম, সে কি আমারই? চোখ দু'টো দেড় ইঞ্চি ঢুকে গেছে, তার নীচে কালো দাগ একেবারে গাঢ় লেপা, ঠোঁট দুখানা ফ্যাকাসে, সারা মুখখানায় কে যেন হলুদ মাখিয়ে দিয়েচে। চুলগুলো ভোরের মধুর বাতাসে উলুখড়ের মত উড়ে বেড়াচ্ছে এ আমারই চেহারা? আমারই!—এক কথায় আমার মনে হ'ল, আমার দুঃসময়ে সব আমাকে ত্যাগ করতে উদ্যত।

অনেক দুঃখ জীবন ভোর আমি সহ্য করেচি, কিন্তু নিজের এ দীন-মূর্ত্তি আমার অসহ্য হ'য়ে উঠলো। এতদিন যে-সকল দুঃখ-কষ্ট ইচ্ছায়

অনিচ্ছায় আমার 'পরে আসা যাওয়া করেচে, এর তুলনায় তারা যে অত্যন্ত সামান্য, তা মনে হ'তেই আমি শিউরে উঠ্‌লাম। তাড়াতাড়ি কল ঘরে ঢুকে সাবান মেখে স্নান করে ফেল্লাম। আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে সুগন্ধি তৈলে কেশপ্রসাধন করতে করতে ভাবলাম—বিমর্ষ মলিনতা বিদূরিত হ'য়েচে কি-না। প্রসাধনে যে অঙ্গের এক আধটু উন্নতি সাধিত হ'য়েছিল, তা আমার চোখে পড়ল না। চোখের কালি ত কৈ সাবানেও যায় নাই!

এ বাড়ীতে এমন লোক কেউ নেই যে তার সামনে এই কদাকার মূর্ত্তি নিয়ে বার হ'তে আমার এত শঙ্কা সে ভয় আমার ছিল না কিন্তু এ ত বার করার কথা নয়! এ-যে নিজের চোখেই বীভৎসতা ফুটিয়ে দিচ্ছে। পথের ধারে কুষ্ঠরোগীকে দেখে লোকের মনে হয়ত করুণা জাগে, কিন্তু সে যে নিজে সেই ক্ষতের দিকে চেয়ে মৃত্যুবাঞ্ছা করে! নিজের ঘরে নিজের আর্শিতে নিজের চেহারা দেখেই আমার মনের অবস্থা যে তার চেয়ে একবিন্দুও ভালো হল না, তা বুঝতে পেরে একেবারে অবশ নিস্পন্দ হ'য়ে গেলাম।

বেলা বেড়েই চলেচে চৈত্র মাসের প্রারম্ভেই এমন গরম পড়েছে এবছর যে এখন থেকেই ভাবনা সুরু হ'ল, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে না জানি কি হবে! খোলা দরজাটা দিয়ে রৌদ্রের তেজ খাঁ খাঁ করে ঘরে ঢুকে পড়ছিল, তার সঙ্গে কত-যে ধুলো বালিও আসছে—তার ঠিকানাই নেই। ইচ্ছা হ'ল উঠে সে দরজা দু'টো বন্ধ করে দিই, প্রবল ক্ষুধার সময়ে ঘুম পেলে যেমন আহারেও রুচি থাকে না,—আমারও উঠে দরজা বন্ধ করা হ'ল না। এই সময়টা আফিস-যাত্রী বোঝাই গাড়ী, ট্রামের ঘড়

ঘড়ানি, ফেরিওয়ালার উদ্দাম চীৎকার রৌদ্রকে যেন আরো দীপ্ত করে তুলছিল—ক্রমশঃ গাড়ীট্রামও কমে গেল, ফেরিওয়ালারাও হেঁকে হেঁকে ঘরে ফিরে গেল, খুব-লাল দরজার বাইরে থেকে উঁকি মেরে জিজ্ঞাসা করলে—খাবার আর দেরী আছে কি-না ?

পরের বাড়ী নিমন্ত্রণ এসে যেমন অবস্থা হয়, আমার যেন ঠিক সেই রকমই হ'য়েছিল—আমি বল্লাম—খাবার ! হ'য়েচে না-কি ?

সে বলে গেল—হ'য়েছে, ঠাঁই লাগাচ্ছে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম—একটা বেজে দশ মিনিট হ'য়েচে ! একটা বেজে গেছে। খুবলালটা এমনি অপদার্থ যে এর মধ্যে তার হুঁস হ'ল না একবার !

এ-কথা বলতে সে বল্লে—সে এগারোটা থেকে তিনচার বার আমাকে ডাকতে এসেছিল, শুয়ে থাকতে দেখে ফিরে গেচে।

সে-কথা মিথ্যা নয়, কেননা পিণ্ডাকার অন্ন দেখেই তা বোঝা গেল। তাকে বল্লাম—হতভাগা, একি খাওয়া যায় ?

রাগ বরদাস্ত করে সে যা বল্লে—তার মর্ম্ম হচ্চে যে, নটা থেকে ভাত রেঁধে সে বসে আছে।

আর তা'কে কিছু বল্লাম না। তার দোষ কি ! প্রথমেই খানিকটা আমের ঝোল দিয়ে ভাত মেখে খেতে লেগে গেলাম।

সদর দরজায় কড়া নড়ে উঠ্‌তেই, খুবলাল রাগতস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো —কোন্ হ্যায় !

আমি তার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে বল্লাম—চেঁচাশ কেন ? খুলেই দেখ্‌না—আগে !

সে-ই! সে ভেবেই আমি খুবলালকে ধমক দিয়েছিলাম।

সেন ভিতরে পা দিয়েই বল্লেন—এ আপনি কি আরম্ভ করেচেন বলুন ত? এই কি মানুষের খাবার বেলা?

আমি হাতের দিকে চোখ রেখে বসে রইলাম।

সেন বল্লেন—আপনি বল্লে কথা শোনেন না কেন? সেদিন না বলে গেছি—বেলা করে খাবেন না। আচ্ছা—এতে লাভটা কি হয় শুনি?

কিসের লাভ?

এই তৃতীয় প্রহরে খেয়ে! সুখ হয়?...ওঃ আপনি যে হাত গুটিয়ে বসে গেছেন দেখ্‌ছি! নিন্—খেয়ে আসুন, আমি উপরে যাই।

সেন উপরে উঠে গেলেন! তিনি ঘরে গিয়ে বসলেন, পদশব্দ মিলিয়ে যেতেই আমি তা বুঝতে পারলাম, তবু আমার হাত আর মুখে ওঠে না! আমার মনে হ'তে লাগল, আজ যদি তিনি বাইরে থেকে খবর পাঠাতেন, শুনতে পেতেন যে আমি অসুস্থ, দেখা হ'তে পারবে না।

তার পরই মনে হ'ল যে লীলা যদি কাল রাত্রের কথাটা বলে দিয়ে থাকে, তাহ'লে আমি আর মুখ দেখাব কি করে? তাঁর বাড়ী গেছি বলে আমার লজ্জা নয়। আমার নিদারুণ লজ্জা এই যে তাঁর সামনে আমি সেদিন বেরুতে পারি নি! তিনি ত বুঝবেন না যে কি মর্ম্মন্তুদ লজ্জায়, ক্ষোভে আমার সর্ব্ব ইন্দ্রিয় আমার বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছিল সে সময়ে! নইলে তাঁকে দেখ্‌তে বা দেখা দিতে অসাধ!

খুবলাল বল্লে—ঔর কুছ...

না—বলে আমি দাঁড়িয়ে উঠ্‌লাম, যেমন ভাত তেমনি রইল।

খুবলাল ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করলে—খাবার করে দেবে কি-না! সে উত্তম 'পুরী' বানাতে পারে।

সে প্রথম দিন সব কাজেই তার অক্ষমতা জানিয়েছিল, আজ আমাকে অভুক্ত দেখেই যে তার ক্ষমতা উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেচে—তা'তে খুসী হলেও আমি বল্লাম যে পুরী বানাতে হ'বে না।

সিঁড়ির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম যে, সেন সে-কথা না তুললেই বাঁচি। যদি তোলেন, একটা উত্তর ত দিতে হ'বে? কি উত্তর দেব—ভাবতে ভাবতে অনেক দেরী হ'য়ে গেল, তবু মনের মত জবাব একটা খুঁজে পেলাম না।

সেন বারান্দা থেকে বল্লেন বিজ্ঞ লোকের ভোজন হ'চ্ছে না-কি যে সাড়া শব্দ নেই, আর একঘণ্টা ধরে চলচে?

আমি উপরে এসে বল্লাম—হ'য়ে গেছল আগেই।

সেন বল্লেন—বলি এতদূর ধাওয়া করেছিলেন কেন বলুন—দেখি?

পায়ের নীচে ধরণী যেন বাসুকির মাথার পরে টলে উঠ্ছিল, আমি দু'টি হাত মুঠো বেঁধে বসে রইলাম।

সেন আবার বল্লেন—প্রাণধনের খবরাখবর নিয়েচেন—এত তাড়া! একমুহূর্ত্ত থামলেন, আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন - খবর এলে কি আমি দিয়ে যেতাম না! আমাকে এমনই ভেবেছেন বুঝি?

আমি তবুও নীরব।

সেন বোধ করি প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করতেই বল্লেন—শকুন্তলার বহি শুনলাম। মন্দ লেখে নি—বুঝলেন! তার সব চেয়ে সুন্দর হ'য়েচে, নায়িকাটি! নামটি হ'ল কামনা,—একজনের সঙ্গে 'বে'র সব ঠিক ছিল,

ছেলেটি বিলেত' থেকে পাশটাশ করে' এল, কামনা তাঁকে না বিয়ে করে'—সে বিলেত-ফেরৎ বলে—একজন গরীব স্কুলমাষ্টারকে বিয়ে করলে! মেয়েটির ব্যবহারে বেশ স্বদেশিকতা ফুটে উঠেছে, না?—ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলাম যে বুঝেচি।

সেন বল্লেন—বেশ লেখে শকুন্তলা। নাটক ছাড়া আরো অনেক লেখা আছে তার। কবিতাই বেশী। আমি তাঁকে বলে এলাম যে মাসিকে পাঠিয়ে দিতে। অমন লেখা আজ কালকার মাসিকে প্রায়ই দেখতে পাই নে। বলেচে, পাঠিয়ে দেবে। ধূমধাড়াক্কার সম্পাদকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে—বলে দেব ছাপ্‌তে।

সেন গড় গড় করে আরো কত কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন, আমার ভালোই লাগল না, আমি উঠে বেরিয়ে যাচ্ছি। সেন বল্লেন—কি! শকুন্তলার সুখ্যাতি সহ্য হ'ল না।

আমি অগ্নিচক্ষে চেয়ে বেরিয়ে গেলাম। খুবনালকে বল্লাম, একটু চা কর্‌ত!

সে জিজ্ঞাসা করলে—এক পেয়ালা?

আমি কি জবাব দিই ভাবছি, সেন ঘর থেকেই বল্লেন—আমি খাব না।

আমিও সেখান থেকেই জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি চা খান-না?

না।

'না' শুনে আমার মনটা ভারি বিশ্রী হ'য়ে গেল! একি! সেন—সেন মিথ্যা বললেন!

সেন বল্লেন—আপনি ভাবছেন, খেতে দেখেছেন!—এই ত! তখন খেতুম। এখন খাই-নে। বঙ্কিম……

পাছে কথাটার শেষ শুনতে হয়, আমি দূরে চলে গেলাম।

সেন বল্লেন—সিঁড়িতে জমে গেলেন না-কি !

আমি তুহাতে জোর করে মুখ মুছে উঠে আসতেই সেন বল্লেন – অন্ধকারে কি করছিলেন ? কাঁদছিলেন ?

প্রাণপণ শক্তিতে কাপড়ে চোখ্ মুছে ফেলেছিলাম, কিন্তু চোখের জল আবার হুহু করে বয়ে পড়তে লাগল, আমি নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছি, সেন বল্লেন, আচ্ছা এত জল আপনারা পা'ন কোথায় বলুন ত ? কোথেকেই বা আসে, কেনই বা আসে—কিছুই বুঝতে পারি নে ত !

ভাবলাম, বলি—তা ত' পারবেন না—কিন্তু এমন কঠিন কথাটা সেনকে বলতে আমার গলা ধরে গেল, বলতে পারলাম না। তাঁর দিকে পেছন ফিরে কাপড়ের আঁচল তুলে নিলাম।

সেন বলতে লাগলেন—দেখুন, ছেলেবেলায় আমি ভারি ডান-পিটে ছিলাম, মাষ্টাররা স্কুলে যদি বা কেউ মারত, আমি হেসেই উড়িয়ে দিতাম। সেজন্যে কেউ আর মারতই না। তার পর বাড়ীর স্কুল যখন আরম্ভ হ'ল,—শুনেছি লোকের স্ত্রী-সব কেঁদে কেটে বাপের বাড়ী চলে যায়,— আমার বরাতে ঠিক তার উল্টো। লীলাকে দেখেছেন ত ! একদিন না কাঁদে, না বাপের বাড়ী যেতে চায়। যদিও বা গেল, তু'চার ঘণ্টার বেশী থাকতে পারে না। তার চোখের জল বোধ করি ভগবান দিতে ভুলে গেছেন।

আমি বল্লাম—সে ত ভালোই !

সেন হেসে বল্লেন—ভালো আদপেই নয়। কাঁতুনে স্ত্রী-ও যেমন লোকের কাছে একঘেয়ে, আমার এই হাস্তুনে লীলাটিও তেমনি একঘেয়ে

হ'য়ে পড়েছে, তার মধ্যে যদি এতটুকু বৈচিত্র্য বা নতুনত্ব থাকে! জানেন ত, আমার বাড়ীর সে-ই হ'ল কর্ত্তা, সে-ই হল গিন্নী—সেই সব। কাজেই গিন্নিবান্নি লোকের মধ্যে একটু বিশেষত্ব না থাকলে সংসারটা একঘেয়ে ঠেকে কি-না আপনিই বলুন ?

আমি চুপ করে' রইলাম।

সেন বল্‌তে লাগলেন—আমি তা'কে কত বলি যে লীলা এখন তোমার বয়েস হ'যেচে, ভারিক্কে হ'য়েছ—একটু নতুন রকম হওয়া তোমার বড্ড দরকার হ'য়ে পড়েচে—ছেলেপুলে না-হয় নাই হ'ল, কিন্তু ছেলেমানুসীর বয়েস ত তোমার নেই আর! একটু গম্ভীর হ'য়ে পড়!—তা স্বভাব কি ঘোচে! উঁহু.........

মাথাটি বার দুই এদিকে ওদিকে দুলিয়ে একমিনিট পরে বল্লেন—তারও স্বভাব বদলাল না, আমারও নতুনত্ব ভোগ হ'ল না।—বলে তিনি মুখখানি ম্রিয়মান করে বসে রইলেন। আমি ভাবতে লাগলাম, একি সত্যই দুঃখ, না তারই প্রশংসা! ভেবে কিছুই স্থির করতে পারলাম না, তবে জানি নে কেন—আমার মনে হ'য়েছিল বুঝি সেন—সত্য সত্যই দুঃখিত!

কি ভাবছেন? আমার দুঃখের বরাতটা! ভেবে আর কি করবেন বলুন! কুলকিনারা পাবেন না, কেমলমাত্র হাবুডুবু খাওয়াই সার হ'বে।

এবার তাঁর মুখের গোপন হাসির রেখাটা আমার চোখে পড়ে' যেতেই আমি দীপ্তস্বরে বলে উঠলাম—সে ভাবনা আমি ভাবি নে।

ভাবলেই বা ক্ষতি কি? আপনি যান্ ত লীলার কাছে, বলে ক'য়ে এটি করতে পারেন?

হঠাৎ ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভেঙ্গে ওঠার মত স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম—কি করতে পারি ?

সেন বল্লেন—একটুখানি বৈচিত্র্য ! চেষ্টা করলে বোধ হয় আপনি পারেন। দেখুন-না একবার । বন্ধুরও উপকার করা হ'বে, নিজেও মন্দ আমোদ পাবেন না ! কি বলেন, দেখবেন ?

দেখুন, সব সময়েই ঠাট্টা······

ঠাট্টা ! ঠাট্টা এর কোন্‌খানটায় দেখ্‌লেন ?—বলতে বলতে সেনের স্বর নেমে গেল ; তিনি একমিনিট পরে বল্লেন—সত্যি বলচি আপনাকে—ঠাট্টা করি নি ।

তাঁর এ শপথের ভেতরও যে একটা রহস্যের ইঙ্গিত লুকিয়েছিল, সেটা আমার কানে বাজতেই বুক অবধি চিড় চিড় করে উঠল। আর সেখানে বসতে পারলাম না, দাঁড়াচ্চি—বাড়ীর নীচে আবার মোটরের ধক্ ধক্ আওয়াজ শুনতে পেলাম। ছুটে বারান্দায় গিয়ে যা দেখলাম, অঙ্গ অবশ হ'য়ে গেল।

সেন-ও আমার পিছু পিছু বারান্দায় এসেছিলেন, মুখ ফিরুতেই তাঁর হর্ষোৎফুল্ল মুখ আমার চোখে পড়ল। বল্লেন—বহি শোনবার জন্যে ডেকেছি। আপনি শুনবেন আজ !

কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিলাম, সহাসনেত্রে ফুলী এসে দাঁড়াল। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলে—খাতা আন্‌তে পারি নি ! কিছু মনে কর না ভাই !

আমি ভাবলাম, আমাকেই বলচে। বলতে যাচ্চি—বেশ হ'য়েছে, ফুলী তার আগেই বল্লে—তুমিও চলে গেলে, থিয়েটারের একদল লোক

এসে হাজির! ত'ারাই নিয়ে গেচে বইটা!···তোমার ত ভালোই লেগেছে?

সেন বল্লেন—চমৎকার!

না ভাই, তুমি হয়ত বাড়াচ্চ আমাকে!

সেন উত্তরে কি বল্লেন—আমি শুনতে পাই-নি। আমার কানে যেন কে তপ্ত লৌহ ঢেলে দিচ্ছিল। ফুলীর মুখে 'তুমি' সম্বোধন শুনে আমার গা রি রি করে উঠ্‌ল! আমি জানি, এ আমারই অন্যায়! সে তাঁকে কি বলচে না বলচে আমি তা দেখ্‌তে যাই কি অধিকারে? কিন্তু তখন না-কি ঘরের চালে আগুন লেগে গেছে, জ্বলন্ত শিখা আকাশ স্পর্শ করছে—নেবাবার কোন সম্ভাবনা নেই বুঝেই আমি স্তব্ধ হ'য়ে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সেন বল্লেন—চলুন, বসা যাক্।

ফুলী হেসে বল্লে—যার বাড়ী······

মাথা খারাপ! বলে সেন হেসে ঘরে ঢুকলেন। ফুলীও তাঁকে অনুসরণ করলে!

মাথা খারাপ, কার মাথা খারাপ? আমার! হ'বেও বা!—তিনি না-কি বৈচিত্র্য খুঁজে বেড়াচ্চেন, তাই আমার মাথার স্থৈর্য্যে সন্দিহান হ'য়েছেন! কিন্তু তার প্রতিবাদ করতেও পারলাম না। গলার স্বর বোধ করি লোপ পেয়েছিল! লক্ষ লোকের মিলিত কণ্ঠস্বর যদি আমার গলার মধ্যে থাকৃত, তবেই আমি চেঁচিয়ে বলতে পারতাম, মাথা আমার খারাপ নয়! যা'দের মাথা খারাপ, তারাই বৈচিত্র্য অন্বেষণে থিয়েটারের — থাক—সে কথায় আর দরকার কি! বল্‌তে ত পারি নি।

একমিনিটের মধ্যে আমি ভেবে নিলাম, এই গাঢ় অধিকার ফুলী কবে পেয়েছে! কখন্ পেয়েছে! কেমন করে' পেয়েছে! সে অধিকার কে তা'কে দিয়েছে? সে নিজেই নিয়েছে না সেন দিয়েছেন তা'কে? সেন দেন নি নিশ্চয়। সে-ই তাঁকে ভালোমানুষটি পেয়ে এমন মুগ্ধ করে ফেলেছে!

কাল রাত্রেও সেন তার বাড়ী গেছলেন, কতক্ষণ ছিলেন কে জানে, আজও এখানে এসেই তা'কে ডেকে আন্তে মোটর পাঠিয়েছিলেন—নিজের কানেই শুনেছি. নিজের চোখেই সে দেখেছি, আর এতটুকু অস্পষ্টতা রইল না আমার মনে! সেন যে ফুলীর মোহাবিষ্ট, বুঝতে পেরেই চোখে আমি ধোঁয়া দেখ্তে লাগলাম। রাস্তায় কত লোকজন, গাড়ী ঘোড়া—কিছুই আর চোখে পড়ে না,—শুধু তাই নয়,—আমি কিছু দেখ্তে পাচ্ছি নে, অথচ আমার এই অন্ধ অবশ অবস্থায় রাস্তার লোক হাঁ করে' আমাকেই গিলে খাচ্চে ভেবেও আমি সরে যেতে পাচ্ছিনে।

বারান্দা থেকে যেতে হ'লে—সেই ঘর দিয়েই পথ! সোজা বেরিয়ে যাবার ইচ্ছাতেই আমি বিক্ষিপ্ত চরণে ঘরে ঢুকেছিলাম, কিন্তু সেনের পরিহাসে আমার পা আর উঠ্ল না।

সেন ফুলীকে বল্লেন—দেখ্ছেন—মাথা খারাপ।

আবার সেই!

ফুলী দাঁত বার করে হাসছিল। অনেক মেয়েকে হাসতে আমি দেখেছি, কিন্তু হাসলে এমন কদাকার মুখ কারু যে হ'তে পারে, তা আমার জানা ছিল না। ফুলীর হাসি দেখে আমার জিভ্ ভেতর দিকে

ঢুকে গেল। প্রবল আকর্ষণে পায়ের বল টেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

শুন্‌তে পেলাম—সেন বল্‌ছেন, সত্যি এর মাথা খারাপ!

ফুলী বোধ করি আর কোন উত্তর দেয় নি, তা'হ'লে শুন্‌তে পেতাম। কারণ দূরে যাই নি আমি। যাবার ক্ষমতা সে সময় আমাতে ছিল কি-না আজ আর তা মনে নেই।

সেই জন্যেই আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের বাল্যবিবাহই আমি পসন্দ করি।—বলে সেন হা হা করে হাসতে লাগলেন।

ফুলীও হেসে বল্লে—বিয়ে হ'লে বুঝি মাথা খারাপ হয় না?

মোটেই না, মোটেই না। খারাপ কি বলছেন, মাথাই থাকে না। থাক্‌লেও কার পায়ের নীচে পড়ে থাকে, টের পাওয়া যায় না।

আমার নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্বে যখন আমি শ্রান্ত ক্লান্ত—তখন যে আমারই আলোচনায় এরা এমন মেতে উঠ্‌বে তা কে জানত! এ কি রহস্যালাপের কথা! একটুখানি অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, মাঝে কতটা আলাপ এগিয়ে গেছে, আমি তা জানি না, আমি কান দিতেই শুন্‌তে পেলাম, ফুলী বল্‌ছে—

তুমি কতক্ষণ এসেছ?

আমি ভাবলাম সে বুঝি ঘড়ি ধরে কৈফিয়ৎ চাইবে!

সেন উত্তর দিলেন—পৌঁছেই কার পাঠিয়ে দিয়েছি।

ফুলী বল্লে—তখনও মাথা খারাপ ছিল?

সেন বল্লেন—কৈ না! ছিল না, এখনি হ'য়েছে! হায় হায়!

এ মাথা খারাপ না হ'য়ে যায় কি? এ কি জবাকুসুমে হিলিংবামে সারবার?

তাঁর হাসির মাঝখানেই ফুলী বল্লে—তার চেয়ে বড়িয়া দাওয়াই আমার কাছে আছে. দেখুন, সারিয়ে দিচ্ছি।

আমার ভয় হল—সে বুঝি এই দিকেই আস্‌চে! পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হ'ল—কিন্তু পারলাম না। ফুলী এসে আমার কাঁধের পরে হাত রেখে করুণ স্বরে বল্লে—আমি যাচ্ছি।

কোন কথা না বলে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, ফুলী আরও করুণ কণ্ঠে বল্লে—এমন আমাদের হ'য়ে থাকে... ..

ভাবলাম—এ মাথা খারাপের কথাই বলছে, এমন রাগ হয়েছিল আমার যে কি বল্‌ব।

ফুলী বল্লে—তুমি ত নিজেই দেখেছ, সেই প্রথম রাত্রেই তোমার সেই দিব্যেশ বাবুকে আমিই অভ্যর্থনা করে নিইছিলাম, এমন আমরা করে থাকি! তায় দোষ কি? এমন কি, আমরা পাঁচ ঘরের পাঁচটি মেয়েমানুষ পাঁচজন বাবুর সঙ্গে তাশ পাশা অবধি খেলি, গান বাজনাও করি।

সে একটুখানি থেমে আবার বল্লে—কিন্তু তুমি যখন পসন্দ কর না আর করব না। দেখ, থিয়েটারের মেয়ে মানুষের আর কিছু না থাক সেলফ্‌ রেসপেক্ট আছে! চল্লুম ভাই, তোমার বাবু তোমারই রইল, মাঝে থেকে আমিই একটা অভিশপ্ত ইতিহাসের পাতা রয়ে গেলাম।

অভিশপ্ত ইতিহাসের পাতার অর্থ কি আজ পর্য্যন্ত তা আবিষ্কার করতে পারি নি। কিন্তু সে হয় ত বাংলা ভাষায় আমার চেয়ে ঢের

বেশী শিক্ষিতা, তার কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি—সে একমিনিট আমার দিকে চেয়ে বল্লে—আসি তবে !

"বল সখি-কোমলে হেসে বল সরলে,
'এসো তবে এসো নাথ !
হৃদয়ে স্মরণ করো—
এ'লে পুনঃ অবসাদ !"

আজ একটিবারও তার গান হয় নি। এই সে প্রথম গেয়ে মুখটি অতি করুণ করে নেমে গেল। সেন তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে বল্লেন—চলুন, আপনাকে রেখে আসি !

আমি একটা নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে আছি সেন আমার পাশে এসে বল্লেন—আপনি কবে যাচ্ছেন ?

বল্লাম—আর যাব না।

সেন বল্লেন—এই যে সেদিন থিয়েটারের ফেরৎ বল্লেন আমাকে……

ওঃ ! তার এখন ঠিক নেই।

সেন বল্লেন, বেশ। যখন ঠিক হ'বে কিন্তু, আমাদের একটা খবর দেবেন ত ?

আমি চুপ করে রইলাম।

সেন তাড়াতাড়ি নেমে যেতে যেতে বল্লেন—খবরটা দেবেন বুঝলেন ! আর না দেন; তা'তেও ক্ষতি নেই।—বলে চলে গেলেন, ফুলী বোধ করি গাড়ীতেই বসেছিল, তিনিও মিলিত হ'লেন।

রেলিঙটা ধরে ধরে খুব সতর্ক পদক্ষেপে আমি ঘরে এসে বসে পড়লাম।

লীলার দুঃখ কল্পনা করেই আমার বুক যেন কুচি কুচি করে কেটে যাচ্ছিল। সে ত জানে না, তার নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যের তলে এত বড় একটা ষড়যন্ত্র চলচে! জান্‌লে সে-কি ছেড়ে দিত! সে ত জানে না, সেনকে ভুলিয়ে রসাতলে নিয়ে যেতে থিয়েটারের এই নটিটি কি উঠে পড়েই না লেগেছে! ভাবতে আমি অবশ হ'য়ে যাই, যে-নারী জীবনে একদিনও এ সুখের কোন আস্বাদই পায় নি, সে-হঠাৎ এমন সতর্ক হয় কোত্থেকে! লীলা তার ধনৈশ্বর্য্যের দৃঢ় আসনে বসে' সুখের স্বপ্ন দেখ্‌ছে, এদিকে তার আসন টলাতে ফুলার আগ্রহ যত্নের কিছুমাত্র অভাব নেই—যখন সে তা জানতে পারবে—প্রতীকারের আশা দূরে থাক—আসন তার ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাবেই! তখন সেই আশ্চর্য্য সুন্দর লীলাবতীর কি-আর দুঃখের সীমা পরিসীমা থাকবে!

নারীচিত্তের এ-বোধ করি স্বাভাবিক কোমলতা, নইলে তার দুঃখ এত করে আমাকে আঘাত করে কেন? আগে থেকেই তার পতি বিরহবিধুরা রোরুদ্যমানা মূর্ত্তি কল্পনা করে' ঘর দ্বারা বিছানা পত্র সব অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো।

বারান্দা থেকে ভাড়া গাড়ার আড্ডা দেখা যেত,—বেরিয়ে দেখলাম, ক'খানা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—খুবলালকে ডেকে বলে দিলাম, একখানা আন্‌তে। সে চলে গেল। দুমিনিটের মধ্যে গাড়ী এসে দাঁড়াল। খুব-লালকে সঙ্গে নিয়ে আমি গাড়ীতে উঠে বসলাম। একবার মনে হ'য়েছিল, সেন যদি আসেন? তখনি তাঁর শেষের কথাটা মনে হ'ল। মনে হ'ল—ফুলী তাঁকে ছাড়বে না। এত গান জানে, এত হাসি জানে, কত রং-ঢং তার আয়ত্ব—নারী আমি, আমাকেই সে মোহিত করে'

ফেলেছিল, সেন ত পুরুষ—সে কবল থেকে তাঁর উদ্ধারের কোন আশাই নেই।

সেনের বাড়ী ত খুব দূরে ছিল না, গাড়ী পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই কটকে ঢুক্‌ল। আজ খবর না পাঠিয়েই আমি উপরে এলাম। লীলার ঘরটি আমার জানাই ছিল—এসে দেখি সে একখানা আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে সিল্কের সাড়ীতে ব্রোচ আটকাচ্ছে! আমাকে দেখেই বলে উঠ্‌ল—মনে পড়েছে?

জড়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

লীলা বল্লে—তিনি তোমার ওখানেই গেছলেন-না?

আমার ওখানে না, ফুলীর বাড়ী গেছেন?

ফুলীর বাড়ী?

আমি বল্লাম—জানেন-না ফুলীকে! থিয়েটারের মাগী!

লীলা হেসে বল্লে—জানি বৈ-কি! কিন্তু আজ যে-কথা ছিল, তা'কে তোমার বাড়াতেই এনে পড়া হ'বে।

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম।

সে কথা আপনাকে বলে গেছেন সেন?

গেছেন বৈ-কি! ফুলীর বহি আমিও শুনেছি, বেশ লেগেছে!

অনেকক্ষণ অবধি কথা কইতে পারলাম না। মুখ ফুটে তা'কে বলতে পারলাম না যে বহি শোনানোটা অছিলা মাত্র, ফুলীর, অন্য অভিসন্ধি আছে। এ-কথা ত রমণীর কাছে বলাও সহজ নয়।

লীলা আমার কাছে সরে এসে বল্লে—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস—

সে আমার হাতে ধরে টেনে খাটের ওপর বসালে। স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে বল্লে—আজ যান্-নি তোমার ওখানে ?

গেছলেন, তখনি ফুলীকে নিয়ে চলে এসেছেন।

লীলা একটু ভেবে বল্লে—কতক্ষণ গেছেন বল ত ?

এই কতক্ষণ!

তবে এখানেই আসবেন না ত? কাল রাত্রে বলছিলেন বটে—ফুলী না-কি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে। আমিও বলে দিয়েছি—একদিন আন্‌তে।

আপনার বাড়ীতে ?

নইলে আর কোথায় বল ? আমি ত আর থিয়েটারে যেয়ে আলাপ করতে পারব না।

একটু থেমে, পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়স্বরে বল্লে—আমি কোথাও যেতে পারি নে বটে, তবে কেউ যদি আসে আমার বাড়ীতে, সৌভাগ্য বলেই মনে করি!

সৌভাগ্য মনে করেন ?

করি বৈ-কি!

এই থিয়েটারের···

দোষটা কি হয়েচে তাই বল ?

আপনি কি কোন দোষই দেখতে পাচ্ছেন-না ?

লীলা সহাস্যে বল্লে - কৈ! কিছু না ত!

এ থেকে বিপদ···

বিপদ্ আবার কী!

কি-যে বিপদ তা আমিও বলতে পারলাম না।

লীলা বল্লে—সত্যি বলচি তোমাকে। থিয়েটার দেখে দেখে তাদের সম্বন্ধে আমার কত যে কৌতূহল হয়—তাদের গার্হস্থ্য জীবন দেখ্‌তে, তা আর বলে শেষ করবার নয়।

সে কৌতূহল একদিন আমার মধ্যেও অদম্য হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু ফুলীর আচরণে সে-সব পুড়ে ঝুড়ে গেছে।—আমি কি-বলব তাই ভাবছি—লীলা বল্লে—আমার বেয়ের সময় এই বাড়ীতে থিয়েটার হ'য়েছিল দু'রাত্রি। তখন আমি খুব ছোট ছিলাম কি-না, ভালো করে দেখে নিতে পারি নি। তার পরেও কত বার থিয়েটারে গেছি—কিন্তু সে-সুযোগ হয় নি—তাই আমিই বলেছিলাম তাঁ'কে—ফুলী যদি আসে আলাপ করি।……বস, আমি জলখাবার দিতে বলি।

না—আপনি বসুন।

না কেন? খেয়ে এসেছ?

দরকার নেই, আপনি বসুন।

এক গাল হেসে, সোহাগে লীলা বল্লে—তা' কি হয়? আমার গৃহে অতিথি তুমি, বিমুখ হ'য়ে ফিরবে?……ও-নন্দর মা, নন্দর মা!

কেন গা বৌ-মা?—বলে বাঁহাতে তাগা-পরা দাসী এসে দাঁড়াল।

লীলা বল্লে—জলখাবার নিয়ে আয়।

কি আনব মা?

কি খাবে বল—বলে লীলা আমার হাত ধরলে। তারপর ঝির দিকে ফিরে বল্লে—নিয়ে আয় যা-হয়।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পঙ্কিল পথে সুখের আস্বাদ।

বাড়ীতে ঢুকতেই খুবলাল বল্লে--বঙ্কিনিবাবু এসেছেন

আমি বল্লাম—কে—বঙ্কিমবাবু ?

হ্যাঁ—উপরে বসে আছেন।

উপরে ওঠবার আগে আমি কিছুক্ষণ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রইলাম। সিঁড়ির অন্ধকারটি ছিল আমার সান্ত্বনার স্থান, আলো বা লোকের দৃষ্টি অসহ্য হ'লেই আমি সেখানটায় এসে দাঁড়াতাম।

বঙ্কিম উপর থেকে বল্লেন - খুবলাল, বিবি আয়া ?

'বিবি' সম্বোধনে আমার বুক যেন চিরে গেল। নেত্যর বাড়ীর দুলাল এই সম্বোধনে আমাকে অভ্যর্থনা করেছিল, ফুলীকেও করেছিল, মনে পড়তেই ধমণীতে রক্ত উষ্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এসে দাঁড়াতেই বঙ্কিম বল্লেন—অনেকদিন আস্‌তে পারি নি,- মনে আছে কি ?

আমি উত্তর দিতে পারলাম না।

বঙ্কিম আমার হাতটি ধরে বল্লেন—ভালো ছিলেন ?

হ্যাঁ!

আসুন—বসা যাক্—বলে হাত ধরে টানতে লাগ্‌লেন।

ঘরে এসে বল্লেন—সেনের বাড়ী গেছলেন বুঝি ?

হ্যাঁ—আপনি আর যান-না যে ?

বঙ্কিম চমকে উঠে বল্লেন—আপনি কি জানেন না···

আমি সব জানি।

আর সময় হয় না—কি করি বলুন ?

তাঁর এ-কথায় আমি আদৌ সন্তুষ্ট হ'তে পারলাম না। কেন যে অসন্তোষে আমার মন বিস্বাদ হ'য়ে গেছ্‌ল, তা আমি পরে বল্‌ছি।

বঙ্কিম বল্লেন—লীলাবতীর সঙ্গে আলাপ হ'য়েচে আপনার ? কেমন দেখলেন, বলুন দেখি ?

লীলার প্রসঙ্গ উঠ্‌তেই সব উত্তাপ জল হ'য়ে গেল ; কিন্তু তবু এর কাছে সে আলোচনা করতে আমার প্রবৃত্তি হ'ল না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার সঙ্গে আলাপ আছে ?

আছে একটু আধটু। কেমন দেখলেন-বলুন-না ? সেনের ভাগ্যের হিংসা হয় না-কি ?

আমি দীপ্তস্বরে বল্লাম—আপনার হয় ?

আমার কেন হ'তে যাবে ? আমি ত আর মেয়ে মানুষ নই ! আপনাদের হওয়াই সম্ভব। আমার কাছে আর লজ্জা কি, বলুন-না ?

এতক্ষণ আমি সহজভাবেই তাঁর সঙ্গে কথা কইছিলাম, কিন্তু এ-কথায় দপ্‌ করে আগুন জ্বলে ওঠার মত বল্লাম—আমার চেয়ে আপনারই সেটা হওয়া বেশী স্বাভাবিক।—বলেই নির্লজ্জা আমি, মরমে মরে গেলাম।

বঙ্কিম বল্লেন—থাক্‌গে। আপনার কথাই বলুন।

মুখ নীচু করে বল্লাম—আমার কিছু বলবার নেই !

বঙ্কিম সহাস্যে বল্লেন—তা'ও কি হয় ? শুনলাম, ক'দিন কলকাতা

এসেছেন, কি-করছেন না-করছেন, দেখতে শুনতে এলাম, অমন উড়িয়ে দিলে ত চলছে না। বলুন, বলুন।—বলে আবার তিনি আমার দিকে হাত বাড়ালেন।

এবার আমি সরে গেলাম। তখন যে মোহের বশে তাঁর স্পর্শে আমার চেতনা জাগে নি, এখন তা কেটে যেতেই আমি পিছিয়ে গিয়ে বল্লাম—বড় শ্রান্ত আমি, আমাকে মাপ করুন!

এত শ্রান্ত কিসে?—বলে বঙ্কিম হাসতে লাগলেন।

একমিনিট পরে আমি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলাম—আপনি কি মানুষ নন?

—নই? কেন?

কেন—আমি না বল্লে কি-আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না?

বঙ্কিম হেসে বল্লেন—কেমন করে বুঝব বলুন? আমার ত ধারণা আমি হস্ত পদ বিশিষ্ট পূর্ণ অবয়ব মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই।

বলতে গেলাম, তত জ্ঞান আপনার নেই!—কিন্তু সেনের বন্ধু তিনি, কথাটা একটু কোমল করেই বলতে হ'ল—কথা কইতে আমার কষ্ট হ'চ্ছে, আপনি মাপ করুণ আমাকে!

এত বড় নৃশংস তিনি, এর পরেও বল্লেন সে আমি গোড়া থেকেই জানি। আমার সঙ্গে কথা বলতে আপনার চিরদিনই কষ্ট হয়! কিন্তু তার সঙ্গে কথা কয়ে আশ-ও মেটে না!

আমি চেঁচিয়ে বল্লাম—এ'টা আমার বাড়ী তা জানেন?

বঙ্কিম বল্লেন—তা জানি! বাড়ী যারই হ'ক—কিছু আসে যায় না। সে-ভয় দেখিয়ে ফল পাবেন না। আমার যদি ইচ্ছা হয়......

আপনি যাবেন কি-না তাই বলুন!

বঙ্কিম বল্লেন—যদি বলি ইচ্ছে নেই আমার, কি করবেন?—তিনি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। একটু পরে আবার বল্লেন—এই সেন-কে পেয়েছিলেন কোথেকে শুনি? আমার জন্যই তাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন, আমাকেই অপমান করেন আপনি? কিসে আপনার এত সাহস হল শুনি?

কথাগুলো যেন শাণিত ছুরিকার মত অল্প আলোকে ঝলসে উঠ্‌ছিল, আমার সর্ব্ব ইন্দ্রিয় তারই ধার দেখে একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেছল।

বঙ্কিম বল্লেন—কিন্তু যা ভেবেছেন—পাবেন না কোনদিন। আপনার চেয়ে সেনকে আমি ঢের বেশী চিনি। তার বাড়ী গিয়ে যতই খোসামুদী করুণ, লোভ দেখান, টলবার ছেলে সে নয়! যতই সেজে গুজে তা'কে ভোলাতে যাবেন, সে ততই পেছিয়ে যাবে। সে দুরাশা আপনার মিটবে না, তার চেয়ে আমি বলি কি...

আপনি না যান্—আমিই বেরিয়ে যাচ্ছি—বলে আমি ঘর ছেড়ে যাচ্চি, বঙ্কিম বল্লেন—আমিই যাচ্ছি, কিন্তু একদিন......

কোন কথা শুনতে চাইনে আমি। আপনি যান।

বঙ্কিম কি রকম মুখ করে চলে গেলেন।

বিছানায় এসে বসে পড়তেই দেখলাম, বালিশের পাশে একটা কালো রঙের বোতল পড়ে' রয়েছে। জিনিষটা কি-তা আর বুঝ্‌তে দেরী হল না। কি-ভূত আমার মাথায় চেপে বসেছিল জানিনে, দেওয়ালের গায় মুখ ঠুকে গলাটা ভেঙ্গে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা গালে

ঢেলে দিলাম। যেখানটা দিয়ে সেই তরল পদার্থ গলগল করে নামছিল, সব যেন জ্বলে পুড়ে গেল—কি উগ্র, তীব্র তার ঝাঁজ! লোকে কি সুখে খায়—কে জানে!

কিন্তু দশমিনিট না যেতেই সুখের আভায আমি হৃদয়ে মনে অনুভব করতে পেরেছিলাম! ভাবনা ত আমার সেদিনের নূতন নয়, কত সুখদুঃখের ভাবনা এই বয়সে আমাকে ভারতে হ'য়েচে তার কি আর হিসেব আছে? কিন্তু কোনও ভাবনাতেই এত সুখ পাইনি, একটিদিনের জন্যও পাইনি! একাগ্রতায় মন একেবারে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেছল! রাস্তার মাতাল দেখে চিরদিন আমি লজ্জায়-ঘৃণায় সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়েছি, আজ মদের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতায় ডুবে গেলাম!

আমার মনের আরম্ভ থেকে শেষ অবধি যেখানে যত স্থান আছে—আর সে স্থান পুরে আছে—সেনের ধ্যানে!—তবু সে কথা বুকের ওপর উঠতে সাহস পায় নি! আজ বিশ্বজগৎ তা'কে ঘিরে সেই কথাটাই শুনে নিতে চাইলে, আমি ডাক্‌লাম—সেন্ সেন সেন!

চারিদিকের দেওয়াল কেঁদে বল্লে—সেন! সেন! সেন!

ভেতরকার অজস্র মধু সঙ্গোপন করে' আখের খোলাটা যেমন শক্ত হয়েই লোককে বিমুখ করিয়ে দেয়—সেনের মধু নাম উচ্চারণ করবার আগেই যেন আমার মন বল্লে—সেন! কে-সে? কে-ন-সে?

হয়ত বঙ্কিম সত্যকথাই বলে গেচে, হয়ত কেন বলছি, নিশ্চয়ই। আর এ ত আমিও জানি, সবাই জানে, কিন্তু আমি তখন একেবারে মগ্ন হ'য়ে গেছি। চেষ্টা করেও চোখের পাতা খুলতে পারি নে; কথা কইচি কিন্তু নিজের কানেই তার শব্দ যাচ্ছে না, সেন কেন এসেছিলেন,

আজই তা'কে ধমকে এসেছিলাম যে ফুলীকে সে এত স্বাধীনতা দেয় কেন ?—কিন্তু নেশার সময় নাকি অনেক দুর্লভ জিনিষেরও নাগাল ধরিয়ে দেয় ; আমাকেও যেন দেখিয়ে দিলে যে লীলা সেনকে মেপে নেয় না, নিজেকেও মেপে দেয় না। এরা যেন যার যতখানি সব পরস্পরকে বিলিয়ে, দিয়ে থুয়ে খালিহাতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মহাভারতের সেই রাজার মত ! এই যেন আমি চাই। জন্মজন্মান্তর থেকে দেবতার কাছে চেয়ে পেয়েছি। চিরদিন যা চাইবার আমার না চাইতেই পেয়েছি তাতে সুখ সমৃদ্ধিই অনুভূত হ'ত—কিন্তু চেয়ে পাওয়ার লজ্জাকাঙ্খায় বিজড়িত এই ক্ষুদ্র সুখটুকু প্রভাতের তারাটির মত হ'য়ে উঠ্‌ল।

গাদা গাদা বিলিতী নভেল পড়েই হোক্ আর মাথা খারাপের জন্যেই হো'ক্‌ - আমার উত্তাল মনের গতি সেখানেই আবদ্ধ হ'য়ে আছে, এর নিদর্শন আমি অন্তরতম অন্তরে পেয়েছি। আকাঙ্খা যা'দের খুব বেশী তারা হয়ত এত সহজে মন দিতে পারে না, কিন্তু আমি দিয়েছি, দিয়ে ধন্য হ'য়েছি। অনেক নিষ্ফলতা এ প্রাণের সীমা বেষ্টন ক'রে কান্নাকাটি করেছে—কত বিফল করুণ প্রার্থনা সীমাহারা সাগর জলে বুদ্‌বুদের মত উঠে মিলিয়ে গেছে—কিছুক্ষণ পরে তার আর কোন চিহ্নই কোথায় দেখ্‌তে পাইনি, কিন্তু এই ব্যর্থ সাধনার মুখে যে তরঙ্গ ফুলে ফুলে উঠেছে, তা'তে আমি সাঁতার দিয়ে ফিরেছি। আমার এ তরঙ্গ যার হৃদয় কূলে আঘাত করে বেড়াচ্ছে—সমুদ্র বেলার মতই সে শুভ্র, অনন্ত, ধৈর্য্যশীল ! জীবন ভোর বিফলতার দ্বারে মাথা খুঁড়ে—যেখানে এসে পৌঁছেচি—সেখানে নিষ্ফলক্রন্দনে, আর ফিরে যেতে হ'বে না ভেবেই মনপ্রাণ একেবারে নেচে নেচে উঠ্‌লো।

এ-কি রঙীন হ'য়ে উঠ্‌লো আমার চোখের তারা, যার ছায়া সে বুকপেতে নিয়েছে—এ-কি সুন্দর মূর্ত্তি তার! এতদিন কাছে পেয়েও তাঁকে যেন আমি ভালো ক'রে দেখার মত দেখ্‌তে পাই নি, আজ রঙীন নেশায় যে মূর্ত্তি আমার সামনে প্রদীপ্ত হ'ল—সে যেমন সুন্দর তেমনি রমণীরঞ্জক। একটু একটু ক'রে সে রূপের দীপ্তি ঘর ব্যেপে অসীম হ'য়ে উঠ্‌লো; তার অকলঙ্ক শুভ্র জ্যোতিঃ পদমূলে আমি আছাড় খেয়ে পড়লাম।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কি-না স্মরণ নেই—যখন জ্ঞান ফিরে এল—আমার মনে হ'তে লাগল, বহুদিনের পর যেন আমি রোগশয্যা থেকে উঠ্‌ছি, হাতে পায়ে বল নেই, চক্ষু জ্যোতিঃ-হীন, মন যেন কাগজের ফানুষ হ'য়ে গেচে। গলাভাঙ্গা বোতলটা ঘরের কোণেই পড়েছিল, সেটা দেখে আমার রাত্রের কথা মনে পড়ে গেল। কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে সেটা নিয়ে গিয়ে আমি বাড়ীর পিছনের গলিটায় ফেলে দিয়ে এলাম। বারবার মনে হ'তে লাগল—হয়ত রাত্রে খুবলাল বোতলটা দেখে গেছে—কিন্তু তার কোন আভাষ না দেখে কথঞ্চিৎ শান্ত হ'লাম। শরীরে এমন সামর্থ্যও নেই যে উ'ঠে গিয়ে স্নান করে ফেলি। অবসাদ এতই জড়িয়ে গেছে প্রাণে প্রাণে, যেন তা ঝাড়তে গেলেও বেদনা পাব!

খুবলাল চা নিয়ে এল, দু'পেয়ালা চা খেয়ে জড়তা যখন একটু কমলো, আঁচলের চাবী দিয়ে ঘরের দেওয়ালে আঁটা সিন্দুকটা খুলে ফেলে দিলাম। কিন্তু খুলতেই মনে পড়ে গেল আমার সেই মা'কে! সামান্য কয়েক ঘণ্টা যাঁকে আমি দেখেছি, অল্পক্ষণ যাঁর স্নেহ-মধুর হৃদয়ের পরিচয়

পেয়েছি—একদিন কলঙ্কের ভয়ে তাঁর মাতৃত্ব আমার কাছে অতীব ঘৃণ্য হ'য়েছিল, আজ কিন্তু সেই প্রথম মিলনেই চিরবিদায়ের করুণ ছবিটি আমার চোখে ভেসে উঠ্‌লো !

প্রথমেই ক'খানা ছবি দেখ্‌তে পেলাম। আমার সন্দেহ হ'ল—এ-বুঝি আমারই ছেলেবেলার ছবি ! চারখানা ছবিই প্রায় একরকমের ! এখন আমি আর্শিতে নিজের যে ছাব দেখ্‌তে পাই এর সঙ্গে তার কিছুই না মিললেও সেই ক্ষুদ্র বালিকার সৌন্দর্য্য যেন আমার অতি পরিচিত বলেই বোধ হ'তে লাগ্‌ল। শিশুকাল হ'তেই এত সুন্দর আমি ! অস্ফুট কুসুম কলিকাটির মত !—চোখ ফেরাতে পারলাম না। সেই ছবি যতই সৌন্দর্য্য বিমণ্ডিত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল—হৃদয় বেদনায় আমি একেবারে অবনত হ'য়ে পড়লাম। যে নিরুপম সৌন্দর্য্য তুলিকায় আঁকতে বিধাতা কত চেষ্টাই না করেছেন—পৃথিবীতে কেবল মাত্র তা ব্যর্থতা বহন করেই ফিরেছে—সে কার দোষে !—সিন্দুকটার সামনে ছবি হাতে ক'রে আমি স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলাম।

ছ'খানা পোষ্টাফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতা, ক'খানা কোম্পানীর কাগজ, মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো একখানা গানের বহিও দেখ্‌তে পেলাম, সব তাতেই নাম লেখা, কদমমণি দাসী !—নেত্য আমার মা'র এই নামই বলেছিল, তাও আমার মনে আছে ! কোম্পানীর কাগজ ব্যাঙ্কের খাতাগুলির অঙ্ক হিসাব করে দেখ্‌তে পেলাম, সে নেহাৎ অল্প নয়। সেগুলি ভাঁজ করে রেখে সিন্দুকের ছোটখাট ড্রয়ারগুলি খুলে খুলে দেখ্‌তে লাগলাম। তার ভেতর থেকেও ছ'খানা ছবি বার হ'ল—তলায় সহি করা শ্রীমতী কদমমণি দাসী !—এ-ছবি আমি দেখ্‌তে

দিক্‌শহারা

পারলাম না। আর-একটা ড্রয়ার থেকে বেরুল আর একখানা মরক্কো লেদারমণ্ডিত খাতা! খুলে দেখি আমার নাম লেখা! ঠক্ ঠক্ করে হাত কেঁপে উঠল, জিভ শুকিয়ে গেল।

এই সময়ে খুবলাল দরজায় ঘা দিয়ে বল্লে—দিদিবাবু, রঘুবীর আয়া।

কে রঘুবীর জানি নে! আড়ষ্ট ভাবে বসে রইলাম।

খুবলাল আবার ডাকলে—দিদিবাবু!

দরজা খুলতেই খুবলাল একখানা খাম আমার হাতে দিয়ে বল্লে বাবুকা নোকর আয়া। জবাব মাংতা!

চিঠিটা কম্পিত হস্তে খুলে দেখি, সহি রয়েছে—সন্তোষ সেন।"

কল্যাণীয়াসু—

—আমার একান্ত ইচ্ছা আজ মধ্যাহ্নে তুমি আমাদের এখানে আহার কর। যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে, ক'টার সময় তুমি প্রস্তুত হ'তে পারবে লিখে দিয়ো, সেই সময়ে আমি কার পাঠিয়ে দেব। ইতি—সন্তোষ সেন।"

বলে দে—এগারোটার সময়।

সে বল্লে—লিখন মাংতা।

বাড়ীতে একটা দোয়াত কলম দেখতে পেলাম না। বহুদিনের পর আমার বোর্ডিঙের তোরঙ্গটায় নজর হ'ল—তার ভিতরে এক বন্ধুর দেওয়া একটা ফাউন্টেন পেন ছিল—খাতা হ'তে একখানা কাগজ ছিঁড়ে লিখতে গেলাম হা অদৃষ্ট, কালি নাই। সুখের বিষয়, সোয়ান কালির শিশি একটা তার মধ্যে-ই পাওয়া গেল। লিখে দিলাম এগারোটায় গাড়ী পাঠাবেন।

খাতাটা খুলে ফের বসে পড়লাম।

প্রথমেই চোখ পড়ল, যেখানটা—

"নেত্য বলে কি হ'বে ইস্কুল পাঠিয়ে মেয়েকে।......না, না, আমি রাখব কেমন করে এখানে! সে আমি পারব না, কখনই পারব না। নেত্যকে বলে দিয়েছি সে যেন নিশ্চিন্ত হ'য়েই বাড়ী ফিরে যায় মেয়েকে আমি রাখ্‌তে পারব না, পাঠাব বোর্ডিঙে।......আমি খবর নিয়েছি, বেশী খরচা দিলে সে সেখানে বরাবর থাক্‌তে পারবে। মিসেস্‌ মন্দাকিনী নিজেই তার ব্যবস্থা করবেন। বেশ তা না হয় হল, ওকে ছেড়ে থাক্‌তে কি পারবো? বুক ভেঙে যাবে না! কিন্তু সহ্য করতে হ'বে আমাকে!

"এত বড় বুকের পাতাটায় বসিয়েও তা'কে ত আমার তৃপ্তি হয় না. তবু যেন ফাঁক থাকে! এক এক সময় সন্দেহ হয় এমন অবস্থা কি সব রমণীরই হ'য়ে থাকে! কি ভীষণ সে অবস্থা!"

আমি নিঃশ্বাস রোধ করে পড়ে যেতে লাগলাম্‌—

"নেত্য ত তাই বল্লে। তা'র মত, কিছুদিন, বশে রেখে তারপর ছেড়ে দিয়ো। মনের তফাৎ এইখানে! আমি সোনাকে ছেড়ে দেব কিন্তু তার মতলবে নয়—আমি তা'কে ছেড়ে দেব নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক! তার জীবন সে চালিয়ে নিক্‌। যে দিকে খুসী, চায় সে স্বর্গের দেবী হ'তে, হ'ক, আর অভাগিনীর মত নরক প্রার্থনা করে—সে পথ সে নিজেই দেখে নিতে পারবে। এত আলো যে রাস্তায় জ্বলে, এত গাড়ীঘোড়া লোকজনের কলরব সারারাত যেখানে পিশাচের তাণ্ডব করে মরে—সেখানে আস্‌তে আলোর দরকার হয় না কারু!"

আর পড়ব কি-না ভাবছি—হৃদয় যেন বেরিয়ে এসে খাতার সামনে অপলক চোখের মত চেয়ে রইল। পড়লাম—

"তিনদিন কেটে গেছে। কেটেচে মানে আমাকে কুচি কুচি করে কেটেচে। চার বছরের মেয়ে মা-ছাড়া হ'য়ে গেল। মা-তার বেঁচেই মৃত। এজীবনে আর সে মা দেখ্‌তে পাবে না।

"না থাক্—ক্ষতি নেই। তারও নয় মারও নয়। মরার পরে ত কথা নেই, আর আমি ত সত্য সত্যই মৃত।......শুধু, সে আমার বেঁচে থাক। এখানে এসে সর্ব্বশোভাধার স্তবক যেন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ছিল—সে বেঁচে গেছে। মড়কের সময় আত্মীয়বর্গ পালাতে পেরেছে জানলে যেমন আনন্দ হয়,—এ-ও যে এ বিষাক্ত নরক আবাস থেকে সরে যেতে পেরেছে—এতে আমার-ও তেমনি আনন্দ হ'য়েছে। দেখছি এতে নেত্যরই সব চেয়ে রাগ বেশী। আমি ত ভেবেই পাইনে সে কেন এত অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে ওঠে। মেয়ে আমার কাছে থাক্‌লে ভবিষ্যতে সুখ সমৃদ্ধি যে একেবারে উথলে উঠ্‌বে—এ বোধ করি সে পঁচিশবার বলেছে। কিন্তু আমাকে সুখৈশ্বর্য্যে বীতস্পৃহ দেখেও তার পরহিতাকাঙ্খী অন্তঃকরণ যে এত কাঁদছে কেন এ ত জানিনে। নেত্য বল্লে, ডবল দাম দিব। আমি বল্লাম—আমি কসাই নই। নেত্য ভয় দেখালে—পুলিশ। আমি বল্লাম—বহুৎ আচ্ছা। নেত্য বল্লে—আচ্ছা থাক্—আমিও বল্লাম থাক্।

"নেত্য আমার কি করবে! তার মত চারটে নেত্যও তার পুলিশ আত্মীয়দের আমি টেনে গারদ দিতে পারি—এই ক্ষমতাই যদি না রাখ্‌ব তবে আর কি করলাম এতদিন!

"ভাবনা নেত্যকে নয়, ভাবছি কি করব! বড় হ'লেও যে ওকে কোনদিন এ বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াতে দিতে পারব না তাও জানি। তাই ভাবছি সংসারে আত্মীয়শূন্য বালিকা কি করবে! কে তার হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে!

"আবার ভাবি সে-ভেবে ফল কি! আমার কাছে থাকলেও তার উপায় ত কিছু করতে পারব না—তাতে তার ইষ্টের চেয়ে অনিষ্টই ঘটবে তাই বা আমি প্রাণ ধরে সহ্য করব কেমন করে! সে পারে নিজে পথ দেখে নেবে। আমি তা'কে আশীর্ব্বাদ করি—বিধাতা যেন তার বিচরণ পথটি আলোকিত করে দেন—নারীজীবন তার ধন্য হয়!

"নেত্য সুখ সমৃদ্ধি আশায় মেয়েকে কাছে রাখতে বলেছিল, আমার মনে হল সে যদি দুবেলা দুমুঠো খেয়ে গড় পরে' জীবনাতিবাহিত করে, আমার দুঃখ নেই—তবু আমি তা'কে 'সুখী' করতে পারব না। সুখে থাক দুঃখে থাক তার জীবনে যেন একটা আলোই জ্বলে, আমার বলে যেন সে একজনকেই আলিঙ্গন করে—তা'তে না যদি সে সুখ পায়, যেন আত্মহত্যাও করে! তার চেয়ে সুখ এ-ভুবনে নেই, অন্য কোথাও আছে কি-না তাও আমার অজ্ঞাত! তাকে যে বিবাহ করবে, ভগবানের একান্ত আশীষ তার পরে ত পড়বেই—আমিও ব্যাঙ্কে তার নামে আমার যথাসর্ব্বস্ব গচ্ছিত করে দেব।

"নেত্য বলে, তার মেয়ে ছিল বলেই পায়ের ওপর পা রেখে সে বসে খাচ্ছে। এমন খাওয়ার মুখে ঝাঁটা মারি! নেত্যর সঙ্গে আর একটি মেয়ে আসে, দেখেছি নেত্য তার' পরেও সন্তুষ্ট নয়। সে নাকি নেত্যর

কথা মানে না, রোজগার পত্র করতে পারে না—তাই সে থিয়েটারে ঢুকেছে। বেশ মেয়েটি, বয়েস বোধ করি ষোল সতেরোর বেশী হ'বে না। তার মুখখানি, চোখ্ দুটি দেখে আমার কষ্ট হয়। থিয়েটারে ঢুকেছে বলে নেত্যর আরও রাগ। নেত্য তা'কে কোটা বালাখানা করে দিতে চায় কিন্তু বালাখানায় বাস করতে তার লোভ নেই, নেত্য আমার সামনে তা'কে যাচ্ছে তাই করলে, ফুলী চোখ ছলছল করে' দাঁড়িয়ে রইল।"

এ-যে সেই ফুলী তা আমার বুঝতে বাকী ছিল না। আমারই মত যে যখন যার সম্পর্কে এসেছে, চোখের মোহ যে সকলের পরেই সমানভাবে পড়েছে তার আর সন্দেহ নেই। খাতার অক্ষর মুছে গিয়ে ফুলীর চোখ্-দুটি জ্যান্ত হ'য়ে উঠ্ল।

দু'তিনমিনিট পরে আবার আমি পড়তে লাগলাম :—

"দিব্যেশকে আমি বুঝিয়ে দিয়েচি, কিন্তু তাতেও সে বিচলিত হয় নি। তার থেকেই আশা হ'চ্চে সোণা সুখী হ'তে পারবে। তাই হ'ক, —আর কিছু আমারও বলবার নেই, তারও নেই। এরা দু'টতে মিলে যাক্, মিলে যাক্।

"তাকে আনিয়ে হাতে হাতে সমর্পণ করে আমি নিশ্চিন্ত হ'ব। তারপর যদি এ-পাপ জীবনাবসান হয় তা'তেও আমার দুঃখ থাক্‌বে না। নেত্যর 'সুখের' চাইতে আমার মৃত্যু ঢের ভালো, ঢের বাঞ্ছনীয়। ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমিই তার গর্ভধারিণী জননী, তবু মার কর্ত্তব্য কতক পরিমাণে করতে পেরেছি জান্‌লেও মৃত্যুর পরে বিধাতা আমাকে অনেক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবেন—এই আমার আশা, ভরসা, এই আমার

কামনা। আর কিছুই চাইনে আমি জীবনে! তারা দু'জনে যখন আত্মদান করবে, মরতে পারলে আমি বাঁচতে চাইব না।"

"দিব্যেশকে বলেছি বে'র পর সে যেন মেয়েটাকে নিয়ে কোন বিদেশে চলে যায়। সে তা'তে রাজী হয়েচে। তার বন্ধুদেরও দেখলুম সে-ই ইচ্ছা। না হ'বেই বা কেন? লোকে ত বুঝ্‌বে না, কোন কৈফিয়তেই তাদের মনে এ ধারণা কিছুতেই হ'বে না যে আমি তা'কে শুধু প্রসব করেছি; স্তনের দুগ্ধ দিয়েছি; আর কোন সম্বন্ধই তার সঙ্গে আমার নেই। দিব্যেশের আত্মীয় বন্ধুর কাছে না থাকাই মঙ্গল। চ'লে যাক্, বাঙ্গালার বাইরে, সেখানে বাঙ্গালী নাই, জাত আর জাত করে যে দেশের লোক মাথা ঘামিয়ে অল্পবয়সেই মরে যায় না. অন্য অনেক কাজে মেতে দীর্ঘায়ু হ'য়ে বেঁচে থাকে সেই দেশে চলে যাক্! পুরুষ মানুষ তার ভাবনা কি! আর যা'কে সে জীবন সঙ্গিনী পাচ্চে সে ত কেবল পাঁচসাতটা অঙ্কের টাকার চেক্ নিয়েই ওর সঙ্গে যাচ্চে না। সে যে সত্য সত্যই ওর জীবনে সব রকমে সঙ্গিনী হ'তে পারবে।

"আর একটা শুভ লক্ষণ দেখলুম, দিব্যেশ তার সেই গৌরবর্ণ সুন্দর বন্ধুটির মুখাপেক্ষী বলে মনে হ'ল। জানি না কেন! সে ছেলেটি কম কথা কয়, কিন্তু দেখে সব চেয়ে তা'কেই আমার হৃদয়বান মনে হ'য়েছিল। সেই ছেলেটিকে দেখে আমার যা ধারণা হ'য়েচে তা লিখ্‌তে দোষ নাই—সে থাকতে তার বন্ধু বা বন্ধুপত্নীর অমঙ্গল হ'বে না—এ যেন আমার মন বুঝ্‌তে পেরে ভারী উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছে!"

আমি খাতাখানা মুড়ে কোলের পরে চেপে আর একবার ভেবে নিলাম তাঁকে, যাঁর একটি কথা না শুনেও, শুধু চোখে দেখেই আমার

সেই মা এত বড় উচ্চ ধারণা করতে পেরেছিলেন। যা দিব্যেশকে ভুল বুঝেছিলেন, কিন্তু এখানে যে তিনি অভ্রান্ত সত্য, এই দুটি কথা যেন তাঁর হাতের লেখার পাশে বসিয়ে দিতে ইচ্ছা হ'য়েছিল।

আবার একজায়গায় —"এক এক সময় মনে হল এ পাগলমি নয় ত কি! এ সব লেখবার কি বা দরকার ছিল? আবার মনে হয়, না, না দরকার আছে বৈ কি। যে পথ তার নিষ্কলঙ্ক, অম্লান রাখতে কোন চেষ্টার ত্রুটী করি নি, লোকের কাছে সে কথাটা বলে যাবার দরকার আছে বৈ কি! পিতৃমাতৃহারা বালিকা আর সে মা দেখতে পাবে না।"

—আমার মনে হ'তে লাগল - আমার মা'র সেই আকস্মিক মৃত্যুর কথা! হঠাৎ আমার নিজের দুঃখ অপমান লাঞ্ছনা সব ভুলে গিয়ে এই কথাই আমার বার বার করে মনে হ'তে লাগল—বুঝি সে মৃত্যু তাঁর নিজের আহ্বানেই তাঁকে গ্রাস করেছে। হা হতভাগিনী জননী আমার! তুমিই আমার মা!

যদিও তাঁর মঙ্গলেচ্ছা আমার জীবনে অপূর্ণই থেকে গেছে, তবু তাকে পূরণ করবার জন্যে তাঁর যে আগ্রহ যত্নের ত্রুটী হয় নি এ বুঝেই আমার বুক একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল।

"শিশু আমার ঘরে না জন্মে আর কারু হাতে পড়লে কোন কথাই ছিল না; হতভাগিনীর এমনই বরাত এমন হাতে পড়ল, যার দান গ্রহণ করলে নারায়ণ মূর্ত্তি ব্রাহ্মণও অপবিত্র হয়! দরকার আছে বৈ কি! অবশ্য মুখে বলাও যেতে পারে, কিন্তু সে সৌভাগ্য যদি না ঘটে! মেয়েকে সুখী দেখে মরবার সৌভাগ্য যদি এ হতভাগিনীর অদৃষ্টে

বিধাতা না লিখে থাকেন, তখন, তখন! না আমি লিখ্‌ব। যতদিন বেঁচে থাক্‌ব লিখব। ওর বিয়ের পর ও যে চিঠিগুলি লিখবে, আমি যা জবাব দেব, সব লিখে রাখব। তারপর, একদিন, যেদিন এ কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হ'য়ে যাবে, চোখের জ্যোতিঃ একদম নিবে যাবে, যেদিন তা'কেও আর দেখবার ক্ষমতা থাকবে না, সেই শেষের দিনটিতে এই খাতাখানা যৌতুক দিয়ে যাব। তার আগে দেব না। আর কেন দেব না—তা বোধ করি যখন তারা জান্‌তে পারবে আমার ওপর রাগ করবে না। আমি ত চাই নি যে দিব্যেশ আসুক, বিয়ে করে' নিয়ে যাক্—আমি তার হাতে পায়ে ধরেও তা'কে আনি নি। সে নিজে এসেচে, সে ত পরিচয়ের কোন তোয়াক্কাই করে নি, তবে কিসের এত তাড়া! যে রত্ন তা'কে আমি দিচ্ছি, সে-ই যে মহামূল্য। নাই-বা থাকল তার গায়ে দু'চারটে টিকিট মারা, হীরে, কোহিনূর হীরে, পোখরাজ, মরকত! টিকিটে কি জিনিস যাচাই হয়? যাচাই হয় আসল জিনিষটায়! সেটায় ত আর খাদ নেই, দাগ-ও নেই—সে যে বেদাগ হীরে! শেষ দিনে এই যৌতুক দিয়ে মেয়ে-জামাইকে আশীর্ব্বাদ করে যাব। ভগবান করুন, সেদিন শীঘ্র আসুক! আমার এতে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। এ-জীবন অনেকদিনের অসার, অপদার্থ হ'য়ে গেচে, আর একে বইতে পারি নে! এই দু'দিন ত কায়মনে সেই প্রার্থনাই করছি তাঁর কাছে। জানি না পৃথিবীর মানুষের মত তাঁরও জাত-বিচার আছে কি না, তাঁর আদালতে আমার আবেদন উঠ্‌চে কি-না, আমার ত উকীলও নেই, মোক্তারও নেই, কোর্টফি দেবার সম্বলও যে নেই, হায়! তবে কি তাঁর চরণেও আমার কামনা পৌছুবে না, হায়! তবে আরও

দুঃখের বোঝা এই ঘৃণ্য অস্পৃশ্য জীবনটাকে ব'য়ে বেড়াতে হ'বে! ভাবতেও যে বুক ফেটে যায়!

এর পরে আর লেখা ছিল না। বোধ করি, এর পরই আমি এসে পড়ি, আর লেখবার সময় তাঁর হয় নি!

খাতাটাতা মুড়ে আমি আমার বাক্স তোরঙ্গ গুছিয়ে নিতে বসে গেলাম। বোডিংয়ে ফিরে যাব আমি। কারু আশ্রয় চাই নে, কারু অনুগ্রহে, অনুকম্পায় আমার প্রয়োজন নেই। সেইখানে ফিরে যাব, আর আজই যাব, আজই যাব।

এতদিন কেন এ ইচ্ছা হয় নি এই ভেবে আমার নিজেরই গলাটা টিপে ধরতে ইচ্ছা হ'তে লাগল। ক্ষিপ্রহস্তে সব গুছিয়ে ফেলতে লাগলাম।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

উৎসবের মুখে।

পৌনে এগারটার সময় সহিস হাঁকলে—দিদিজী গাড়ী আয়া!

ভাবলাম বলে দিই, যাবনা!—আবার ভাবলাম,না আজ শেষ দেখাটা করে আসি; এবং কে যেন হাত ধ'রে কলঘরে টেনে নিয়ে গেল আমাকে! কোনমতে স্নান সেরে উপরে উঠে এলাম। আজ আর বেশভূষায় মন ছিল না,—খাতাখানা বুকের কাপড়ে গোপন করে' গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

সেন নিজে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন, নিজের হাতে দরজা খুলে বল্লেন— আসুন।

আমি নামতেই বল্লেন— এই ত আমি চাই!

কি ?

আপনাকে ত অনেকবার দেখেছি, কিন্তু এত ভালো কোনদিন লাগে নি আমার! সত্যি বলচি আমার চোখ্ জুড়িয়ে যাচ্চে আপনাকে দেখে!

আমার চোখ্ মুদ্রিত হ'য়ে আসছিল, আমি নত মুখে ঘরে ঢুকে পড়লাম। সেটা সেনের বৈঠকখানা! দেওয়ালে, টেবিলে যেদিকে চাই—ছবি আর ছবি! সবগুলিই বঙ্কিমের ছবি, কেবল একখানা তৈলচিত্র সেন দম্পতীর!

সেন আমাকে একখান শোফা দেখিয়ে বল্লেন· বসুন লীলা গঙ্গা-স্নানে গেছে, এখনও ফেরে নি।

কিন্তু মানব মনের একি বিকার! একি অবিচার! এত বড় গৃহে এক সেন ছাড়া আর কেউ নাই শুনে ত আমি আশ্বস্তই হ'য়েছিলাম, অল্পক্ষণ না অতিবাহিত হ'তেই সেই ঘরে সেনের সামনে একা আছি জেনে কেমন একটা কাঁটা কোটার মত আমি এদিক-ওদিক করতে লাগলাম।

সেন বোধ করি এই কথাটাই বুঝতে পেরে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন— কিছুক্ষণের জন্যে যদি ক্ষমা করেন একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ সেরে আসি।'

আমি মূঢ়ের মত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ভাবছিলাম—এ কি ব্যঙ্গ! আমার অনুমতি নিয়ে তবে তিনি প্রয়োজনীয় কাজে যাবেন।

সেন বল্লেন—তবে থাক্—পরেই হ'বে খন।

আমি ত্বরিত উত্তর দিলাম—না, না—যান-না আপনি। দরকারী কাজ যখন আছে . ...

সেন বাধা দিয়ে বল্লেন - এত দরকারী নয় যে তোমাকে একেলা ফেলে, তোমার বিনানুমতিতে যেতেই হ'বে।

মনে আমার যে চিন্তাটি উঠেছিল, সেইটিই যেন হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—একেলা ফেলে এ কথাটা আপনি বলতে পারেন, কিন্তু আমার অনুমতি চাওয়াটা কি ব্যঙ্গ করা নয়?

সেন আর্ত্তের মত বলে উঠ্‌লেন—না ব্যঙ্গ কথা নয়। সত্যিই আমি যেতে পারি না, আপনার বিনানুমতিতে!—এক মিনিট থেমে আবার বল্লেন—পারি কি আপনিই বলুন, আপনি আমার অতিথি যে।

ওঃ—বলে আমি সোফাটায় হেলান দিয়ে পড়লাম।

আমি সেনের মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম না। তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে খুব জোরে ঘন ঘন টান্‌ছিলেন, তারই ধোঁয়ায় তাঁর মুখখানি একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেছল। ধোঁয়ার ভেতর থেকেই সেন বল্লেন - লীলারা গঙ্গাস্নানে গেল, আমারও একটা বিশেষ কাজ ছিল বাইরে যা'বার, কিন্তু আমি যেতে পারলুম না। কেন পারলুম না জান? তুমি আস্‌বে বলে'। তোমাকে অভ্যর্থনা করব বলে সব কাজ ফেলে আমি দরজার কাছটিতে বসে রইলুম। তুমি কিন্তু অক্লেশে বল্লে—তোমাকে আমি ব্যঙ্গ করলুম।

দু'তিন মিনিট পরে সেন আবার বল্লেন—তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে সেই সেদিনের—কাশী যাবার সময় ট্রেণের কথাগুলি। দিবোশের

ধোঁকায় তুমি যখন গৃহ ছেড়ে এসেছিলে, এবং সে তোমায় অসহায় ফেলে যখন পালিয়েছিল তখন ত কেউ বাদ যায় নি, তুমি নিজে পর্য্যন্ত তোমার অবিমৃষ্যকারীতাকে ব্যঙ্গ করেছ—কিন্তু আমি করি নি। মনে আছে কি তোমার ?

সেন পুনরায় বল্লেন—তাহ'লে তুমি ভোল নি ! বঙ্কিম, আমার যত প্রিয়ই সে হোক, সে তোমাকে বিদ্রূপ করেছিল - তার ওপরও আমি সন্তুষ্ট হ'তে পারি নি। তখন কি তোমাকে ব্যঙ্গ করা চল্‌তে পারে ? বাস্তবিক বল্‌ছি তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা ত সম্পূর্ণ অন্য-রূপ ছিল কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জান্‌তে পারলুম যে মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ ক'রে দিব্যেশ তোমাকে নিয়ে এসে পথে ছেড়ে দিয়েছে সেই মুহূর্ত্তে আমার হৃদয়মন ভরে গেছল, তোমার প্রতি অনুকম্পায়, স্নেহে, আর দিব্যেশের প্রতি ঘৃণার রোষে।

শুধু তাই নয়। এত বড় একটা প্রতারণা, আমার নাম নিয়েই সাধিত হ'য়েচে এ দুঃখ আমার কোন দিনই যাবে না।

আমি প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বল্লাম, না না, আপনার নাম নিয়ে সাধিত হয় নি। সে নিজের নাম করেই সব করেছিল।

সেন আমার মুখের দিকে আধমিনিটকাল চেয়ে বল্লেন—তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার ত মনে আছে সে সর্ব্বনেশে চিঠিটা। সে ত স্পষ্টই স্বীকার করেছিল যে আমার জন্যে সে এ কাজ করেছে।

সে কথাটা আমারো যে মনে না ছিল তা নয়। এবং সে কথা মনে করতে আজ বুকে শূল বেদনা উপস্থিত হয় যে একদিন তাঁরই বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলাম। পারি নি, পঙ্গু পর্ব্বত

লঙ্ঘন করতে অপারক হয়, আমিও আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় তাঁকে স্পর্শ করতেও পারি নি। মনে হ'চ্ছিল যে আমার সেই অক্ষমতা স্বর্গীয় আলোক বিমণ্ডিত হ'য়ে ফুটে উঠেছে।

যে সময়টুকু এই কথাগুলি আমি ভাবছিলাম, সেন যে ততক্ষণ একদৃষ্টে আমার মুখের দিকেই চেয়ে বসেছিলেন মুখ তুলে তাই দেখে আমার চোখ দু'টো একেবারে জুড়িয়ে গেল। আমি চোখ নামিয়ে নিতেই সেন বল্লেন—আমার ঘাড়ে যদি দুনিয়ার সব শয়তান চেপে বস্‌ত তবুও আমি এমন পাপ কাজ করতে পারতুম না, যা সে আমার নাম করে' করেছে। সে শয়তান ভেতরে ভেতরে এই সব মতলব এঁটেছে আমি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতুম—তা'কে আমি গুলি করে ফেলতুম।

রাগে তাঁর চোখ দুটো জ্বলে জ্বলে উঠলো। দেখে সত্যিই আমার ভয় হ'য়েছিল। কিন্তু সে-যে আমারই ঘৃণিত জীবনের আলোচনা আমি তাঁকে শান্ত করবার মত কোন কথাই খুঁজে পেলাম না।

মিনিট দুই পরে সেন গম্ভীরভাবে বল্লেন—বললে তুমি বিশ্বাস করবে কি-না, যে করেই হো'ক্—তোমার দুঃখ আমাকে যত বেজেছিল এত আর কাকেও বেজেছে কি-না সে আমার জানা নেই এবং আমার সর্ব্বস্ব দিয়েও তোমাকে সুখী করতে যে আমি কার্পণ্য করি নি, করব না, এ হয়ত এক দিন তুমি জান্‌তে পারবে। এবং আমার অনুরোধ……

কেন তিনি থাম্‌লেন মুখতুলে, দেখতে গেছি, সেন অতি নিম্নকণ্ঠে বল্লেন—সেইদিন, যেদিন বুঝতে পারবে, সেইদিন আমার প্রতি কোন বিদ্বেষ তুমি রেখ' না তাহ'লেই আমার সকল শ্রম সার্থক হ'য়েচে জেনে আমি ধন্য হ'য়ে যাব। নইলে বুকের এ ব্যথা কোন দিনই আমার ঘুচবে

না এবং নিরপরাধিনী বালিকার সর্ব্বনাশ করেছি এর পাপে আমাকে আমরণ নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'বে।

বলতে কি, আমার মনে হ'ল যেন সেনের কণ্ঠে অশ্রু উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিল। তাঁর হৃদয়মন যে অতীব কোমল, পরদুঃখ কাতর, সে ত আমি জানি—তবু এই হতভাগিণীর কথা বলতে যে তিনি কেঁদে ফেল্লেন—এর ব্যথা যত প্রবল হোক্ আমি সর্ব্বনাশিনী যেন সুখী হ'য়েই চোখ তুললাম।

সত্য সত্যই তাঁর চোখে জল! নদীর দু'কূল ভরে ছাপিয়ে উঠেছে—একেবারে কাণায় কাণায়। যদি আমি উঠে গিয়ে বুকের বসন দিয়ে তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারতাম তবেই আমার ক্ষোভ মিটত। কিন্তু সে ত' অত সহজ কথা নয়। স্পর্শ করব কা'কে? দেবতাকে স্পর্শ করতে সাহস হয় এ পৃথিবীতে ক'জনের? কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দিরে দেখেছি—কত নরনারী বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে ধন্য হ'য়ে চলে যাচ্ছে, সে সুযোগ আমিও পেয়েছিলাম। আমার সঙ্গের সেই খোট্টা বউটি আমাকে বলেওছিল কিন্তু আমি পারি নি ত! স্পর্শ করা দূরে থাক্ —মন্দিরের ভেতর অবস্থান করবার মত পবিত্রতা নেই বলেই আমি পালিয়ে আসতে পথ পাই নি যে! আর কেন পারি নি, আজও কেন অক্ষম হ'লাম তা আমি নিজের মুখে না বল্লেও কোন্ সতী রমণী তা না বুঝতে পারবেন?

সেন নিজের হাতেই অশ্রু মুছলেন। একটু পরে কোমল কণ্ঠে বল্লেন—সোণা, আমার চেষ্টায় নয়, ভগবানের দয়ায় যদি সংসারের সুখ-শান্তি পেয়ে কোনদিন আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে মাপ করতে পারো,

আমাকে খবর দিয়ো, সেইদিন আমাকে খবর দিয়ো, সেইদিন ভালো করে' দেখে আস্‌ব তোমাকে! প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করে আসবো।

আমি সোফা থেকে উঠে সেনের পায়ের তলায় মাথা পেতে দিয়ে বল্লাম—তার দরকার নেই, আজিই আমাকে আশীর্ব্বাদ করুণ—আমি ধন্য হয়ে যাই।

সেন কি করলেন! সেন দু'টি হাত বাড়িয়ে একেবারে তাঁর সামনে টেনে তুলে বল্লেন—তোমার মঙ্গল, সে ত—যেদিন থেকেই তোমাকে জেনেছি সেই দিন থেকেই করেছি। কিন্তু এ ত তা নয়। তুমি সুখী হ'য়েচ, তোমার জীবন আনন্দ পরিপূর্ণ হ'য়েচে জান্‌লে তবে না আমার মুক্তি!

এর চেয়ে সুখ আমার বরাতে! হারে বরাত আমার! এ-যে সকল সুখের সেরা সুখ! এ-যে সব দুঃখ কার স্পর্শে অমৃতময় হ'য়ে উঠেছে আমার!—তিনি হাত ছেড়ে দিতেই আবার তার সামনে বসে পড়ে আমি বল্লাম—আপনি দেবতা।

সেন হাসলেন বল্লেন—হা দেবতাই বটে; আজ না, এই কথাটি আর একদিন বলো, বিশ্বাস করব—আজ নয়।

আমাকে আপনি বিশ্বাস করবেন না? আমার অন্তরের সত্যও যদি আপনার বিশ্বাস না হয়—বল্‌তে বল্‌তে আমি কেঁদে উঠেছিলাম। তাঁরই দু'জানুর মধ্যে মুখ রেখে কাঁদছি, সেন নত হ'য়ে আমার চুলের মধ্যে আঙুল পুরে দিয়ে স্নেহনিষিক্তস্বরে যা বলে উঠলেন—তা সে যেমন শান্ত শীতল তেমনি উত্তেজক। আমার চোখের বন্যা তাইতেই গর্জ্জন

ক'রে উঠলো, আবার তখনই জল-পড়া আগুণের মত নিঃশেষ হ'য়ে গেলো।

সেন আমাকে তুলতে তুলতে বল্লেন—এত বিশ্বাস কা'কে করেছি [illegible], যার [illegible]ছে এত কথা বল্‌তে পেরেছি। তোমাকে বিশ্বাস করি [illegible] তা যদি না করব, এত অর্থব্যয়, শ্রমের কি প্রয়োজন ছিল আমার [illegible] আমি কি বিশ্বাস ক[illegible] যার মেয়েই তুমি হ'ও, যে [illegible] থাক্—তোমার জীবনের যে সে লগ্ন নয়—এ [illegible]ক আমি [illegible] না জান্‌ব যদি—তোমাকে ছুঁতে, তোমাকে এমনি করে তুলে [illegible]তে পারতুম আমি, যে জীবনে এক লীলা ছাড়া কোন রমণীর [illegible] স্পর্শ করে নি! কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একা লীলাই ছিল আমার [illegible]। আজ আমি যখন ভাবি, যে সে ছাড়া আর একজনের [illegible] স্পর্শ করেছি, আর একজনের বাহু লতা আমার এই বিস্তৃত বুকের [illegible] হয়েছে তখন যে কেবল তোমারই পবিত্র আনন্দ মূর্ত্তি [illegible] মনে ফুটে উঠে, সে কি তোমাকে অবিশ্বাস করেছি ব'লে?

আমার হাত দু'টো যেন লৌহ হ'য়ে সেই বক্ষচুম্বকে আবদ্ধ হ'য়ে [illegible]। সেই হাত দু'টি যেন বিদ্যুতের তার—তারই ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে উঠে আমার বুকের ভেতর সমস্ত বুকখানাকে দুলিয়ে দুলিয়ে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে যেন দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে দিচ্ছিল।

সেন কি তা জান্‌তে পেরেছিলেন! আমার ভেতরে যা ঘটছিল, যা হ'চ্ছিল, সে ত কেবলমাত্র আমিই সঙ্গোপনে অনুভব করেছিলাম, তিনি তা জান্‌লেন কি করে? এবং তার এই জ্ঞানই যে আমাকে মুহূর্ত্তে পতনের

আঘাত থেকে রক্ষা করেছিল তা আমি জান্‌তে পেরেই আমার মুখখানা অকস্মাৎ জলে ভরে গেল। যে-লৌহ চুম্বুকে বদ্ধ হ'য়ে লেপে ছিল, আমি যা ছাড়াতে পারি নি—সেন সেই হাত দু'টি টেনে একেবারে আমার মুখখানা তাঁর মুখের কাছে এনে বল্লেন—ছিঃ কাঁদে কি! মুছে ফেল—আস্তে আস্তে পাশের চেয়ারটায় বসিয়ে দিয়ে বল্লেন—আবার কাঁদ যদি—চলে যাব।

চোখের জল গোপন করতে আমি নতমুখে আড়ষ্ট হ'য়ে বসে রইলাম। তাঁর স্নেহের নিষেধে যে আমার বুকের ক্ষুব্ধ সমুদ্রের বারি উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিল—আর কি তাঁকে আমি দেখতে পারি? তাঁকে অন্য দিকে নিযুক্ত করতেই হাঁতড়ে হাঁতড়ে বুকের মধ্য থেকে খাতাখানা টেনে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন—পড়ে দেখবেন?

সেন প্রথম পাতাটা খুলেই হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—জীবনী লিখেছেন না-কি?

আমি চুপ করে নিশ্বাস রোধ করতে লাগলাম।

সেন বল্লেন—আপনি বড় মিথ্যাবাদী!

আচমকা কেউ যেন আমার গলা টিপে ধরলে! আমি বলতে গেলাম কি, ঠোঁট দু'টিই কেঁপে উঠলো, আর কিছু না।

সেন খাতার পাতায় চোখ দিয়ে বল্লেন—তবে যে বড় মিথ্যা বলেছিলেন যে আপনি লেখেন না?

নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলাম—আমি লিখি নি।

তাই দেখছি বলে' তিনি পড়তে লাগলেন। খানিক পরে বল্লেন—ঠিক হ'য়েচে—এই ত আমিও বলছি।

কি বলছেন—জিজ্ঞাসা করতে যাব, ছবি উঁকি মেরে বল্লে—বৌদিমনি, এই যে তিনি এসেছেন।

সেন দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—আপনি বাড়ীর ভিতর চলুন, আমি আস্‌ছি।

আমার পা আমি সোজা করতে পারলাম না। লীলা সহাস্যে ঘরে ঢুকে বল্লে—এই যে বের ক'ণে সেজে এসেছে!—বলে সে সেনের দিকে চাইতে লাগল। বোধ করি সেন তা'কে চোখে চোখে কি বলে দিলেন, লীলা আমার হাত ধরে বল্লে—এস।

কাঠের একটা হালকা পুতুলকে যেমন টেনে নিয়ে যায়—সে'ও আমাকে তেমনি করে টেনে তার ঘরে নিয়ে গেল। বসিয়ে বল্লে—একমিনিট, আসচি, পা ধুয়ে! আজ ত আর জল টল খেতে নেই!—বলে' চলে গেল।

বসে বসে আমি ভাবতে লাগলাম, আজ বুঝি কোন পালপার্ব্বন আছে, গঙ্গাস্নান করে ব্রত উদ্‌যাপন করবে, তাই নিজেও খাবে না, আমাকেও খেতে দিতে আপত্য আছে। তা হ'ক,—ক্ষুধা আমার খুব বেশী নেই।

একমিনিট বলে গেছল সে পাঁচ সাত মিনিট কেটে গেল, তবু তার দেখা নেই। আমি ভাবতে লাগলাম—সেন এখনও নিশ্চয় বসে খাতাটিই পাঠ করচেন! এই ভাগ্যি যে-সে আমার লেখা নয়! আমার হ'লে কি তাঁর সামনে ধরে দিতে পারতাম?

যখন মনে পড়ে, কি ভুলই তাঁকে আমি বুঝেছিলাম, কি অবিবেচনাই না করেচি সেই ভুলের বশে তখন আর আমার লজ্জায় নিজের কাছে

মুখ দেখাতে ইচ্ছা হয় না। একমাত্র সেনের বিশ্বাস অবিশ্বাসের উপরই যেন এ জীবন নির্ভর করছিল, এই ভেবে আমি কেবলই দ্বারের পানে ঘন ঘন চাইছিলাম, একবার যদি শুন্‌তে পাই, সেন এসে বলছেন—সোনা—খাতার দরকার ছিল না। আমি ত তোমাকে অবিশ্বাস করি নি।

দশ মিনিট পরে লীলা, আর দু'টি রমণী, না, না—একটি রমণী, আর একটি কি বল্‌ব—চাঁপার কুঁড়ি—কি তার চেয়েও—আধফোটা ফুলটির মত একটি মেয়ে—সব ঘরে এলেন। সকলের মুখে চোখে উজ্জ্বল হাসি যেন আবীরের মত ফুটে রয়েচে।

প্রথমেই ছবির মা বল্লেন—অমন মুখটি নীচু করে রয়েছ কেন বন্ধু? লজ্জা কিসের? কাল রাত্রে ভাই তোমার কথা শুনেচি। শুনেই তোমাকে ভালোবেসে ফেলেচি।

ছবি বল্লে—আমিও ভাই।

লীলা বল্লে—আমার ত কথাই নেই।

মা-মেয়ে এরা সবাই একসঙ্গে হাস্যপরিহাস করে—আশ্চর্য্য!

ছবির মা বল্লেন—বৌদি না-হলে ত সকল কথা শুন্‌তে পেতাম না।

আমি এ কথার অর্থ সম্যকরূপ বুঝতে পারি নি।

লীলা বল্লে—দেখ্‌লে ত. বৌ-দি হওয়ার কত সুখ! মামী হ'লে দূর থেকে গড় ক'রে সরে' দাঁড়াতাম।

ছবির মা হেসে বল্লেন—আমি ভাই, ঢাকায় থাকি। বছরে একবার করে' হুগলীতে বাপের বাড়ী আসি, ফেরবার সময় লীলার সঙ্গে ফি-বছরই দেখা করে যাই—এবার ভাই তোমাকে পেয়েচি। তোমার সঙ্গে এ ভা

কিছু পাতিয়ে যাই। কি পাতান যায় বল দেখি?—আচ্ছা-ভাই—তুমি কেন আমার বেয়ান হ'ও না,—হ'বে?

আমি আগেই বলেছি, ছবির মা আমার চোখে একখানি ছবির মতই লেগেছিলেন। এত যে বয়স হ'য়েছে, আজ বাদে কাল যাঁর জামাই হ'বে, তাঁর চেহারায় ব্যবহারে তা জানবার উপায় ছিল না। পাতলা ফিন্‌ফিনে চেহারাটি, কুন্দকলিকার মত শুভ্র মনটি যেন সরু ডালটির' পরে সন্ধ্যায় ফোটা রজনীগন্ধার মত বাতাসে দুলছে, হাস্‌চে, মধু বিলোচ্চে। তাঁকে যেন চিরকিশোরী করে রেখেচে! অনেক সুন্দরী শিরোমণি আমি দেখেচি কিন্তু এমনটি আর দেখি নি! এঁর মন যেন সন্ধ্যের হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়, প্রভাতের আলোয় চিকমিক করে, বয়স যেন তাঁর নাগাল পায় নি!

'কি-ভাই চুপ করে রইলে-যে—হবে না?

আমি লজ্জায় মাথা তুলতে পারলাম না। কুমারী মেয়েরা খেলাঘরে এ-হেন সম্পর্কও পাতায়, কিন্তু এত খেলাঘর নয়, আর খেলাঘরের বয়সও কারু নেই, না তাঁর, না আমার!

অতি কষ্টে বল্লাম—আমার কি কিছু ঠিক ঠিকানা আছে……

ছবির মা বিস্মিতনেত্রে বল্লেন—সে-কি ভাই? লীলা যে …

লীলা বল্লে—আর অঠিক কিছু রইল না ভাই। কাল সব ঠিক হ'য়ে গেছে। দিব্যেশ বাবু এসেছিলেন, আমারা তাঁকে সম্মত করেচি।

'সম্মত করিয়েছি'—আমার আর নিশ্বাস পড়ল না।

লীলা বল্লে—প্রথমটা তিনি অনেক ওজর করেছিলেন, শেষে আমিই তাঁকে জোর করে' সম্মত করিয়েচি।

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লাম—জোর করে সম্মত করিয়েচেন? কি দরকার ছিল তার?

দরকার একটু ছিল বৈ-কি! খাতার কথা তিনি ত আর কাল জান্‌তে পারেন নি। আমরাও জানতাম না। এখনি আমাকে ডেকে খাতার কথাটা বল্লেন—তা ভালোই হয়েছে—কোন হাঙ্গামা আর রইল না। কোথায় পেলেন খাতাটি! দিবোশ বাবুরও আর কিছু বলবার রইল না খাতাটা এনে ভালোই করছেন।

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠ্‌লাম—আপনি কি মনে করেন, এইজন্যই আমি খাতা এনেছি?

লীলা একমুহূর্ত্ত পরে উত্তর দিলে—শুধু মনে করা কেন তা ছাড়া আর কি কারণ হ'তে পারে, বল?

এ-কি রুদ্ধ বেদনার ভারে আমি প্রপীড়িত হ'তে লাগলাম, কোনদিক থেকেই যার কোন সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি না—আর প্রকাশ করবার ক্ষমতাও নেই—আমি লীলার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার মধ্যে যে ঝড় প্রলয়ের সূচনা করছিল লীলা তার জান্‌বে কি? সে দু' মিনিট অপেক্ষা করে বল্লে—এ কথার আজই শেষ হ'য়ে যাক্! তোমার মনের অভিপ্রায় কি তাই খুলে বল। ঢাক ঢাক্ গুড় গুড় করলে চলবে না।

আমি তাঁ'কে বুঝিয়ে দিলাম আমার বলবার যা ছিল বলেচি।

লীলা ক্রোধরক্ত মুখে বল্লে—যা খুসী তোমার তাই করগে' যাও। আমাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই,—তবে আমাদের আর জ্বালাতন

কর না।--আমি বলে দিচ্ছি।—বলে সে রক্তবর্ণ চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে।

তার রাগের বেগ সামলাতে আমার কিছু সময় লেগেছিল। যে লীলাকে আমি সন্ধ্যায় ফোটা কামিনীর মত শুভ্র পেলবই দেখে এসেচি, যার হৃদয়ের কোমল পরিচয় জোছনার মতই আমার হৃদয়মন প্লাবিত করে রেখেচে, তার মুখে এমন কঠিন কথা শুনে আমার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না।—এই কথা লীলা বলেচে আর আমাকে বলেচে।

বড়লোকের বাড়ীর বৌয়েব সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয় হ'লেও লীলার অকুণ্ঠ সরল ব্যবহার আমার সর্ব্বকল্পনাকে মধুময় করে তুলেছিল বলেই তার উগ্রতায় আমি দশহাত মাটির নীচে প্রোথিত হ'য়ে গেলাম। কিন্তু এমন চুপ করে মেনে নেওয়াও ত সহজ নয়।

আমি জিহ্বায় বলসঞ্চয় করে বল্লাম—আমি তোমাকে বিরক্ত করতে আসি নি লীলা, বরঞ্চ তোমরাই ডেকে এনেছ? এখন বাড়ীতে পেয়ে যত খুসী অপমান করচ!-শেষের দিকটায় চোখের পাতার সঙ্গেই বুকের পাতা ভিজে উঠেছিল। পাছে কেঁদে ফেলি, আরও অপমানিত হই, সেই ভয়ে আমি জোর গলায় বল্লাম—গোড়া থেকেই যদি আমাকে প্রশ্রয় না দিতে আমি দুঃখ করতাম না, কিন্তু তুমি নাকি বড়লোক, বাড়ীতে এনে অতিথিকে অপমান করতে সাহস কল্লে—অতি বড় পাষণ্ডেও যা করে না।

ছবির মা'র চোখে বুঝলাম, তিনিও দুঃখিত হ'য়েছেন, আমার বেদনা তাঁর বুকে বেজেচে ভেবেই আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বল্লাম—আপনিও ত ভদ্র মহিলা, বলুন দেখি ··· ··· ···

আর বলাবলিতে কাজ নেই।—লীলা আমার হাত দু'টি ধরে অনুনয়ের স্বরে বল্লে—আমাকে তুমি ক্ষমা কর, আমার মাথার ঠিক ছিল না।

আমার কান বিদ্ধ করে দিলে। আমি তার হাত টানতে গেলাম লীলা হাত সরিয়ে নিলে। কিন্তু সে যখন হাত সরিয়ে নিলে, তার চোখের কোণে এক ফোঁটা জল দেখে আমার কষ্ট হ'ল। আমি তাড়াতাড়ি বল্লাম—দেখুন, বরাত আমার এতই মন্দ, যে-কেউ ভালো কথা বললেও আমার সন্দেহ হয়—বুঝি কোন কুমতলব আছে তার ভেতরে! নইলে আপনার কথায় রাগ করবার হেতু আমার কিছুই নেই।

লীলা কথা কইলে না।

ছবির মা বল্লেন—ও-ত ভাই তোমার হিতের চেষ্টাই করেচে। মেয়ে মানুষ তার ওপর আত্মীয়হীনা, ওরা যে আত্মীয়ের মত তোমাকে দিতু করতে তৎপর হ'য়েছে—এ-কি তুমিই বুঝতে পারচ না?

আমি নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ছবির মা লীলার কাছাকাছি হ'য়ে আবার বল্লেন—আমি বিশ্বাস করি না যে-এত বড় মেয়ে তুমি কিছুই বুঝতে পারচ না! কিন্তু এটা আমারও বোধগম্য হ'চ্ছে না যে তা' স্বত্বেও তুমি লীলাকে এমন কটু কথা অপমান করলে কেন?...লীলা?

লীলা তাঁর আহ্বানে মুখ ফিরাতে তার সজল চোখের অচঞ্চল দৃষ্টি দেখে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। কিন্তু অপমান ত আমি করি নি যে তার জন্য অনুশোচনা করব! অথচ একটা কিছু করাও যে অত্যা বশ্যক হ'য়ে উঠেছে তাও বুঝতে পারলাম, মা ও মেয়ে এমন কুঞ্চিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার আপাদ মস্তক তল্লাস করছিলেন যে চুপ করেও

থাকতে পারলাম না। দুষ্ট সরস্বতী আমার কণ্ঠে বিরাজ করছিলেন, আমি তীব্রতেজে বল্লাম—আপনি ত লীলার হয়ে বলবেনই!

ছবি বিকৃত স্বরে বলে উঠল—কেন মা তুমি কথা কইতে গেলে? যেচে অপমান বেছে নেওয়া হ'ল।

এরা কথায় কথায় অপমানের দোহাই পড়ে! বড় লোকের বাড়ীর বৌ-ঝি এরা অতিথির সম্মান এদের কাছে বোধ করি এমনই--সে-কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে যাচ্ছি, ছবির মা বল্লেন—তুই থাম্ বাপু! আমি কিসে অপমান হলুম। না ভাই, ওর কথায় তুমি কিছু মনে কর না। কিচ্ছু হই নি আমি। তুমি বল্লে যে আমি লীলার হ'য়ে বলচি, তা ত বলচিই-- ওর দিক ত টানবই! ওযে আমার বন্ধু! কিন্তু তুমিও কি তাই-ই নও? বল, তুমি কি আমার শত্রু?

সন্তানবতী রমণীর কোমলচিত্তের করুণ স্বরে আমার বুকের মধ্যে হাহাকার জেগে উঠলো। ইচ্ছা হ'তে লাগল - এর ঐ কুসুম সুকোমল ক্ষীণ দেহটি জড়িয়ে ধরি।

ছবির মা মৃদুস্বরে বল্লেন --তুমি যাই কেন ভাবনা ভাই, আমি ত জানি আমি তোমাকে বন্ধু ভেবেই নিয়েচি। বয়সে তোমাদের চেয়ে আমি অনেক বড়, সাতছেলের মা বুড়ী হ'তে পারি. কিন্তু রমণী ত। তুমিও যা, আমিও তাই—তোমাকে সাগ্রহে গ্রহণ করতে বন্ধুত্বের আসনে বসাতে একটি মিনিটও আমার দেরী হয় নি। তারপর তোমার করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে আমার বুক ভেসে গেচে চোখের জলে—সে জলে ধৌত হ'য়ে তুমি যে সোনার মত হ'য়ে গেছে আমার চোখে।

একটু থেমে আবার বল্লেন—তোমার মত অবস্থার একটি ছেলে আমি

কল্পনা করতে পারি, কিন্তু মেয়ে শুনেই আমার সর্ব্বাঙ্গ খসে যেতে লাগল। যতই লেখা পড়া শেখ, মেমেদের মত স্বাধীন হ'য়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াও বাঙ্গালীত্ব কি যায় ভাই? বাঙ্গালা যে মনে প্রাণে, বাঙ্গালী! বারো বছর পার-না-হতেই বাপ মায়ে ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে—এদেশে, সে কি খেতে দিতে পারে না বলে—না-কি?

আজ সত্য বলচি - তাঁর কথা আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় নি, বরং ঠিক তার বিপরীত। আমার মন যেন উন্মুখ হ'য়ে বেরিয়ে পড়েছিল তার মুখের সামনে।

ছবির মা হেসে বল্লেন - খেতে তারা খুব দিতে পারে, কিন্তু মেয়ের কি তখন ক্ষুধা আছে ছাই পাঁশ! সে তখন কবিতা লিখছে, রাস্তায় উঁকি মেরে হাই তুলছে। তাই সব চলে এ পোড়া দেশে—কিন্তু মেম হ'বার অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি, সে কাটিয়ে যাবার জো-টি নেই। যেখান দিয়ে যে দিক দিয়ে, যাও, বাঙালীত্ব তোমাকে পেয়ে আছে—তুমি কেন যতই ছাড়াতে যাও না, সে তোমাকে কচ্ছপ কামড়ে বসেচে, ছাড়বে না।—বলে তিনি মুক্তকণ্ঠে হাসতে লাগলেন। অনেকক্ষণের পরে ঘর থেকে ভূতটা যেন বেরিয়ে গেল, আমিও সহজ ভাবে নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর পেলাম।

ছবির মা বল্লেন—আমার মেয়েকে আমি লেখাপড়াও শেখাচ্চি, ও এইবার ফোর্থ ক্লাসে উঠেছে ঐ পর্য্যন্ত খতং। আসচে বছরই;……।

ছাবর তাতে লজ্জা হ'তেও দেখলাম না। স্ফুটনোন্মুখ গোলাপটির মত তার মুখের রক্তাভা ত চিরদিনের সম্পত্তি—বৈচিত্র্য কিছুই দেখলাম না। সে প্রশান্ত নয়নে সম্মতি জ্ঞাপন করছিল।

তার মা বলতে লাগলেন —একটু আধটু ইংরাজীটা জানা রইল, ঠিকানাটা আস্‌টা চিঠিটা পত্রটা চিন্‌তে পারবে। বিলিতী গহনার দোকানের তালিকা পড়তে পারবে—কাজ হয়ে গেল। ব্যস্‌!

আমি তাঁর অফুরন্ত হাস্যে বাধা দিয়ে বল্লাম—যার সঙ্গে ছবির বিয়ে দেবেন ছবির যে তাঁকেই ভালো লাগবে জানলেন কি করে?

কেন বেশ সহজ করেই! আমার বাপ মা ও যে এমনি করেই দিয়েছিলেন আমার কি তাতে কম ভালো লেগেছে?······আরে বাপু, পয়সা ত কেউ কম নেবে না। আমার যদি বাক্স ভর্ত্তি থাকে, ইন্দ্র চন্দ্র বরুণকেও জামাই করতে পারি। যদিও বাঙ্গালীর সঙ্গেই মেয়ের বে দেব আমার, তবু বলচি যাঁরা অন্য জাতের সঙ্গেও বে দেয় তাদের সঙ্গে আমার মিল আছে। আমিও যদি বেশী বয়সে ছবির বে দিতাম, তাঁহলে কি হত বলা যায় না, কিন্তু এত কমবয়সে আর কোনজাতের সঙ্গেই খাপ খাবে না—তাতে আমারও মাতৃগর্ব্বে ঘা লাগ্‌বে, ওদেরও সুখ হ'বে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তবে এত অল্প বয়সে বিয়ে দিচ্ছেন কেন?

ছবির মা বল্লেন, আমি কি আর দিচ্ছি রোগে দিচ্ছে ভাই, রোগে দিচ্ছে!······আর পাঁচ রকম দেখে শুনে রোগ বেড়েই যাচ্চে ভাই, কমবার নামটি নেই।

কি এমন দেখেছেন কে জানে—যে তাঁর মত এমন দৃঢ় হ'য়ে গেছে এই আমি ভাবছি, তিনি বলে উঠলেন কিছু মনে কর না ভাই, তোমাকে দেখেই এ সব আমি ভেবেচি।

আমাকে?

তোমাকে। কিসে আমি আর সে কথা নাই বা বল্লাম। কথাটা

ত আর মিথ্যে নয়।—চট না ভাই, চটবার কথা কিছুই নেই এর ভেতর—তুমিই বল দেখি, ঘর ছাড় নি কি তাকে বে করতে। কলকাতায় নয় বাইরে গেছলে—কিন্তু কেন জানিনা, তা'কে আর তোমার ভালো লাগচে না।

ঘুরে ফিরে আমার প্রসঙ্গই আলোচিত হ'তে লেগেচে, কিন্তু এ তর্কে আমি যেন একেবারে ডুবে গেছলাম, অন্য কিছু লক্ষ্য করবার আমার সময় নেই, কি একটা কথা বলতে যাচ্ছি—ছবির মা আমার মুখের পানে চেয়ে বল্লেন—বল দেখি ভাই, কি চাও তুমি ?

প্রশ্নটা এমন আকস্মিক আর অস্বাভাবিক যে সহসা আমাকে চোখ নামিয়ে নিতে হল।

শুনতে পেলাম, লীলা বলচে, ও বলবে কি ;—আমি বলছি……

তার দীপ্তকণ্ঠ আচ্ছন্ন করে সেন ডাকলেন—লীলা।

জ্বলন্ত আগুনে এক কলস জল ঢেলে দিলে যেমন ফোঁস্ ফোঁস্ করে, লীলা তেমনি করে বেরিয়ে গেল। ছবি, ছবির মা—এরাও চলে গেল।

হিংস্র চোখের দৃষ্টি দেখেই যে কথাটা লীলা অসম্পূর্ণ রেখে গেল—তা আমার মনে একেবারে জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

উৎসব-মন্দিরে।

একমিনিট পরে সেন ঘরে ঢুকে বল্লেন—আসুন ত একবার!—আমি তার কাছে আসতেই তিনি পিছু ফিরে দ্বারের দিকে চলতে লাগলেন। পোষা হরিণটির মত তাঁকে অনুসরণ করে যে ঘরটায় ঢুকলাম—সেটা ঠাকুর ঘর বলেই মনে হ'ল। ঠাকুরঘর ত আর সারাজীবনে একটিও দেখি নি—ভাল করে—ঠিক বুঝতে পারলাম না। সেনের বাড়ীর বাকে বাকে ইলেকট্রিক আলো, আর ঠাকুরের ঘরটা দিনেও অন্ধকার—কি-জানি এ- কেমন ব্যবস্থা!

ভেতরটায় চেয়ে দেখি, তাই বটে। তখন আমার মন যেন কি-রকম হ'য়ে গেল। আমি বল্লাম—কি বলুন, ভেতরে আমি যাব না।

সেন কেমন করে বল্লেন—ছিঃ! এ-যে দেবতা, ভগবান! অশ্রদ্ধা করতে আছে কি? চলুন…

এখানে টেনে আনার কোন কারণই আমি খুঁজে পেললাম না। বার বার সেই অন্ধকার ঘরটার ভেতর দৃষ্টি করতে করতে আমার মন সেই সেই গৃহবিরাজিত অন্তর্যামীকেই প্রশ্ন করতে চাইলে—তুমি ত সব জান, ঠাকুর, বল ত এর কারণ কি?

শুধু সেন নয় আর একজন ঢুকল,—সে দিব্যেশ!

বোধ করি তার কথাই পাঁচমিনিট আগেই আমি শুনেছিলাম লীলার কাছে। আর কি শুনেছি, তা'ও ভুলি নি। লীলা হাতে পায়ে ধরে অনুনয়-বিনয় করে ধরে এনেছে আমাকে দান করতে! আমার

সর্ব্বাঙ্গে অগ্নিবৃষ্টি হ'তে লাগল, সে সেই দান নিতেই উল্লসিত হ'য়ে এসেছে। তবুও আমি চুপ করেই রইলাম। তখনও আমার মনে মনে ধ্রুব বিশ্বাসই যেন ছিল এই ঘৃণিত প্রস্তাবটা সেন অন্ততঃ কখনই করবেন না।

কিন্তু হারে আমার বিশ্বাস, আর হা আমার আশা! এতদিনেও, এত শিক্ষার পরেও যে কেন তার চৈতন্য হয় নি, তাই ভাবি আমি। তাকে দেখেই যদি আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতাম. কি এমন একটা কিছু করতাম যার বলেই দিব্যেশটা আত্মরক্ষা করতে ছুটে পালিয়ে যেত, তা হ'লে আর কোনদুঃখই আমাকে ভোগ করতে হ'ত না।

সেন একটু একটু করে আমার কাছে সরে এলেন। সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের ভিতরে আমি তাঁর মুখ স্পষ্ট দেখতে পেলাম না, কেবল শুনতে পেলাম, সেন বল্লেন—সোণা, এই দেবতার সম্মুখে আজ তোমাকে এমন একটি জিনিষ আমি দান করব যা চিরদিনই রমণীজাতির অতীব প্রিয়, অত্যন্ত কামনার, একান্ত ঈপ্সিত!—বলে' তিনি আমার হাতটি তুলে নিলেন। আশ্চর্য্য, তখনও আমি প্রতিবাদ করতে পারলাম না।

সেন আমার হাত তুলে নিয়েই নিরস্ত হলেন না, তিনি দিব্যেশের একটা হাত ধরে বল্লেন—সোণা, তোমার পিতা নাই, মাতা নাই, একমাত্র আমি আছি—বোন্, ভগবান সাক্ষী করে……

ভগবানের নামেই যেন কেঁপে উঠে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বল্লেন—আত্মীয়তা স্বীকার করলে ত?

আমার মনে আছে, সেন আঘাতিত হ'য়ে এক মুহূর্ত্ত চুপ করেই ছিলেন, তার পর আস্তে আস্তে বল্লেন—আত্মীয়তা স্বীকার কর না?

না—বলে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাব, দেখি সাম্নে লীলা। এতক্ষণ আমার দ্বন্দ্ব করবার ক্ষমতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করছিল, কিন্তু রমণীর সম্মুখীন হ'তেই রমণীর সব জারিজুরি ভূমিসাৎ হয়ে গেল।

সেন বল্লেন—লীলা সোণা দিব্যেশকে চায় না।

লীলা আরক্তদৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠ্‌লো, সে আমি জানি। কিন্তু দিব্যেশবাবু, আপনি অমন মুখটি চূণ করে' দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? ওর মা'র কাছে না আপনি অঙ্গীকার করেছিলেন যে ওকে বিয়ে করবেন? এই ত কাল রাত্রেও আমাদের কাছে বল্লেন, এরই মধ্যে ভুলে গেলেন না-কি?

দিব্যেশ যেন সাহস পেয়ে আক্রমণ করার মতই আমার পাশে এগিয়ে এল। সে হাতটা বাড়াতেই আমি "সরে যাও" বলে একেবারে সিংহাসন শায়িত শিলার কাছটিতে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

লীলা আবার বল্লে—তবু দাঁড়িয়ে আছেন? আপনি কি?...

দিব্যেশের গলা দিয়ে কথা উঠ্‌বার আগেই আমি বল্লাম—ও-কি তা আমি জানি, আপনারাও যে না জানেন তা নয়—কিন্তু আপনি আমাকে বল্‌তে পারেন—আপনি কি সত্যিই রমণী? বিধাতা কি আপনাকে নারী সৃষ্টি করেছেন? না নারীর খোলস এঁটে......

লীলা হুমড়ী খেয়ে পড়তে পড়তে বল্লে—খোলস এঁটে?

আমি তা'তেও ভয় পাই নি, কিসের ভয়, আর কা'কেই বা! বল্লাম—বেশ ত ছিলেন—খাসাটি! বড় লোকের ঘরের বৌ; একেবারে কল্পতরুটি হ'য়ে ছিলেন? উঁচু দিকে চেয়ে সবাই বাহবা দিচ্ছিল, কেন হঠাৎ আমাকে ঘাঁটাতে এসে স্বরূপ দেখিয়ে ফেল্লেন?

লীনার যে বাকাস্ফূর্ত্তি হ'চ্ছে না, সে আমি এখন ভেবে পাচ্ছি. কিন্তু তখন আমার জ্বালা যে খুঁচিয়ে দিয়েচে তা'রই হাতে প্রথম তেজটা লাগিয়ে দিতেই ব্যস্ত ছিলাম—বল্লাম -খাসা ছিলেন! কেন এলেন মধ্যস্থ করতে? কেউ ত ডাকে নি আপনাকে?

তুমি—তুমি—তুমি……

আমি বল্‌ছি আপনাকেই, যে আমার হিতচেষ্টা না করতে আসাই আপনার উচিৎ ছিল। আমি ত চাই নি, কোন দিনই আপনার হাত ধরে সেধে বলি নি, মাথার দিব্য দিয়ে যে… ..

আমার কথায় বাধা দিয়ে লীলা বল্লে—তা ডাকবে কেন? আমি যে তোমার চক্ষুঃশূল! আমার মাথাটি খেয়েই যে রাক্ষসী মায়ায় রূপসী সেজে ঢং করে বেড়াচ্চ! আমাকে ডাকতে পার!—লীলা লজ্জায় ঘৃণায় আগুণের মত লাল মুখখানা ফিরিয়ে নিলে।

আমি তীব্রতেজে প্রথম চাইলাম, সেনের পানে—তিনি অধোবদন। তার পর দিব্যেশ, সে-যেন একেবারে মৃত! শেষে লীলার দিকে চেয়ে কি বল্‌তে যাচ্ছি, লীলার প্রবলকণ্ঠে আমার স্বর বন্ধ হ'য়ে গেল। লীলা বল্লে—আবার খাতা বগলে নিয়ে এঁসেছেন, সতীগিরি ফলাতে! গলায় দড়ি দিতে পার নি, খাতা দেখাতে এনেছ। লজ্জাসরমের মাথাটিও খেয়ে বসে আছ, গলায় দড়ি, গলায় দড়ি!—সে-যেন ঘরের চারিদিক খুঁজছিল—একগাছা দড়ি আমাকে উপহার দেবে বলে।

তার কথা শেষ হ'তেই আমি তার চেয়েও কঠিনস্বরে বল্লাম—আমার ত লজ্জাসরম নেই, গলায় দড়ি দিই নি, খাতা বয়ে এনেছি,

ঘরের বৌ হ'য়ে এত লোকের সামনে গলাবাজী করতে লজ্জাসরম হয় না আপনাদের বড় লোকের ?

সে মাথা নেড়ে কি বলতে যাচ্ছে, সেন ইঙ্গিতে কি বললেন। আমি শুধু একটা কথাই তার শুনতে পেলাম—ছিঃ লীলা !

লীলা কিন্তু তাঁর নিষেধ মানে নি। সে খুব তীব্র কণ্ঠেই বল্‌তে লাগল—আমারই মাথা খাবে, আমারই সর্ব্বনাশ করবে তুমি, আর আমি বল্‌তে গেলেই আমার দোষ। বড় লোক, যা-না-তা বলে গাল দেবে ?

মাথা আমি আপনার খাই নি, মাথা যারা খাবার তারা অনেকদিন ধরে আস্তে আস্তে খেতে সুরু করে দিয়েছে, আর তা'তেও যখন আপনার সর্ব্বনাশ হয়'নি, আমি গলায় দড়ি না দিলেও কিছুতেই ক্ষতি হ'বে না—বুঝলেন ?

একটুখানি থেমে আমি আবার বল্লাম—আপনার সর্ব্বনাশ আমি করি নি, বুঝলেন ? যারা করেছে এবং করছে—তা'দের আপনিও জানেন, আমিও জানি। যান্‌-না একবার বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করতে ; যান্‌-না একবার শকুন্তলার বাড়ী......

সেন বাধা দিয়ে বলে উঠ্‌লেন—তার নাম কর না সো ।।

সঙ্গে সঙ্গেই লীলা বল্লে -তার পায়ের নখের যুগ্যি হ'লেও তোমাকে আমরা মাথায় করে' রাখতাম।

কার পদনখের তুল্য হ'তে পারলে এ হেন সৌভাগ্য হ'ত আমার, তাই ভাবছি, সেন তীক্ষ্ণ অথচ অত্যন্ত নম্রকণ্ঠে বল্লেন—বঙ্কিমের নাম তুমি করতে পার। সত্যিই আজকের এই দুঃখের মূলই সে ! ঝোঁক না

পড়বে তার তোমার 'পরে, না আমি যাব তার আকাঙ্খা মেটাতে। তাইতেই এই সর্ব্বনাশ। তার পর—ঐ হতভাগাটা......

দিবোশ ভয় পেয়ে বেরিয়ে পালাচ্ছিল, আমি খপ্ করে' তার হাতটা চেপে ধরে বল্লাম—যাও কোথায়?

সে ভয়ার্ত্তমুখে ধপ্ করে' বসে পড়লো।

সেন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন—আপনার খাতাটার প্রত্যেক কথাটি সত্যি, অক্ষরে অক্ষরে। কিন্তু তখন ত আর আমি তা জান্‌তাম না। জানত এক—ঐ ষ্টুপিড্। আমাদের কাছে তা বলে নি। শয়তানী মতলবই যে করেছিল......

দিবোশ কাঁপতে কাঁপতে বল্লে—বঙ্কিম জানত। তা'কে বলেছিলাম আমি। তোমাকে বল্‌তে সেই বারণ করেছিল!

সেন বজ্রাহতের মত বল্লেন—বারণ করেছিল। সত্য কথা?

নারায়ণ সাক্ষী!

দু'টি মিনিট হ'বে বোধ করি সেনের মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। তার পর ছোট ছেলেটির মত গায়ের ধুলা ঝেড়ে ফেলার মত একটু নড়েচড়ে বল্লেন—হ'বে। সে-যাক্। কিন্তু শকুন্তলার নাম কর-না। সে আমাদের তর্কের, সমালোচনার বাইরে!—বল্‌তে বলতে তাঁর স্বর একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

ঠিক এই সময়ে একটা চাকর বাইরে থেকে বলে উঠ্‌লো—বাবুকা মানেকা ফুরসুত নেহি হ্যায়!

সেন দ্বারের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—ভেট্ হুয়া থা?

জী হুজুর। বঙ্কিনি বাবু কহা কি........

আচ্ছা -যা—বলে সেন পূর্ব্বস্থানে ফিরে এলেন। তাঁর মুখখানা অকস্মাৎ কালো হ'য়ে গেল।

'সমালোচনের বাইরে' কথাটা শুনেই আমার বিদ্বেষভরা বুকও দমে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই চোখ দু'টি জলে ভরে উঠল। অকস্মাৎ কোন কথা বলতে পারলাম না।

সেন অশ্রুসিক্তস্বরে বল্লেন সোনা, থিয়েটারের নটী সেজে সারা-জীবনটাই যে কাটিয়ে দিয়েচে, কত অত্যাচার অনিয়ম, অপমান সহ্য করাই ছিল যার একমাত্র ব্যবসা তার হৃদয়টা যে কি উপাদানে তৈরী তা যদি জান্তে, তা'কে কটু বলতে তোমারই ব্যথা বাজত! একি কখনো কেউ দেখেছে না শুনেছে যে, চিরদিন রাজদরবারে গান গেয়ে, রাজ-রাণীর পার্ট করে, রঙ মেখে, আলতা লেপে লোক ভুলিয়ে বেড়িয়েচে, ভোগে বিলাসে বাস করচে—অর্থোপার্জ্জনও বড় অল্প করে নি—সেই একদিন এক নিমিষে সব ত্যাগ করে একেবারে নিঃসম্বল হ'য়ে বেরিয়ে গেল। এ-কি কেউ দেখেছে?······আমি দেখেছি, সোনা! শকুন্তলাকে! ঠিক এমনি খালি পায়ে খালি হাতে ফুলী চলে গেল।

কথা বলছিলেন না ত! যেন এক একটি কথা এক গামলা জলের মধ্য হ'তে টেনে বার করছিলেন, এবং কথা শেষ হ'তেই চক্ষের জল টস্ টস্ করে মাটিতে পড়তে লাগল। একটু আগে বিষম ভাবনায় আমি অস্থির হ'য়ে পড়েছিলাম যে কথা ভেবে, সে ভাব আমার দূর হ'ল বটে, কিন্তু কৌতূহল আরো বেড়েই গেল।

লীলা বল্লে—সে—আর—এ! হা আমার বরাত!

আরো বিস্ময়!—কি এমন অপার্থিব দুর্ঘটন ঘটেচে যে লীলা তার

অদৃষ্টকেও ধিক্কার দিতে পারছে—আমি খুঁজেই পাচ্ছি না, অথচ এই দম্পতীর কাছে প্রশ্ন করবার সাহসও কুলোচ্চে না।

সেন বল্লেন—সে যে কত উচ্চে যখন ভাবি তখন আমার নিজেকেই এত ছোট মনে হয় যে তার নাগালই আর পাই নে।—লীলার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন—চিঠিটা তোমার কাছে আছে লীলা ?

লীলা আঁচলের গ্রন্থি খুলে একটা চিঠি সেনের দিকে ধরতেই সেন আমাকে বল্লেন—তুমি পড় !

ঘরের আলো কম থাক্‌লেও আমার চোখের তেজ যেন দ্বিগুনিত হ'য়ে উঠ্‌লো। আমি রুদ্ধশ্বাসে পড়ে গেলাম :—

"প্রিয়বরেষু,—

আজ আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলুম না ; আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার অভ্যাগত দু'টিকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বলবেন তাঁরাও যেন আমাকে মাপ করেন। সোনাকে বল্‌বেন তাকে সুখী দেখবার জন্য আমি অত্যন্ত লালায়িত হ'য়েও যে যেতে পারলুম না—তার কারণ সংসারের না নিজের না পরের কারু সুখ-দুঃখেই আমার যোগ দেবার প্রবৃত্তি নেই, বোধ করি সাহস-ও নেই। সাহস নেই কেননা সে আপনার বাড়ীতেই। সে ত আপনার বাড়ী নয়, সে যে আমার সামনে হিন্দুর দেবমন্দিরের মত অভ্রভেদী শীর্ষ উচ্চ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন করে অপবিত্র আমি, অশুচি আমি মন্দির দ্বার পার হ'ব ! আমি জানি আমার স্পর্শে সে পবিত্রতা পঙ্কিল হ'বে না, দেবমন্দিরও কলুষিত হ'বে না—কিন্তু আমার পাপের ভরাতেই যে আমি পুড়ে ঝুড়ে যাব। দুনিয়ার আর কেউ না বিশ্বাস করু-

আপনি যে অবিশ্বাস করেন না—এ ধারণা দৃঢ় না থাক্‌লে আমি বল্‌তে পারতাম না যে আমার দেবতাকে আমি আরাধণাই করতে পারি, স্পর্শ করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই-ই! আমার মত নীচ ঘৃণিত জীবনেও এই শিক্ষাই ত পেয়েছি আমি যে সারা জীবন তাঁর আরাধনা করে যাওয়াই সাধকের সাধনা! ক'জন পয়ে তাঁকে দেখ্‌তে? কেই বা পারে তাঁকে স্পর্শ করতে!

আমি দেখি নি, তবুও সোনা সুখী হ'য়েছে জেনে আমি শেষ বার আজ স্বর্গসুখে সুখানুভব করছি। আমার সম্বন্ধে তার যে ধারণাই থাক্ আমার হৃদয়ের কতক অংশ যে তারই প্রতি স্নেহে, ভালবাসায় ভরে ছিল—তা আমি আজও অনুভব করতে পারছি। তা'কে আমি অতি শিশুকাল হ'তে জানি, তার মা কদম যখন নেত্যর চাঁদ ধরে দেওয়ার প্রলোভন এড়িয়েও তা'কে স্কুলে পাঠিয়েছিল। তার মা কদমের ইচ্ছেটা যে সফল হ'য়েছে—এই আমি যথেষ্ট মনে করি। এবং সেই সঙ্গে আপনাকেও ধন্যবাদ দিই।

সোনাকে একটা যৌতুক দেবার আমার বড় সাধ ছিল, কিন্তু কি আর দেব তা'কে। আমার যে আর কিছু নেই, একটি কপর্দ্দকও নেই—কি দেব সোনামণিকে! আমি ত জানি এই যৌতুকের ভেতর দিয়েই দাতার স্নেহ আশীর্ব্বাদ কত কাল ফুটে থাকে গ্রহীতার মনে! সেই চিহ্নটুকুও আমি তার হাতে তুলে দিতে পারলাম না, হা হতভাগ্য আমি।

ঘণ্টা দুই আগে একদল ছেলে খালি পায়ে খালি হাতে পথে পথে গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিল। কিসের তরে তারা ভিক্ষা সংগ্রহ করছিল আমি তা জানতুম না; এবং আমাদের পাড়াটায় ভিক্ষা যে দেবে

কে তা'ও জানতুম না। আমার বাড়ীর কাছে যখন তারা গাইতে আরম্ভ করলে, আমি তখন নিজের বেদনার ভারে প্রপীড়িত আর্ত্তের মত শুয়ে শুয়ে কাঁদছিলুম, তারা যেন এই অভাগিনীকেই জাগিয়ে দিতে গাইলে—

"শুধুই কেঁদে, শুধুই কেঁদে—কি কাজ ওরে করবি তোরা বল।
বৃথাই হ'বে ব্যর্থ হ'বে—তোদের সোনার চোখের জল।
পাষাণ হ'রে, পাষাণ হ'রে—
আগুন হ'রে, আগুন হ'রে—
যেথায় শত্রু থাকুক্ সে-রে
তুই ত আগুন ছড়িয়ে ছড়িয়ে চল্।"

আমি ত জানতাম, শত্রুতা করি নি কারু সঙ্গে, শত্রুও আমার কেউ নেই, তবুও না জানি তা'দের গানে কি ছিল, আমার কান্না রোধ ক'রে আমি ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। যা দেখলাম চোখের পলক আর পড়তে চাইল না। সে কি শোভা দেখেছিলাম তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা আর যার থাক—আমার নেই। যেন সে ভারতের সেই আদি-কালের এক সুমধুর প্রভাত; তাপস বালকগণ বীণা হাতে গাইতে গাইতে চলেছে। তপস্বীদের মতই বেশ তাদের, নির্ম্মল সৌকুমার্য্যে তা'দের মুখ উদ্ভাষিত! কলকাতার সরুগলিতে তখনও হয়ত রৌদ্র প্রবেশ করে নি, কিন্তু আমার চোখে তা'দের মুখচোখ যেন অরুণকিরণরাগে রঞ্জিত বলেই বোধ হ'তে লাগল। আর যে গান তারা গাইছিল সে আমাদের এ পাড়ার নয়, আমাদের প্রাণের সঙ্গে তার সহানুভূতি ছিলই না, তবু রাজ্যের মেয়ে শুনতে দাঁড়িয়ে ছিল।

তারা গাইছিল—"তুই ত আগুন ছড়িয়ে ছড়িয়ে চল্।
শুধুই কেঁদে শুধুই কেঁদে কি কাজ ওরে করবি তোরা বল্।

অন্নহীন সবাই যে-রে
বস্ত্রহীন তোরাই ত রে
লজ্জা তোদের হয় না ওরে
ছুটে ছুটে চলিস্ (তোরা) বাড়িয়ে তোদের শত্রুদল।
পশু কাঁদে বনের মাঝে
কেউ না তাহার রোদন বোঝে
তোর কাঁদনও শুন্‌বে না কেউ—
তোর যদি না শক্তি থাকে, হাতে পায়ের বল॥
(ও তোর) ক্ষুদ্র বুকের সাহস-টুক্,
মায়ের দুঃখে মলিন মুখ
সবার সাথে মিলিয়ে দে ভাই
একটি কণা ভিক্ষা দেরে—মুছে তোদের চোখের জল।"

তারা আরও গাইছিল ঠিক সেই সময়ে একটি বারো তেরো বছরের সুন্দর ছেলে কোথা দিয়ে উপুরে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বল্লে রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভ্য হ'বেন ? আমি ত নামও শুনিনি কোনদিন এই সভার তবু বল্লাম হ'ব।—বলেই ঘরে ঢুকে ছেলেটির হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলাম কি সভা বল্লে ? ছেলেটি বল্লে—ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার। হ'বে মা ? "হ'ব বৈ-কি কি করতে হ'বে ?" সে একখানা কাগজ দেখিয়ে বল্লে—

সঙ্গীতবিৎ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অশোককুমার গুপ্ত কর্ত্তৃক সুরে গঠিত—পূরবী, যৎ:

এই কলমটা ! সেই কলম দিলে। সহি ক'রে বল্লাম, কত চাঁদা ? "চার আনা" "মোটে ?"—আমি যেন হতাশে ভরে গেলাম। ছেলেটি আর একখানা খাতা দেখিয়ে বল্লে—স্বরাজ ফণ্ডে কিছু দেবে মা ? যা পার......"দেব।" ছেলেটি খাতাটি খুলে ফের জিজ্ঞাসা করলে—জোর ত নেই মা, যা পার—তাই দাও। তবুও আমি ভাবছি দেখে ছেলেটি করুণকণ্ঠে বলে উঠ্‌লো—কেন ভাবছ মা, এক মুষ্টি চাল আর দু'টো পয়সা দাও, মাথায় করে নিয়ে যাই। আমি তবুও, তখনও নীরব। ছেলেটি বল্লে, পারবে না মা ? তার অল্প অক্ষরের এই কথা ক'টায় আমার চোখে জল এসে পড়ল। রুদ্ধবেদনে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লাম, দেব—দাঁড়াও। ছেলেটি দাঁড়িয়ে রইল। আমার ইচ্ছে হ'চ্ছিল, সর্ব্বপ্রথম, এই সুকুমার শিশু, যে বেদনা ভরা টলটলে মুখে আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে—আমার দেশের, আমার জননীর সন্তান বলে একবার তা'কে বুকে চেপে সেই মুখে একটি চুম্বন করে এই শূন্য জীবনটা পূর্ণ করে নিই—কিন্তু পারলাম না। সে আমাকে মা বলেছে, যা কেউ কখনও বলেনি। সে মা বলে ডাক্‌লে, তবুও 'বাছা আমার' বলে তা'কে কোলে তুলে নিতে পারলাম না, এমনি হতভাগিনা আমি ! আলমারী খুলে ব্যাঙ্কের খাতাটা আমার মিলিয়ে একখানা চেক্ কেটে খাতার অঙ্ক নিঃশেষ ক'রে তার হাতে দিতেই সে অবাক্ হ'য়ে বল্লে—সব দিলে ? একটা নাম লিখে দাও তবে।

যে নাম সে বল্লে, তাই লিখে দিতেই সে বেরিয়ে গেল। একটা ধন্যবাদও দিলে না। বাঃ বাঃ। ভারি খুসী হ'লাম তা'তেই আমি। ধন্যবাদ কেন দেবে সে ? আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি সে কেন

লৌকিকতা করতে যাবে। বা রে ছেলে! সোনার ছেলে। সোনার ভারতবর্ষের সোনার শিশু সে।

সন্তোষবাবু, আমার আসবাব পত্র বহি কেতাব ছাড়া আর আমার কিছুই নেই। একেবারে নিঃস্ব, নিঃসম্বল! সেগুলির ব্যবস্থা সময়মত আপনিই করে দেবেন একদিন। যাতে হ'ক যেমন ক'রে হক্‌। আমার কিছু নেই, নারীর শেষ সম্বল চোখের জলও নেই। সে তাঁদের গানের সঙ্গেই শুকিয়ে গেছে—চোখের জল আর ফেলব না। এই পত্রের ভেতর দিয়েই আপনার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা বলেই আজ লিখতে কুণ্ঠা হ'চ্ছে না যে আপনি আমার সংবাদের জন্য সত্যই আকুল হ'বেন। আপনাকে ত আমি চিনি! আমাকে নিঃস্ব অসহায় ভেবে পাছে আপনি দুঃখ পান তাই বলে যাই, সন্তোষবাবু, এখন এমন দেশে আমি বাস করব যেখানে দু'পা চলতে পয়সার দরকার হয় না, গ্রাসাচ্ছাদন চালাতে পরমুখাপেক্ষী হ'তে হয় না—যেখানে সব রূপ অনন্ত, সব প্রেম অনন্ত, কামনা-বাসনা সব অসীম অনন্ত হ'য়ে সেই অন্তহীনে মিলে মিশে একাকার হ'য়ে গেছে—সেইখানে। কিন্তু সে কোথায় জানি নে। শুধু এই জানি সে এখানেই, এই ভারতেই। স্বর্গে না হ'তে পারে, অন্য স্বর্গ আমি চাই-ও নে—এই ভারতেই জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে, এখানেই আমি বেঁচে মরে, হাসি-কান্নার লীলাখেলা করে যাব। ইতি—

আপনার স্নেহতৃপ্ত

"শকুন্তলা।"

পড়া শেষ হ'তেই সজল চোখে চেয়ে দেখি সকলের চোখেই মুক্তার মত বারিবিন্দুগুলি টল্‌ মল্‌ করছে। একটু বাতাস পেলেই ভরাট মেঘ

যেমন জল ছড়িয়ে ফেলে দেয়—আমি চাইতেই তাঁদের মুখগুলিও ভেসে গেল।

আমি বসে পড়ে দু'হাত বাড়িয়ে সেনের পা চেপে বল্লাম—তারপর! সন্তোষবাবু, ফুলী কোথায়? সে আছে ত?

সেন রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌তে লাগলেন—আছে বৈ-কি সোনা! এত যার মায়া, এত যার টান্—সে কি ত্যাগ করতে পারে কখনও!

আমি তা জিজ্ঞাসা করি নি। সে কোথায় বল্‌তে পারেন?

না—তা জানি নে। তবে সে আছে—যেখানেই হ'ক্ আছে। এই ভারতবর্ষ, এই ভারতের অধিবাসীদের ত্যাগ করে সে যাবে না। এত কষ্টের, দুঃখের সঞ্চয় নিঃশেষ যে করতে পেরেছে—সে কি পারে দেশ ছাড়তে!

সে আমিও জানি। শুধু আমি জান্‌তে চাই সে কি বেঁচে আছে? আপনি বলুন সে আত্মহত্যা করে নি?

সেন বল্লেন—বেঁচে? আছে বৈ-কি! সে কি মরতে পারে? সে যে দেশের কাছে দেশবাসীর কাছে মৃত্যুঞ্জয়! তার কি মৃত্যু আছে?

তবুও আমি যা জান্‌তে চাই তা স্পষ্ট হ'ল না। আমিত শুনিনি সে-ই গান, আমি ত দেখি নি সেই তাপস বালকদের গৈরিক রঞ্জিত সুকুমার দেহ, তবু মনে হ'তে লাগ্‌ল—আমিও শুন্‌ছি, আমিও দেখ্‌ছি—তারা আমার পাশে দাঁড়িয়ে ভিক্ষার পাত্র বাড়িয়ে বল্‌ছে - ভিক্ষাং দেহি! যা শুনে ফুলী—না, না শকুন্তলা, সেনের দেওয়া নামই সে গ্রহণ করেছিল—শকুন্তলা সর্ব্বস্ব দান করে গৃহত্যাগ করেছে।

সেন বল্লেন—তার সন্ধান আমরা হয়ত পাব না কোন দিনই কিন্তু

আমাদের সামনে সে-যে চিরদিন আকাশের চন্দ্রসূর্য্যের মতই দীপ্ত হ'য়ে থাক্‌বে—কোন আকাশের কোন মেঘই তা'কে আচ্ছন্ন কর্‌তে পারবে না, এই আশাতেই তা'কে হারিয়েও আমার ক্ষোভ নেই। নাই বা পেলাম তা'কে দেখতে না-ই বা পেলাম তার সন্ধান……

না, না তার সন্ধান আমার চাই। আমি তা'কে খুঁজে বার করব। যেখানে পাবি, যেমন করে পাব।

সেন কি বল্‌তে এসেছিলেন, তার অবসর না দিয়েই আমি কাতরকণ্ঠে বলে উঠ্‌লাম—সন্তোষবাবু, অনেক দয়াই আপনার আমি পেয়েছি, শেষাশেষি সেটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

সেন-ও অশ্রুবিগলিতস্বরে বল্লেন—না সোনা, কোন অপরাধেই তোমাকে ত্যাগ করতে পারব না।

আমি বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাঁকে অতলে ডুবিয়ে দিয়ে বল্লাম তার চেয়েও বড় অনুগ্রহের প্রত্যাশী আমি। বলুন, আমাকে বিমুখ করবেন না।

সেন বল্লেন—তোমাকে! বলি নি সোনা……

আমার মনে পড়ল, একবার তিনি বলেছেন—অদেয় আমাকে তাঁর কিছু নেই। মনে পড়তেই আবার একমুহূর্ত্তের জন্য যেন বিদ্যুৎ বলে সমস্ত দেহটা নড়ে উঠ্‌লো, তখনই বল্লাম—যদি কোন দিন সেই তাপস-বালকদের দেখা পান—আমার যা কিছু রইল—তা'দের দিয়ে দেবেন!

তুমি কোথা যাবে, সোনা?

শকুন্তলাকে খুঁজতে।

তা'কে পাবে কি?

পাব না! কেন পার না! দেখবেন আপনি—পাবই একদিন।

আপনিই ত বলেছেন—সে ভারতের নারী, ভারতেই আছে, আমিও ভারতের নারী, সারা ভারতবর্ষ খুঁজে শকুন্তলাকে বার করব-ই।

——আর আমার সেখানে দাঁড়াতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। এত বড় এই পৃথিবী, কোথায় খুঁজব আমি তা'কে—এ-সব কোনটাই আমার মনে উঠ্‌ল না। কেবল মনে হ'ল যে পথেই সে যাক্ তার লক্ষ্য ত এই ভারতবর্ষ! আমারও যদি সে-ই লক্ষ্য হয়, পথে সাক্ষাৎ না হয় নাই পেলাম, সেখানে ত পাব। সেখানে তাকে জড়িয়ে ধরে তার ক্ষমা চাইব, তার পা দু'টি চোখের জলে ধুইয়ে দিয়ে বলব ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ!

সেন আবার বল্লেন—পারবে?

সামনে হিন্দুর জাগ্রত ভগবান, পাশে আমার নারীজীবনের একমাত্র কাম্য দেবতা, তাঁদের সামনে শপথ করেই আমি বলে উঠ্‌লাম—পারব পারব, পারব। আর তাকে না পাই, তাঁকে পাব; যার নাম করে সে পথে বেরিয়েছে, যার নাম করতে এই সঙ্কীর্ণ হৃদয়ও স্ফীত বিস্ফারিত হ'য়ে উঠ্‌চে তাঁ'কে ত পাব। সোনার ভারতবর্ষ, জননী ভারতবর্ষ, স্বর্গ ভারতবর্ষ, তাঁ'কে ত পাব। আর কিছুই চাই না!

আচম্বিতে সেন আমার হাত দু'টি তুলে নিয়ে তাঁর কণ্ঠে বেষ্টন করিয়ে দিয়ে বল্লেন—তাই পাও, সোনা, তাই পাও। তুমি আর শকুন্তলা এই দু'টি রমণীই আমাদের হাত ধরে নিয়ে চল—তোমাদের সেই ভারতবর্ষের কাছে, সেই ভারতবর্ষের পথে!

তাঁকে প্রণাম করে', লীলাকে বল্লাম—লীলা!

লীলা স্বপ্নোত্থিতের মত বলে উঠলো—ভারতবর্ষ—!

দিশেহারা

সেন উল্লাসে হাততালি দিয়ে বল্লেন—বাঃ লীলা বাঃ! বেশ বলেছ—বেশ বলেছ, ভারতবর্ষ! বাঃ লীলা বাঃ! বেশ বলেছ, বেশ বলেছ, ভারতবর্ষ! আর একবার বল—ভারতবর্ষ!

লীলা আর তার সঙ্গেই আমি বল্লাম—ভারতবর্ষ!

সেন চোখ বুজে ডাকতে লাগলেন—ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ!

ঘরখানার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে উঠেছে। যে যেখানে ছিল আর্ত্তস্বরে আত্মরক্ষা করতে প্রাণপণে ডাকছে—ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! আমার মনে হ'ল এই বজ্রনির্ঘোষ ঘর ছেড়ে পথে, পথ ছেড়ে নগরে, নগর ছেড়ে দেশ, দেশ হ'তে দেশান্তরে, আকাশ-বাতাস, জল-স্থল কাঁপিয়ে ছুটে গেল!

দিশেহারা শটা ছুটে পালিয়ে গেল।

লীলা আমার কাঁধে মাথা রেখে, আমার মুখের পাশে মুখ দিয়ে, চোখে জল, মুখে হাসি করে' আবার বল্লে—ভারতবর্ষ!

* * * * *

তিনজনে শালগ্রাম শিলার সামনে নত হ'য়ে প্রণাম করে' দাঁড়িয়ে উঠে—যা আজও শুনছি, আকাশে মেঘের বর্ণে দেখছি, চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারার বুকে দেখছি, প্রতি তরুলতায়, প্রতি মানবের মুখে দেখছি, বিহগের সঙ্গীতে বিদ্যুৎ, গর্জ্জনে, সাগর-কল্লোলে, শিশুর কণ্ঠে নিরন্তর ধ্বনিত হ'চ্ছে—প্রাণের মধ্যে গম্ভীরশব্দে শুনতে লাগলাম—

ভারতবর্ষ।

শেষ কথা।

যে সময় হইতে যে সময় পর্য্যন্ত এই জীবন-যাত্রার আরম্ভ ও শেষ তাহার অনেকদিনের পরে এই কাহিনী প্রচারিত হইল।

আজ আর আমার গ্রন্থপাঠের দিন নাই, না আত্মজীবন কাহিনীতে না উপন্যাসে কিছুতেই আমার শ্রদ্ধা নাই, নতুবা লেখক মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা না করিয়া গ্রন্থটির আগাগোড়া একবার পড়িয়া দিতাম।

আমি কিছুই করিতে পারি নাই,—কাজেই আশা করিবার কিছুই নাই-ও আমার। সংসারের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষায় ও পড়ার দিন আমার গেচে। যদি কেহ ভালো বলেন, সেও যেমন উত্তম, খারাপ বলিলেও অনুত্তম নহে। ইতি

শ্রীমতী সোণামণি দেবী